"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"
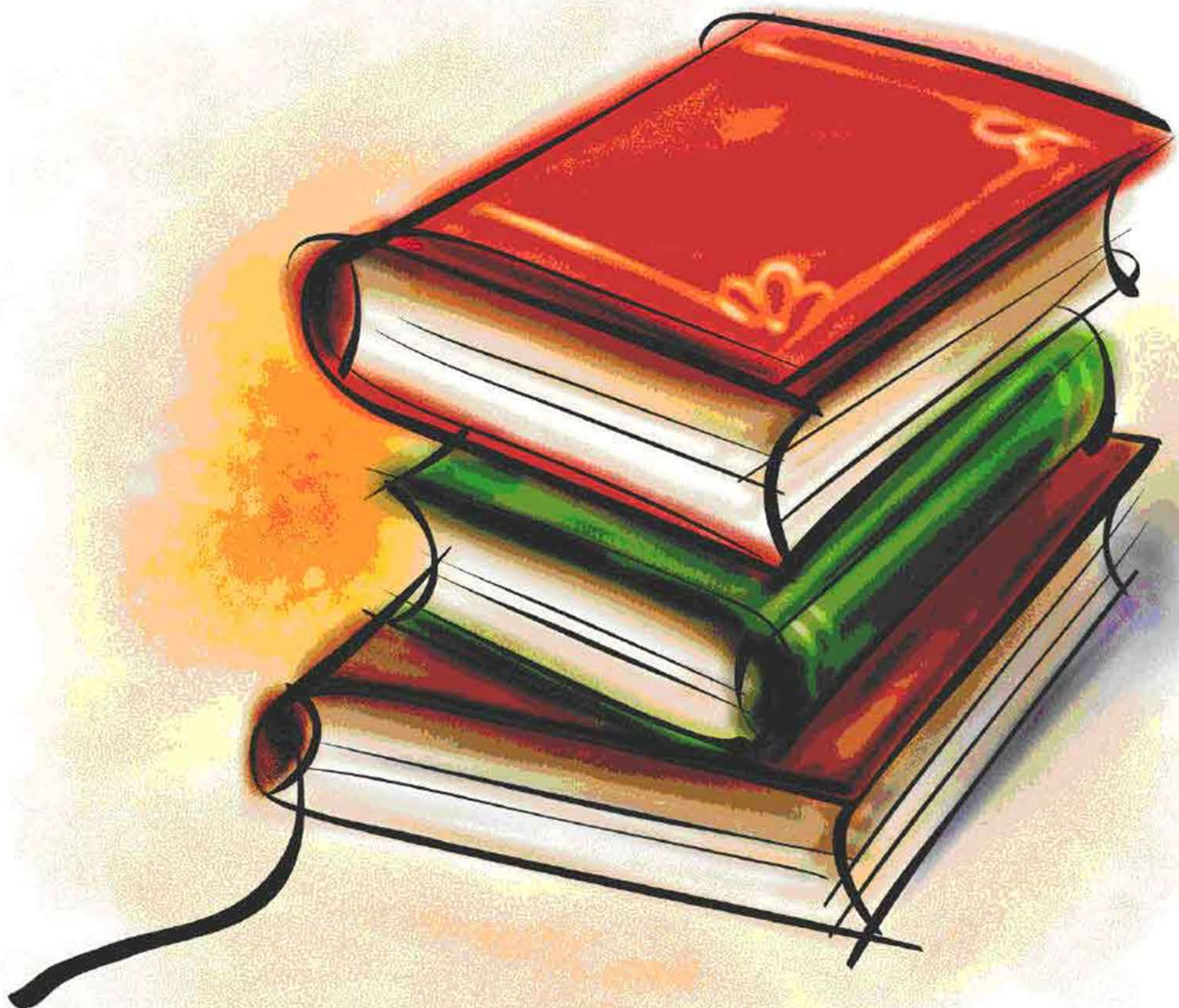
মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

পঞ্চম বর্ষ   বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০   প্রথম সংখ্যা

চিত্ত

চিত্ত

পঞ্চম বর্ষ, ১৩৭০ সন

বর্ষসূচী

নিবেদন

লেখক, গ্রাহক, কর্মী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় চিত্ত এই সংখ্যায় পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। মনোবিদ্যার বাংলা পত্রিকা ইহাই প্রথম। ক্রমে জনসাধারণের এইদিকে আগ্রহ বাড়িতেছে, ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়। আমরা আশা করি সকলের মিলিত চেষ্টায় এই পত্রিকার ক্রমোন্নতি করিতে পারিব।

এই বৎসর হইতে আমরা 'আলোচনী' নামে এক পৃথক বিভাগ পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিব। এই বিভাগে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যার যে কোনও বিষয় লইয়া আলোচনার স্থান দেওয়া হইবে। চিত্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহাও এই বিভাগে প্রকাশ করা হইবে। মনোবিদ্যার কোনও একটি বিষয় লইয়া আলোচনা সূত্রে বিভিন্ন লেখকের লেখাও এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে। একই বিষয় নানান মতবাদ ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা হইলে সে-বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের পরিধিরও কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। দৈনন্দিন জীবনের নানান সমস্যার মূলে যে সকল মানসতা কার্য করে তাহার পরিচয় বিশদরূপে দিতে পারিলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হইতে পারিবে। সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা এই শ্রেণীর আলোচনাও এই বিভাগে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। বাংলা ভাষায় লেখকগণকে লেখা পাঠাইবার জন্য আমরা বিশেষ আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

বাংলাদেশেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা বহু বৎসর পুর্বে প্রবর্তিত হয়। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই বিশেষ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করিতেছেন। শিক্ষকতার কার্যেও অনেকে লিপ্ত আছেন। আমরা বিশেষ করিয়া তাঁহাদের নিকট এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি। যে কোনও বিশেষ বিদ্যার লেখক পাওয়া আমাদের দেশে কঠিন। তবু আমরা আশা করি যাঁহারা মনোবিদ্যা ভালবাসেন, যাঁহারা এই বিদ্যার ছাত্র এবং এই বিদ্যার দ্বারা সমাজকল্যাণ সাধিত হইতে পারে মনে করেন, তাঁহারা মনোবিদ্যার এই একমাত্র বাংলা পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহজ প্রকাশে সাহায্য করিবেন। দর্শনশাস্ত্র ও দেহবিদ্যার যে অংশের সহিত মনোপ্রকৃতির সম্বন্ধ আছে সে-সকল বিষয়ের অনুশীলনকারীগণকেও লেখা পাঠাইতে আবেদন জানাইতেছি।

সাংবাদিকী নামে অপর এক বিভাগে মনোবিদ্যা-বিষয়ক নানান সংবাদ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

পুস্তকসমালোচনা, সার-সংকলন ইত্যাদি যাহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টাও করা হইবে। ইহার জন্যও বিশেষজ্ঞদের সহায়তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সূচীপত্র

রাষ্ট্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

ডক্টর নরেশচন্দ্র রায়

জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়

প্রতি সংখ্যা এক টাকা ॥ বার্ষিক চার টাকা

: কার্যালয় :

১৫৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ব্লক-এন, রুম নং ৮

কলিকাতা-৬

চিত্ত

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ॥

বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০ ॥

সমীক্ষার পরীক্ষা

শিবপদ চক্রবর্তী, এম. এ. *

(১)

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে চিত্তভ্রংশ, স্বপ্নচারণা, চিত্তবৈক্লব্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাতুলতার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা নাকি বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই শুরু হয়েছে। এর আগেও অবশ্য এই সব মানসিক রোগের ওঝা বা হাতুড়ে বদ্যি পাওয়া যেত। মানুষের ইতিহাসের প্রায় প্রথমাবস্থা থেকেই এইরূপ মানসিক বৈক্লব্য ও তার প্রশমনের নানারূপ চেষ্টার খবর পাওয়া যায়। তবে ফ্রয়েডপন্থীগণ বলেন যে সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েডের আগে নাকি এ সবের "বৈজ্ঞানিক" ব্যাখ্যা ও "বৈজ্ঞানিক" বিশ্লেষণ হয় নি। ফ্রয়েড তাঁর যুগান্তকারী প্রকল্প (hypothesis) নির্জ্ঞান (the unconcious)-এর সাহায্যে সুস্থ বা অসুস্থ মানসিকতা ও তাদের শারীর-লক্ষণের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে চূড়ান্তভাবে "বৈজ্ঞানিক" আখ্যা দিতে একদল ফ্রয়েডপন্থীর আপত্তি নেই। প্রত্যেক মানসিক চিকিৎসালয়ে রোগীদের মনঃসমীক্ষণ করে ও তাদের রোগলক্ষণ নির্ণয় করে নাকি সব সময়ই নির্জ্ঞান মনের প্রকল্পটিকে সমর্থন (verify) করা হচ্ছে। নির্জ্ঞান মনের নানাবিধ উপাদান ও প্রেষণা, অদস্, অহম ও অধিশাস্তার (id, ego, super-ego) নাটক নাকি সর্বক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য ; আর এই প্রকল্পের বিরোধী মানসিক অবস্থা বা শারীর-লক্ষণ নাকি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সকলেই এ কথা মানবেন কিনা আমি জানি না ; এমন

---

* দর্শনশাস্ত্রের উপাধ্যায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

মনোবিজ্ঞানী ও সমীক্ষক থাকাও সম্ভব যিনি আর একটু বেশী সাবধানী এবং নির্জ্ঞান মনের প্রকল্পটিকে "বেদবাক্যের" মতো চূড়ান্তভাবে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন না। তবে উৎসাহী ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শোনা যায় যে ফ্রয়েডের মতবাদ নাকি কোনওদিনই ভুল হতে পারে না, কোনও তথ্য বা ঘটনাই তাকে কখনও অসমর্থিত করতে পারবে না; কেবলমাত্র ঐ মতবাদের বিস্তার ও পরিমার্জনা হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রয়েড যে এক বিরাট বিস্ময় এ কথা মানতে আমাদের কারুরই আপত্তি নেই। এই বিরাট পুরুষ বিজ্ঞানজগতে নিউটনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু অত্যুৎসাহী ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন যে, ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের যে-বীজ উপ্ত করে গেছেন, তা শুধু শাখাপত্রে, ফলে ফুলে বিকশিতই হতে পারে, কিন্তু কখনই নাকি সে-বীজ শুকিয়ে যেতে পারে না। ফ্রয়েডপন্থীদের এই দাবির বৈজ্ঞানিক রূপটি একটু আলোচনা করতে চাই।

(২)

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্য বলতে কী বুঝব? কেবলমাত্র জাগতিক তথ্য বা ঘটনাবলীর অভ্রান্ত সত্য জ্ঞানই বিজ্ঞান হতে পারে না। বিজ্ঞানী না হয়েও সাধারণ মানুষ অতি সাধারণভাবেই কিছু কিছু জাগতিক ঘটনা ও তথ্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে। "এই মুহূর্তে যে আমি কাগজের উপর লিখে চলেছি"—আমার এই জ্ঞান কোনও জাগতিক ঘটনা সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান, যদিও আমি বিজ্ঞানী নই। পরন্তু নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও প্রকল্প পুর্বতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের চিতার উপরই গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে যে-মত আজ অভ্রান্ত বলে মানি, কালই তাকে কবরে দেবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানীরাই করে থাকেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মতও ভ্রান্ত হতে পারে। সত্য, অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করবার একচেটিয়া অধিকার বিজ্ঞানীর নেই। সাধারণ মানুষও সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারেন; আর বিজ্ঞানীরও ভুল হতে পারে।

তথাপি সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে। তা না হলে ফ্রয়েডের প্রকল্পটিকে বিশেষভাবে "বৈজ্ঞানিক" বলার অর্থ থাকে না। বিজ্ঞানের, বিশেষ করে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার, এমন বিস্ময়কর প্রয়োগ বর্তমানে হয়েছে যে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীর পরিভাষা বোঝা আজ সাধারণ লোকের পক্ষে দুষ্কর। বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার বর্তমান বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখে, আজকের সাধারণ মানুষ হতবাক ও বিভ্রান্ত। তাই যদিও কি সাধারণ জ্ঞান বা কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উভয়েই সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে, তবু এই দুই জ্ঞানের মধ্যে আছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বিজ্ঞানই যে কেবল অভ্রান্ত জ্ঞান দেবে আর সাধারণ মানুষ অভ্রান্ত জ্ঞান পাবে না, এ ভাবে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা চলে না। বিজ্ঞানের আসল স্বরূপটি এ বিষয়ে নিহিত নেই।

আবার বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ জাগতিক তথ্যরাজির (facts) পরীক্ষিত, প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান, এমন কথা বলারও যুক্তি নেই। এ রকম ব্যক্তিনিরপেক্ষ আন্তর ঘটনা বা বাহ্য ঘটনা আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও তা জানা যায় কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানে তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাবলীর জ্ঞান কোনও না কোনও পদ্ধতির (method) সাহায্যেই আহরিত হয় এবং ঐ পদ্ধতিমুখে ঐ তথ্যরাজির নব নব রূপায়ণ হতে পারে। মনোবিদ্যার উদাহরণ নিলেই আমার কথাটি

পরিষ্কার হবে। যদি আমি অন্তর্দর্শন (introspection) পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতি বলে মানি তবে আমার পক্ষে মনোবিত্তার আলোচনাযোগ্য বিষয় বা তথ্যরাজি হবে ব্যক্তি-মানসের গহনে লুকায়িত অনুভূতিমূলক বিভিন্ন মানসিক ঘটনাবলী। আর যদি অন্তর্দর্শনের অসুবিধা দেখে আমি বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞানে নিয়োজিত সাধারণ প্রত্যক্ষকেই (extrospection) একমাত্র মনোবিত্তার তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে করি, তা হলে একমাত্র শারীরপ্রতিক্রিয়া ও প্রাণী-শরীরের চেষ্টাই হবে আমার আলোচনাযোগ্য তথ্য। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক আলোচনাও এক বিশেষ পদ্ধতিমুখে চালিত হয়েছে। সেই পদ্ধতি হ'ল, বিশেষভাবে স্বপ্নবিশ্লেষণ ও সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষণ—অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে কোনও ব্যক্তিমানসের বিকলনমাত্র। এই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিমুখেই ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মন ও নির্জ্ঞান প্রেষণার রহস্য উদ্ধার করেছেন এবং ঐ পদ্ধতিমুখে নির্জ্ঞান মনের প্রকল্প কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই মনোবিত্তার আলোচনাযোগ্য কোনও সর্ববাদীসম্মত তথ্যরাজি আছে বলে মনে হয় না; বিভিন্ন পদ্ধতিমুখে আমরা বিভিন্ন তথ্যের সম্মুখীন হতে পারি।

আবার একবারে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করলেই যে আমরা নৈর্ব্যক্তিক তথ্য পেয়ে যাব তারই বা প্রমাণ কি? পূর্ব পূর্ব ঐতিহ্যজনিত সংস্কারবদ্ধ বিজ্ঞানীর চিন্তা বা আলোচনা গোঁড়ামির ঘোলাজলে আটকা পড়তে পারে মানি। কিন্তু এ বিষয়ে মনে হয় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীর মধ্যে কোনও মূলীভূত পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানী অবশ্য সজ্ঞানে সংস্কারমুক্ত হতে চাইবেন। কিন্তু সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক তথ্য যদি দেখা যেত, তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি ও নব-রূপায়ণ হতে পারত না; কেননা, অমন নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের পরিমার্জনা ও পরিশোধন হবে কী করে? বিজ্ঞানী যে প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হন তাই তাঁর সংস্কার; তাঁর আলোচনা পদ্ধতি তাঁর সংস্কার; আর ওই প্রকল্প বা পদ্ধতির দ্বারাই তাঁর আলোচিত তথ্যরাজি প্রভাবিত হতে বাধ্য। ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রভাবে সাধারণ মানুষের চিন্তা গোঁড়ামির গোষ্পদে একটু বেশী আটকা পড়ে; কিন্তু বিজ্ঞানীরাও এ বিপদ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারেন কিনা সন্দেহ।

এখানে ওখানে পর্যবেক্ষণ করে বোকার মত কেবল তথ্যসংগ্রহ করে বেড়ানোই বিজ্ঞানীর কাজ নয়। তা যদি হ'ত তবে পথচলা মানুষও বিজ্ঞানী হতে পারত। রেল পথের অবস্থান ও সময়জ্ঞাপক পুস্তকে (time-table) বা টেলিফোনের গাইডে ভূরি ভূরি অভ্রান্ত খবর পাওয়া যায়; আর এই খবর অনুযায়ী যদি আমাদের ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করি তা হলে ঐ টাইমটেব্‌ল বা গাইডের জ্ঞান বারে বারে সমর্থিত (verified) হবে। কিন্তু তাই বলে রেলের টাইমটেব্‌ল বা টেলি-ফোনের গাইডকে কেউ বিজ্ঞানের পুস্তক বলে না।

বিজ্ঞানী তাঁর তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে যত্রতত্র হাতড়ে বেড়ান না। যে কোনও তথ্যই তাঁর কাছে তথ্য নয়। তিনি সাধারণ প্রত্যক্ষমূলক তথ্যের উপর নানাপ্রকারের প্রশ্ন তোলেন:—"এ বিষয়টি ঠিক এই রকম কেন, অন্য রকম নয় কেন?" "এমন ঘটনা কেন বা কী ভাবে ঘটল?" ইত্যাদি। কোনও তথ্য যখন কোনও বাধা বা সমস্যা সৃষ্টি করে, তখনই সে-তথ্য বিজ্ঞানীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য সাধারণের কাছে যেখানে কোনও সমস্যাই নেই, সেখানেও বিজ্ঞানীর মনীষা সমস্যা খুঁজে পায়। কিন্তু তথ্য বা ঘটনা যতক্ষণ সমস্যার সৃষ্টি না করছে, ততক্ষণ তার কিছুমাত্র প্রয়োজন বিজ্ঞানে নেই। পরন্তু বিজ্ঞানীর সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তথ্যের পর্যবেক্ষণ করে করা যাবে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রশ্ন, *"কেন উপগ্রহগুলি নিজগ্রহের চারধারে ডিম্বাকার পথে ভ্রমণ করে ; বৃত্তাকার পথে নয় ?"* হাজার হাজার বছর ধরে উপগ্রহের ভ্রমণপথ পর্যবেক্ষণ করলেও এ সমস্যার সমাধান হয় না। ঐ সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রকল্প সৃষ্টি করতে হয়, আর ঐ প্রকল্পকে সমর্থিত বা অসমর্থিত করতে হয়। নব নব প্রকল্প সৃষ্টি ও তাদের পরীক্ষার দ্বারাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। ফ্রয়েডও কতকগুলি জটিল মানসিক ব্যাধি, এমন কি স্বাভাবিক মানসিকতার ব্যাখ্যায় "নির্জ্ঞান মনের" প্রকল্প গঠন করে নানাপ্রকার মানসিক তথ্য ও শারীরলক্ষণের আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু যে কোনও প্রকল্পকেই "বৈজ্ঞানিক" বলা যায় না।

(৩)

এমন কতকগুলি প্রকল্প হতে পারে যারা এতই অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট যে, তাদের থেকে কোনও যুক্তিযুক্ত, তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় না, আর এ কারণে তাদের পরীক্ষাও (test) করা যায় না। অপরাধীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি এমন প্রকল্প করি, "কোনও একজন লোক খুন করেছে", তবে এই অনির্দিষ্ট প্রকল্প থেকে কিছুই অনুমান করা যাবে না ; আর কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষার দ্বারা এর স্থাপন বা নিরাকরণ সম্ভব হবে না। ফ্রয়েডসম্মত নির্জ্ঞানের প্রকল্পটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট কিনা সমীক্ষকেরা ভেবে দেখবেন। "নির্জ্ঞান-মন" এমনই পদার্থ যা আমাদের সংজ্ঞান চিন্তায় স্পষ্টার্থক হবার কথা নয়। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে হয়তো নির্জ্ঞান মনের প্রেষণা রোগীর কাছে স্পষ্ট হতে পারে ; তবে তা নাকি বহুআয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ (ব্যয়সাপেক্ষ তো বটেই !) । মনবিকলন পদ্ধতিতে হয়তো কারুর নির্জ্ঞানের একটি বা দুটি উপাদানই স্পষ্টীকৃত হ'ল ; কিন্তু কোনও মানুষের নির্জ্ঞান তার সামগ্রীক রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হবে, এমন হয়তো হলফ করে বলা যাবে না। আবার এই মনঃসমীক্ষণের গভীর, গভীরতর, গভীরতম স্তর আছে বলে শুনেছি। তা হলে কোনও বিশেষ দিনে কোনও সমীক্ষিত ব্যক্তির সমীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এমন হয়তো বলা যাবে না। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় যেন মানুষের নির্জ্ঞান কোনওদিনই স্পষ্ট হবে না—ব্যবহারিক দিক থেকে যাই বলা হ'ক না কেন।

তা ছাড়া এই নির্জ্ঞান মনের এষণা ও প্রেষণার উপাদানীভূত বিষয়গুলি এতই বিভিন্ন ও বিচিত্র যে, এর মধ্যে কি যে নেই তা বলা দুষ্কর। ভোগলিপ্সা থেকে আরম্ভ করে মরণেচ্ছা পর্যন্ত সবই এর অন্তর্গত বলে ধরা হয়েছে। শিশুকাম, বক্ত্রীয়কাম, পায়ুকাম, শৈশ্নিককাম, মর্ষকাম, ধর্ষকাম, সমকাম, ইতরকাম, আত্মরতি, পররতি, অজাচারকাম, কামদ্বেষ, স্বরতি, পররতি, লিঙ্গঈর্ষা, লিঙ্গচ্ছেদভীতি, ঈডিপস্‌কাম, ইলেক্ট্রাকাম, জৈবিক প্রেষণা, অলৈঙ্গিক কাম ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই যেন ঐ নির্জ্ঞানের প্রেষণা হতে পারে। নির্জ্ঞান অবশ্যই কোনও স্থাণু বস্তু নয়—একটা প্রেষণা বা বিক্ষোভ। কিন্তু এ এতই সর্বগ্রাসী যে, সমীক্ষক তাঁর বাদুদণ্ড দিয়ে মানুষের নির্জ্ঞান থেকে নানান বৈচিত্রময় প্রেষণা যেন বার করতে পারেন। আর এত আছে বলেই নির্জ্ঞানে কিছু নেই বলে মনে হয় ; যেমন আলোকের প্রাখর্যে কোনও স্থান অন্ধকার মনে হয়। এ সব কারণে নির্জ্ঞান মনের প্রকল্পটিকে অস্পষ্টার্থক বললে বোধ হয় দোষ হব না। এর কোনও উপাদান নেই

এমন হয়তো বলব না ; কিন্তু এর পর্যায়ে পর্যায়ে ভাসমান উপাদানগুলো এতই অসংখ্য যে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেই যা এই প্রকল্প থেকে অনুমিত হতে পারে না। যে কোনও রকমের শারীরলক্ষণ ও মানসিক অবস্থা এই নির্জ্ঞানের কোনও না কোনও উপাদান থেকে অনুমিত হয়ে যেতে পারে বলে, কোনও মানসিক অবস্থাই এই প্রকল্পের নিরাকরণ করতে পারে না; আর এই কারণেই হয়তো এই প্রকল্পের ভূরি ভূরি সমর্থন চিকিৎসালয়ের পর্যবেক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু কোনও নির্দিষ্টার্থক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প এমনই হয় যে তার থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই অনুমিত হয়, আর অন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তভাবে অনুমিত হয় না। যে সব ঘটনা ঐ স্পষ্টার্থক প্রকল্প থেকে কোনওক্রমেই অনুমিত হয় না, তারা যদি কোনওদিন বাস্তব তথ্যরূপে দেখা দেয় তবে সেইদিনই ঐ প্রকল্প নিরাকৃত হয়ে যায়। তা হলে নিরাকৃত হবার সম্ভাবনা হবে "বৈজ্ঞানিক" প্রকল্পের একটি নিরিখ। এই নিরিখের সাহায্যে ফ্রয়েডীয় প্রকল্পকে আমি বৈজ্ঞানিক বলতে নারাজ ; কেননা, অত্যুৎসাহী ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন যে ফ্রয়েডের প্রকল্প নিরাকৃত হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমি মেনে নিচ্ছি যে ফ্রয়েডের প্রকল্প প্রতিদিন বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে সমর্থিত হয়ে চলেছে, হাজার হাজার ক্ষেত্রে সমর্থিত হয়েছে ; সুদূর অতীতে যে সব মানসিক বিকারের সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাস, সে সবও তাঁর প্রকল্পকে সমর্থন করেছে ও ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু যদি ফ্রয়েডপন্থীরা মনে করেন যে এ প্রকল্প কোনওকালে নিরাকৃত হতে পারবে না ও যে-কোনও মানসিকতাকেই এই প্রকল্পের গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলা যাবে, তা হলে বলব যে এটা ফ্রয়েডপন্থীদের গোঁড়ামি ও অন্ধতা। এই অন্ধতার মতো বড় শত্রু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আর নেই। এই গোঁড়ামি, অসুবিধাজনক ঘটনার অপব্যাখ্যা করায় অথবা তাকে পরিহার করায়। তাই কোনও প্রকল্প যদি এমন অন্ধতার সৃষ্টি করে তা হলে তাকে "বৈজ্ঞানিক" বলব কী যুক্তিতে ?

এ্যাড্‌লার সাহেবও মনবিকলন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন ; কিন্তু তাঁর মতে মানুষের নির্জ্ঞান মানসের প্রধানতম উপাদান হ'ল হীনম্মন্যতা বা হীনতাবোধ। এর থেকেই নানাপ্রকারের গূঢ়ৈষা (complex) সৃষ্ট হয় আর তাদেরই রকমফেরে সকল স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ব্যাখা করা চলে। এ্যাড্‌লারপন্থীগণ মনে করেন যে মানসিক চিকিৎসালয়ের সকল পর্যবেক্ষণই এ্যাড্‌লারের প্রকল্পটিকে সমর্থন করে চলেছে এবং তার ব্যতিক্রম হয় না। ফ্রয়েডের মতে কিন্তু মানুষের নির্জ্ঞানের প্রধানতম বৃত্তিটি হ'ল কামজপ্রবৃত্তি ; অবশ্য এই কামজ প্রেষণার এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে সকাম নিষ্কামের প্রভেদ ঘুচে যাবার দাখিল। ফ্রয়েডপন্থীরা বলবেন যে এ্যাড্‌লার বা এ্যাড্‌লারপন্থীরা নির্জ্ঞান মনের যথেষ্ট গভীরে ঢুকতে চান না বলেই হীনতাবোধের উপর জোর দিয়েছেন ; কিন্তু ঐ হীনতাবোধ আসলে লিঙ্গচ্ছেদভীতিরই রূপান্তরিত ফলমাত্র। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেকের নির্জ্ঞান মানসে নাকি লিঙ্গচ্ছেদভীতি অবদমিত হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুকালে, কি স্ত্রীশিশু কি পুংশিশু, প্রত্যেকের মধ্যেই নানাভাবে লিঙ্গচ্ছেদভীতি প্রকট হয়ে থাকার কথা। স্ত্রীশিশুর লিঙ্গচ্ছেদ ঘটে গেছে প্রথম থেকেই আর পুংশিশুর লিঙ্গদর্শনে তার মনে জাগে লিঙ্গঈর্ষা। পুংশিশু স্ত্রীশিশুর যোনি দেখে লিঙ্গচ্ছেদভীতিতে আতঙ্কিত হয় ; কিন্তু লিঙ্গচ্ছেদভীতি-সংক্রান্ত মনোভাবে কি স্ত্রীশিশু কি পুংশিশু সকলেই কিছুটা প্রভাবিত। এর থেকেই নাকি জাগে হীনতাবোধ। তাই এ্যাড্‌লারীয় গূঢ়ৈষা মৌলিক নয়—কামজপ্রবৃত্তিরই অবস্তুভাবী ফল।

কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে কামজপ্রবৃত্তি ও হীনতাবোধ এক নয়, আর ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা ও এ্যাড্‌লারের ব্যাখ্যা অবশ্য বিকল্প (alternative) ব্যাখ্যা। একটি উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে যে কিরকম আপাতবিরোধী প্রতিক্রিয়া উভয়েই একই প্রবৃত্তির ফল বলে মনে করেন। মনে করুন যে কোনও ব্যক্তি একটি শিশুকে জলের মধ্যে ঠেলে দিল, শিশুটিকে ডুবিয়ে মারার উদ্দেশ্যে। আবার অন্য ব্যক্তি তার নিজের জীবন বিপন্ন করে শিশুটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। এই দুই আপাতবিরোধী প্রতিক্রিয়াকে ফ্রয়েড ও এ্যাডলার উভয়েরই প্রকল্প দিয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করা যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রথম ব্যক্তি (যে শিশুটিকে মারতে চায়) ঈডিপস্ গূঢ়ৈষার কোনও অবদমিত উপাদানের দ্বারা চালিত হচ্ছে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি (যে শিশুটিকে বাঁচাতে চায়) সেই অবদমিত উপাদানের রূপান্তর (sublimate) করেছে। এ্যাড্‌লারের মতে প্রথম ব্যক্তি হীনতাবোধে ভুগছে ও অপরাধ করবার সাহস আছে কিনা তা নিজের কাছে প্রমাণ করতে চায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঐ একই হীনতাবোধে ভুগছে ; শুধু সে প্রমাণ চায় যে শিশুটিকে উদ্ধার করার সাহস তার আছে কিনা।

এখন ফ্রয়েডের দাবি এই যে তারই ব্যাখ্যায় সকল প্রকার মানসিকতা ও শারীরলক্ষণ অতিশয় পরিষ্কার করে বোঝা যাবে। এ্যাড্‌লারেরও দাবি এই যে কেবলমাত্র তাঁর ব্যাখ্যায়ই সব কিছু পরিষ্কার হয়। এই দুই দলের মধ্যে কোনও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখতে পাই না ; এঁরাও যতটা গোঁড়া, ওঁরাও ততটা অন্ধ। ধরে নিলাম যে এ্যাড্‌লারপন্থীরা মানুষের নির্জ্ঞানের যথেষ্ট গভীরে প্রবেশ করেন নি ; করলে, লিঙ্গচ্ছেদভীতির সিংহদ্বার দেখতে পেতেন। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীরা কি বলবেন যে তাঁরা ঐ নির্জ্ঞানের গভীরতম প্রদেশ উদ্‌ঘাটিত করেছেন ? লিঙ্গচ্ছেদভীতির নীচেও কি আর তল নেই ? ভবিষ্যতে আর কোনও প্রতিভাবান সমীক্ষক কি আর কোনও সিংহদ্বার খুঁজে পাবেন না ? এখন তাঁরা যদি এটা সম্ভব বলে মনে করেন, তবে ফ্রয়েডপন্থীদের বর্তমান "খুল্ যা সম্‌সমের" (open sesame) কী হবে ? আর যদি এটা অসম্ভব বলে মনে করেন, তবে তো তাঁরা অবৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি আর অন্ধতার দাসত্বই করে চলেছেন। আমি এ কথা একবারও বলছি না যে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা ভুল। কিন্তু এ্যাড্‌লারপন্থীও তো বলতে পারেন যে তাঁর ব্যাখ্যাই ঠিক। এই বিকল্প ব্যাখ্যার আলোকে আমি শুধু এই বলতে চাই যে, মানসিকতার "বৈজ্ঞানিক" ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড ও এ্যাড্‌লারপন্থী উভয়েরই গোঁড়া মনোভাব বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিপন্থী।

(৪)

তারপর দেখা যাক, মানসিক চিকিৎসালয়ে রোগীদের রোগলক্ষণে ও মানসিকতা পর্যবেক্ষণ করে ফ্রয়েডীয় প্রকল্পটি যে সব সময়েই সমর্থিত হচ্ছে, এ কথার প্রকৃত অর্থ কী। আমি পূর্বেই বলেছি যে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যরাজি যে পদ্ধতিতে আহরিত হয় সেই পদ্ধতির প্রভাব ঐ তথাকথিত তথ্যরাজির উপর পড়তে পারে। রোগীর যখন মনবিকলন করা হতে থাকে তখন সমীক্ষক একটা প্রকল্প ধরে নিয়েই সমীক্ষণ করতে থাকেন। এমতাবস্থায়, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে, সমীক্ষকের অভিভাবন (suggestion) একেবারেই যে রোগীর উপর পড়বে না, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। রোগী যদি সমীক্ষকের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে 'বাধা'র (resistance) প্রকল্প করা হয় ;

আর যতক্ষণ না রোগী সমীক্ষকের অভিভাবনের প্রতি উৎসাহিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত 'বাধা' আছে বলে কল্পনা করা হয়। এমতাবস্থায় যদি সর্বক্ষেত্রেই চিকিৎসালয়ের পর্যবেক্ষণদ্বারা সমীক্ষকের প্রকল্পটি "সমর্থিত" হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবশ্য আমি এ কথা নিশ্চয়ই মানব যে সকল প্রকার তথ্য পর্যবেক্ষণেই এ বিপদ কমবেশী বর্তমান। তথাপি রোগীর রোগনির্ণয়ে রোগলক্ষণকে কেবল নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণই করা হয় না ; ঐ লক্ষণকে কোনও মতবাদ অনুযায়ী অর্থবান করে নিয়ে বোঝা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে, অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও যে এ দায় একেবারেই নেই, এমন হয়তো কেউ বলবেন না। তাই যে-মতবাদের আলোকে রোগীর প্রতিক্রিয়াগুলো বুঝতে হয়, নিরীক্ষিত প্রতিক্রিয়াগুলো যে সে-মতবাদকে "সমর্থন" করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের অন্য কোনও রকম পরীক্ষা (test) চাই-ই।

কেবলমাত্র সাদামাটাভাবে পর্যবেক্ষণ দ্বারা "সমর্থিত" হলেই কোনও প্রকল্প "বৈজ্ঞানিক" বলে মর্যাদা পেতে পারে না। তা যদি পেত, তবে "এ জগতে যা কিছু ঘটছে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে" এই ধর্মীয় মতবাদ বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠত। এর কারণ এই যে ঐ "ঈশ্বরেচ্ছায়" প্রকল্পটি কখনই অসমর্থিত হয়েছে বলে অন্ততঃ ধার্মিকেরা মানবেন না। যখনই কোনও ঘটনা ঘটে, তা ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তা ঘটেছে এমন বললে রুখবে কে? তাই সব দৃষ্টান্তেই যেন ঐ প্রকল্প "সমর্থিত" হচ্ছে। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে, আগে ঘটনাটি ঘটলে পর বলা হয় যে সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত। কেউ কোনওদিন ঈশ্বরের ইচ্ছাটিকে আগেভাগে জেনে নিয়ে, কিছুদিন পরে কি যে ঘটনাটি ঐ ইচ্ছানুযায়ী ঘটবে তার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন নি। এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করার মধ্যে এক প্রকাণ্ড ঝুঁকি আছে ; কেননা যদি ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী ঘটনাটি না ঘটে তবে ঐ "ঈশ্বরেচ্ছা"-মতবাদ খানখান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ধার্মিকের ঈশ্বরেচ্ছা-প্রকল্প এই ঝুঁকি কখনও নেয় না ; তাই তার "সমর্থনই" শুধু দেখা যাচ্ছে।

জ্যোতিষীদের (astrologer) গণনামূলক ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যেও খানিকটা এই রকম অবস্থা অন্যভাবে পাওয়া যায় বলে, ফলিত জ্যোতিষ "বৈজ্ঞানিক" মর্যাদা পায় নি। দৈবজ্ঞেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে "অষ্টগ্রহ" সম্মেলনে নাকি মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। সকলেই জানেন যে সম্মেলন ভালয় ভালয় হয়ে গেছে ; আর অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে কোনও মহাপ্রলয় দেখা যায় নি। কিন্তু তথাপি নাকি দৈবজ্ঞের প্রকল্পের কোনও হানি হয় নি ; কেননা, কেন যে ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলল না, তারও নাকি "ব্যাখ্যা" আছে! এই "ব্যাখ্যা" এমনই বস্তু যে সমস্ত বিষয়কেই এর গণ্ডির মধ্যে আনা যায়। এর অর্থ এই যে দৈবজ্ঞদের মধ্যে এমন কোনও সর্ববাদীসম্মত তথ্য বা বিষয় নেই, যা তাঁদের শাস্ত্রের প্রকল্পকে নিরাকরণ করতে পারে। দৈবজ্ঞেরা সব সময়েই তাঁদের প্রকল্পটিকে সার্থক বলে ধরে রাখেন ; আর, হয় বলা হয় যে গণনায় কোনও ভুলচুক হয়তো হয়েছে, নয়তো বলা হয় যে জাতকের জন্মকাল হয়তো ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যে কারণে ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্য দৈবজ্ঞদের কোনও কোনও গণনা যে ফলে না তা আমি কখনই বলব না। কিন্তু তাঁদের প্রকল্পটি কখনই যেন অসমর্থিত হবার নয়। "ব্যাখ্যার" এমনই মহিমা যে দৈবজ্ঞদের প্রকল্প নিরাশ হবার নয়। জাতকের জন্মকাল একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্‌টি, কখন যে জাতক পুরাপুরি ভূমিষ্ঠ হ'ল সে-মুহূর্তটি, কে আর বলুন সূতিকাগৃহে গিয়ে স্টপ্‌ওয়াচ দিয়ে ধরে রাখছে। তাই বাস্তব অবস্থাটা এমনই খোলা যে, "ব্যাখ্যার" মহিমায় দৈবজ্ঞমহোদয়গণের পিছলে বেরিয়ে যাবার বাধা হয় না।

(৫)

তাই খাঁটি "বৈজ্ঞানিক" প্রকল্পটিকে পরীক্ষা (test) করে সমর্থন করার নির্ভেজাল রূপটি যে কি তা বুঝতে হবে। প্রধানতঃ নির্ভেজালভাবে সমর্থিত হবার সুখ বিজ্ঞানীকে অসমর্থিত হবার দায় বা ঝুঁকি নিতেই হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীকে আগেভাগে বলতে হবে যে "আমার প্রকল্প থেকে এই বিশেষ, নির্দিষ্ট ঘটনাটি কোনও ক্রমেই অনুমিত হতে পারে না এবং যদি কোনওকালে ঐ বিশেষ ঘটনাটি ঘটে যায়, তবে আমার প্রকল্প পুরাপুরি নিরাকৃত হয়ে যাবে।" তারপর যতদিন পর্যন্ত দেখা যায় যে, ঐ ঘটনাটি বাস্তবে ঘটছে না ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীর প্রকল্পটি কার্যকর (working hypothesis) থাকবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রকল্প এমন হওয়া চাই যে, তার থেকে যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা যুক্তিযুক্তভাবে অনুমিত হয়, তেমনি তার থেকে অন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা কোনওক্রমেই অনুমিত হয় না। যুক্তিযুক্তভাবে অনুমিত ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে যেমন প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তেমনি বিজ্ঞানীকে তাঁর প্রকল্প থেকে অনুমিত হয় না এমন ঘটনার কথাও আগেভাগে বলে রাখতে হবে। এইরূপে ভবিষ্যতে নিরাকৃত হবার ঝুঁকি যে প্রকল্প নেয় না বা নিতে সাহস করে না, তাকে "বৈজ্ঞানিক" বলব না। আইনস্টাইন শুনেছি তাঁর মতবাদের সমর্থনে এমন অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন। সমর্থক এবং অসমর্থক এই উভয় প্রকারের ঘটনার সম্বন্ধে যে প্রকল্প ভবিষ্যদ্‌বাণী করে না, কিন্তু কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সমর্থক ঘটনারই আভাষ দেয়, সে-প্রকল্প নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হতে পারে না।

এখন এই নিরাকৃত হবার ঝুঁকি নিরিখে বিচার করলে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের প্রকল্পটি ধোপে টেঁকে কিনা সন্দেহ। আমি আবার বলছি যে আমি এমন কথা কখনই বলি না যে ফ্রয়েডের প্রকল্পটি ভুল ; বরং সে যেন অতি বেশী মাত্রায় সমর্থিত হয়েই চলেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সব মনঃসমীক্ষকেরা মিলে, সর্ববাদীসম্মত ভাবে, এমন কোনও মানসবৃত্তি বা শারীর প্রতিক্রিয়ার কথা কি বলেছেন, যা দেখা গেলে ঐ নির্জ্ঞানের প্রকল্পটি, তাঁদেরই মতে, ঝাড়ে-বংশে উৎখাত হয়ে যাবে? আমি যতদূর জানি এই ঝুঁকি ফ্রয়েডীয় প্রকল্প কখনও নেয় নি। কিন্তু শুধু সমর্থিত হলেই তো চলবে না। অসমর্থিত হবার ঝুঁকিও নিতে হবে। 'ঈশ্বরেচ্ছা' মতবাদ তো সব সময় সমর্থিত ; দৈবজ্ঞের প্রকল্পও সমর্থিত হয় ; টেলিফোন-গাইডের খবরও তো সমর্থিত হচ্ছে। কিন্তু সমর্থিত বলেই এরা কিছু বিজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না। ফ্রয়েডপন্থীরা শুধু আমাদের বলে দিন যে কি হলে, তাঁদের মতে, ঐ নির্জ্ঞানের প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর আমরা, মনঃসমীক্ষণের শত্রুরূপী বন্ধুরা, ঐ প্রকল্পকে নিরাকৃত করার চেষ্টা করে, ব্যর্থ হতে চাই। ফ্রয়েডের প্রকল্প যে আজ পর্যন্ত সমর্থিত হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হতে থাকবে এ কথা পুরোপুরি মেনে নিয়েও, "বৈজ্ঞানিক" আখ্যা পাওয়ার জন্যে উৎসাহী ফ্রয়েডপন্থীদের অসমর্থিত হবার ঝুঁকি নিতেই হবে।

(৬)

আশা করি পাঠকেরা আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি নিজে সমীক্ষিত নই। এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে আমার নির্জ্ঞানে এমন কিছু গূঢ়ৈষা আছে, যার জন্য আমি ফ্রয়েডের বিরোধিতা করছি—আমি তা জানি না। কিন্তু সেটা বাস্তব তথ্যের ব্যাপার—তাত্ত্বিক নয়। ফ্রয়েডীয় প্রকল্পের বিরুদ্ধে

আমার কথা কেবল তাত্ত্বিক; আর এমন কথা অনেকে আজ বলছেন*। মহামনীষী ফ্রয়েড যখন তাঁর নির্জ্ঞান ও শিশুদের কামজীবনের প্রকল্প নিয়ে বিদগ্ধ জনসমাজের কাছে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, তখন অনেক বিদ্বেষ, অনেক কুৎসা, অনেক প্রক্ষোভজ বিরোধিতা তাঁকে সইতে হয়েছে। ডারউইন, গ্যালিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছনাও বড় কম হয় নি। মনীষী বিজ্ঞানীদের এইটেই হয়তো ভাগ্য। ফ্রয়েড পরবর্তী যুগে তাঁর প্রতি গুণমুগ্ধ, অত্যুৎসাহী আনুগত্য এবং বিষাক্ত বিদ্বেষ এই উভয়ই সমভাবে চলে এসেছে। অন্ততঃ প্রথম দিকে এই আনুগত্য ও বিদ্বেষ উভয়ই ছিল তীব্র আবেগজনিত। তারপরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। উত্তেজনাও অনেক প্রশমিত হয়ে এসেছে। আজ বোধহয় স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে পিছনে তাকাবার দিন এসেছে। ফ্রয়েডের প্রকল্পকে আমি যদি ভুল বুঝে থাকি তবে তা আমার মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সীমিত ধারণারই ফল। তবু যদি এই তাত্ত্বিক আলোচনায় সমীক্ষকেরা একবার পিছনে ফিরে তাকান, আর সমীক্ষণকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে উৎসাহিত হন, তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

---

* Cohen and Nagel, *An Introduction to Logic and Scientific Method.* p. 211.
Karl, R. Popper. *Philosophy of Science*—A personal report. Published in British Philosophy in mid-century Ed. By C. A. Mace.

ছাত্র-উপদেশন সংস্থা

প্রমদানাথ চৌবে, এম. এ. *

ছাত্র-উপদেশন সংস্থার (Students' Counselling Organisation) উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ণয় করিয়া প্রত্যেককে নিজ নিজ উপযুক্ত নিয়োজনে সহায়তা করা এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-উপদেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করার নানান অসুবিধা আছে। আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষা অধিকর্তাগণ পরীক্ষামূলক-ভাবে শিক্ষায় এই পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছে। ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে একাধারে ছাত্রদের ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যকারী। এই পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রেরা তিন প্রকারে উপকৃত হইতে পারে :—

১। ছাত্রেরা তাহাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও কর্মানুরাগ অনুযায়ী শিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারে।

২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করিয়া কর্ম-সংস্থান করিতে পারে।

৩। নিজের ক্ষমতা, রুচি ও কর্মানুরাগ অনুসারে জীবিকা নির্বাচন করিয়া অকারণ হতাশা ও অকৃতকার্যতার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে।

এই পদ্ধতি গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারেন। ছাত্রদের মনোভাব, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার বিষয় তাঁহারা জানিতে পারিলেই তবে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করিয়া শিক্ষায় সাফল্যলাভ করা সম্ভব।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের ছাত্রেরা তাহাদের সহজাত সুপ্ত কর্মক্ষমতার বিষয় কিছু জানিতে পারে না। নিজেদের অন্তর্নিহিত মূল্যবান ক্ষমতাগুলির বিষয় ছাত্রদের জানিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ উপদেশকের নির্দেশে ছাত্রেরা তাহাদের ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।

এই পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রদের সামাজিকতাবোধ এবং আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়। উন্নত জীবন যাপন করিবার জন্য সামাজিকতা-বোধ ও আত্মবিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। এই উপদেশন-পদ্ধতির সাহায্যে আত্মবিশ্বাসহীনতার কারণ ছাত্রেরা জানিতে পারে। কিরূপে এই আত্মবিশ্বাসহীনতার ভাব মন হইতে দূর করা যায় তাহার উপায়ও ছাত্ররা ইহা হইতেই পায়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে যে সকল অনুভূতি ও আবেগসমূহ ছাত্রদের মনে সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহার ভার হইতে এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রেরা মুক্ত হইতে পারে।

* মনোবিদ্যার উপাধ্যায়, জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা

কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্রেরা কদাচিৎ সহৃদয় শ্রোতা পায়। উপদেশকের প্রধান কর্তব্য ছাত্রের কথাগুলি সহানুভূতি সহকারে শ্রবণ করা, এবং প্রয়োজন মত যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করা।

বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিবেশ হইতে ছাত্রেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশে প্রবেশ করে তখন তাহারা কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন, নূতন পরিবেশ, অপরিচিত সহপাঠি ও নূতন পাঠ্য বিষয়সমূহ। মনের এই পরিস্থিতি কালে বিশেষজ্ঞ উপদেশক উপযুক্ত উপদেশ দ্বারা ছাত্রদের নানান ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে ছাত্রদের জানা দরকার কোন জীবিকা গ্রহণ করা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ উপযুক্ত বৃত্তিগ্রহণের উপরেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু তরুণ ছাত্রের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই নিজে নিজে উপযুক্ত জীবিকা গ্রহণ বা নির্বাচন করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সুযোগ্য উপদেশকের উপদেশ তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে।

আমাদের দেশে উন্নত ধরনের জীবনযাপনের জন্য ছাত্রদের কোনও প্রকার উপদেশ দিবার ব্যবস্থা নাই। উন্নত ধরনের জীবনযাপনের নির্দেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্য আমাদের ছাত্র-সমাজ ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির প্রতি যত্নবান নয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত নানান সমস্যা সম্বন্ধেও তাহারা অত্যন্ত অপরিণত মনোভাবের পরিচয় দেয়। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তিগুলি মার্জিত ও পরিণত না হওয়ার জন্য ছাত্রেরা অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ছাত্রদের মনোবৃত্তিগুলি পরিণত হইতে পারে না বলিয়াই জীবনের নানান ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অপরিণত মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় ছাত্রেরা যাহাতে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিণত মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে উপদেশন-সংস্থা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। উপদেশক সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইতে পারেন না। সুতরাং ইন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ন্যায় অতি আশ্চর্যজনক কোনও পরিবর্তন তিনি ঘটাইতে পারেন না ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। ছাত্রদের বিশেষ কতকগুলি সমস্যার উৎসের সন্ধান ও তাহার প্রতিকারের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন, যাহার দ্বারা ছাত্রেরা তাহাদের নানান সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারে। তাঁহার উপদেশ অনুসারে প্রয়োজন মত ছাত্রদের যথাযোগ্য অন্য বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরণ করা দরকার।

নূতন প্রবর্তিত ছাত্র-উপদেশন পদ্ধতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। নতুবা এই পদ্ধতি ছাত্রদের প্রকৃত উপকারে লাগিবে না। কিরূপে এই পদ্ধতি কাজে লাগিবে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। যেমন একটি ছাত্র কোনও একটি বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে ভাল ফল করিতে পারিতেছে না। তাহাতে তাহার শিক্ষাকালের অমূল্য সময় নষ্ট হইতেছে। এই অবস্থায় উপদেশক ছাত্রটিকে বিভিন্ন অভীক্ষা (test)—যেমন বুদ্ধির অভীক্ষা, সামর্থের অভীক্ষা, সফলতার অভীক্ষা ও ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা—দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহার অকৃতকার্যতার কারণ নির্ণয় করিবেন। এই সকল অভীক্ষার দ্বারাই ছাত্রটির কর্মক্ষমতা, আগ্রহ ও সাফল্যের মাত্রা স্থির করা যাইবে। এই সমস্ত অভীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে

ছাত্রটির পক্ষে কোন ধরনের কাজ অধিক কার্যকর ও ফলপ্রদ হইবে তাহাও জানিতে পারা যাইবে। এই সকল অভীক্ষার দ্বারা ইহাও জানা যাইবে কেন ঐ ছাত্রটি নিজের পথ ছাড়িয়া ভুল পথে চলিতেছে।

বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের সহৃদয় সহযোগিতার উপরেই ছাত্র-উপদেশন পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সাফল্য নির্ভর করিতেছে। স্কুল ও কলেজের অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যার ভীড়ের দরুনই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপদেশন-পদ্ধতির প্রয়োগে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। আবার এই পদ্ধতির কর্মতালিকার প্রতি বিভিন্ন বিভাগের মনোভাব ও শ্রদ্ধার উপরও ইহার সাফল্য নির্ভর করে। এই পদ্ধতির আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যতক্ষণ সকলে বিশেষভাবে পরিচিত না হইতেছে ততক্ষণ ইহা উপযুক্ত প্রাধান্য লাভ করিবে না, এবং ইহার যথার্থ ফলও পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুর্ণ সহযোগিতার উপরেই এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করিতেছে। নতুবা এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তবেই উপদেশন-পদ্ধতির আদর্শের সিদ্ধিলাভ অধিকতর সম্ভব হইবে। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর জীবিকার জন্য কর্ম অন্বেষণ করে। কারণ অধিকাংশ ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা অর্জনের জন্যই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করিবার কোনও প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহার মাধ্যমেই কর্ম-সংস্থানের সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তখনই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকটি ছাত্রের বিষয়ে যত্নবান হইয়াছে।

উপদেশন-সংস্থার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইতে ইহা বলিতে পারা যায় যে এই সংস্থা ছাত্রদের নানান প্রয়োজন ও পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ দিবে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ ও শিক্ষকগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ছাত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় যে সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা ইহা বিশদভাবে জানা সম্ভব হইবে যে কী কারণে সাধারণতঃ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া থাকে এবং সহৃদয়তার সহিত তাহার প্রতিকার করাও সম্ভব হইবে। অপরিণত আবেগ প্রবণতার ফলেও বহুক্ষেত্রে ছাত্রদের জীবনে অকৃতকার্যতা ও হতাশা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বর্তমান শিক্ষাধারাকে যদি শিশুকেন্দ্রিক এবং জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করা হয় তবে উপদেশন পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া উন্নত, কার্যকর এবং সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করা যাইবে। শিক্ষার প্রসার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উপদেশন-পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

নীতি

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এসসি. *

নীতি বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া লইতে পারিলে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা সহজ হইবে। কিন্তু অসুবিধা এই যে নীতি কথাটা এতই ব্যাপক ও নানান অর্থে ব্যবহৃত হয় যে মূল অর্থ সুস্পষ্ট করা কঠিন। সংস্কৃত অভিধানানুসারে 'নীয়তে অনয়া ইতি নীতি'; অর্থাৎ ইহা দ্বারা চালিত, নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়াই ইহাকে নীতি বলা হয়। বাংলার নানান অভিধানে যে সকল অর্থে নীতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে তাহার মধ্যে রীতি, যাপন, ধর্ম বা সমাজহিতকর বিধান, ধর্মাধর্ম বোধ, বিধান সাধনের উপায়, ন্যায়সঙ্গত বিধান, হিতাহিত বিষয়ক উপদেশ, ন্যায় অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য বিচার, ভালমন্দ বিচার ইত্যাদি অর্থে এই শব্দের উল্লেখ আছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি এবং নীতিবোধ, নীতিজ্ঞান, নীতিবান, নীতিচর্চা ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সাধারণ অর্থে কোনও বিষয়ের বিশেষ নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিধিনিষেধকে সেই বিষয়ের নীতি বলিতে পারি। নিয়ম মানুষের গড়া কিন্তু নীতি যেন স্বতঃসিদ্ধ; অনেক সময় এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করিতে দেখা যায়।

নীতির এই অর্থ মানিয়া লইলে প্রথমেই বলিতে হয় যে-শব্দ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সহিত এরূপ যুক্ত তাহা দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে পরিবর্তিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। রাজনীতি ছিল রাজার আচরিত নিয়ম; ক্রমে তাহা রাজ্য পরিচালকদিগের অনুসরণীয় নীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এক দেশের নীতির সহিত অপর দেশের নীতির সমতা নাও থাকিতে পারে। এই অমিল আছে বলিয়াই শান্তিকামী ভারতবর্ষকে চণ্ডনীতিপন্থী লালচীন আক্রমণ করিয়া বসিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাম্প্রতিক স্মৃতি আজও মানুষ ভুলতে পারে নাই। জার্মানী কর্তৃক হিটলারী রুদ্রনীতির পরিচয় বিশেষ করিয়া ইওরোপের দেশবাসী অনেকদিন মনে রাখিবে। সে-নীতি সম্প্রতি জার্মানী হইতে অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। তাহার বদলে নূতন আর এক গোষ্ঠীনীতির উদ্ভব হইয়াছে। সমাজ-জীবনের দিকে চাহিলেও একই কথা বলা চলে। প্রাচীন ভারতের সমাজনীতি বর্তমানে অনেকাংশে অচল হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আচরিত বিবাহ-প্রথার নানান পরিবর্তনের ফলে সমাজনীতিই অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলন ও বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় পূর্বাচরিত হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি অনেক পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। এমন কি আত্মীয়ের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আজ যে একজনের সহিত নিকট আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ, কিছুদিন পরে বিবাহবিচ্ছেদের ফলে সে আত্মীয়তা লোপ পায়। বিশেষ ক্ষেত্রে খুড়ী, মাসী ইত্যাদি সম্বন্ধের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে পূর্ব-বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে পুনরায় নিজের সহিত বিবাহ হইতেও কম দেখা যায় না। পতি পরম গুরু নীতি বহু পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও যে-বিবাহ নীতিগত-

---

* মনঃসমীক্ষক, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতি, লুম্বিনি পার্ক (মানসিক হাসপাতালের) অধিকর্তা, ইত্যাদি

ভাবে গর্হিত বলিয়া গণ্য হইত বর্তমানে তাহার সম্বন্ধে কোনও কথাই আর উঠে না; সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল দিকেই এই পরিবর্তনের কথাটা মনে রাখিতে পারিলে নীতি সম্বন্ধে অনর্থক ঋজু বা প্রখর মনোভাব পোষণ করার অর্থহীনতা স্পষ্ট হইবে। মহাভারতে বর্ণিত সমাজনীতি বর্তমানের ভারতীয় সমাজে অনেক পরিমাণে অচল। উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নীতির সহিত, বিশেষ করিয়া ধর্মনীতির সহিত, দুর্নীতি অর্থাৎ পাপপুণ্য বোধ এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে ধর্মের ক্ষেত্রে নীতির একটা বিশেষ অর্থই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাধারণ জীবনযাত্রায় পাপপুণ্য বোধ তেমন প্রবলরূপে দেখা না দিলেও মনের মধ্যে তাহার একটি বিশেষ স্থান রচিত হইয়া আছে। দেশের প্রচলিত আইনভঙ্গকারী ধরা পড়িলে বিচারে তাহার শাস্তি হয়। নীতি ভঙ্গের ফলে যে-পাপ হয় তাহা কেবল ধরা পড়িয়া আদালতের শাস্তি পাওয়ার মধ্যেই সীমীত থাকে না। সে-নীতি ভঙ্গের ফলে যে-পাপ হয় তাহার শাস্তি যেন আপনা আপনিই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। মানুষ তখন আইন-আদালতের সীমা ছাড়াইয়া কোনও অদৃশ্য নিয়ন্তা বা শাসকের বিধানানুসারে একদিন শাস্তিভোগ করিতেই হইবে মনে করে। এইরূপ নানান রকমের মানসিক ক্রিয়ার ফলে নীতি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। নীতি ভঙ্গ করার ফলে বাস্তবে শাস্তি না পাইলেও, মানসিক শাস্তি ভোগ করিতে হয়। পাপবোধ হইতে নিজেকে পাপী বলিয়া মনে করিতে থাকার ফলে সর্বদা নিজ সম্বন্ধে হেয়-বোধ ও শাস্তির সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠা জাগিতে থাকে। এই কাল্পনিক শাস্তির সম্ভাবনায় শান্তি লোপ পায়। ইহা একপ্রকারের স্বরচিত শাস্তি বলা যাইতে পারে। এই ধরনের নীতিবোধ অবিবেচনার ফলে সময় সময় এমন সর্বব্যাপী হইতে দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্রে তাহা জীবনের স্বাভাবিক সুখের বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি বিশেষ ক্ষেত্রে নীতিবোধের অতি পীড়নের ফলে মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়।

নীতিবোধের দুইটি প্রধান দিক আছে। একটি আদর্শের দিক, অর্থাৎ বিশেষ কোনও আদর্শের দিকে চালিত হইলে যাহা অবশ্যপালনীয় বা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা নীতি। আর অপরটি বাধা-নিষেধের দিক, অর্থাৎ কোনও আদর্শের পথে যাহা পালন করিলে বা পালন না করিলে সে-আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। পূর্বে বলিয়াছি নীতিবোধ দেশ-কাল-পাত্রের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। একই দেশে, একই কালে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন নীতিবোধ কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। প্রথমতঃ আদর্শের কথাই ধরা যাউক। আমাদের জীবনে আদর্শ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে তাহা বুঝিতে পারিলে বিষয়টি সহজ হইবে। নবজাত শিশু কোনও নীতিবোধ লইয়া জন্মায় না। যে-দেশে যে-পরিবারে যে-অবস্থায় তাহার জন্ম তাহার সেই পারিপার্শিকের উপর তাহার জীবনের নীতি-বোধ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা হইতে শিশু ক্রমে বুঝিতে পারে এমন কতকগুলি আচরণ বা কর্ম আছে যেগুলি তাহার অভিবাবক বা স্নেহ-ভালবাসার পাত্রের নিকট হইতে সমর্থন পায় না—তাহারা বিরক্ত হয়, শাসন করে। ফলে শিশুর সুখভোগের ক্ষেত্রে বাধা পড়ে। অভিভাবক যাহা পছন্দ করেন না সেইরূপ কিছু করিলে বা বলিলে শিশুকে শাসনের দুঃখভোগ করিতে হয় এবং তাঁহাদের স্নেহভালবাসা হইতেও কিছু পরিমাণে বঞ্চিত হইতে হয়। শিশুর যে-অবস্থায় বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পুষ্টি সাধন হয় নাই সেই প্রাথমিক জীবনের দিনগুলিতে

বয়স্কদের স্নেহভালবাসাই শিশুকে শান্তি দিতে পারে। বুঝিবার ক্ষমতা তখন কম থাকায়, এবং অভিজ্ঞতার অভাবে শিশু বাস্তবের সামান্য সমস্যারও কোনও সুমীমাংসা করিতে পারে না। এই অবস্থায় একদিকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে যেমন সে কাল্পনিক নানান ধারনা করে তেমনই ঐ কাল্পনিক বাস্তব অবস্থার কোনও পরিবর্তন বা সমস্যার কোনও সমাধান নিজের ক্ষমতার বাহিরে মনে করিয়া শিশু বয়স্কদের আশ্রয় নেয়। বয়স্কেরা সেই সব অতি জটিল দুর্বোধ্য অবস্থার সহজ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, শিশুর কষ্ট সহজেই দূর করিয়া দিতে পারেন, তাহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারেন ইত্যাদি দেখিয়া শিশু ক্রমেই বয়স্কদের উপর বেশী করিয়া নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এমন হয় যে বয়স্কদের সহায়তা ভিন্ন তাহার সুখের সীমা যে অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে তাহা সে বুঝিতে পারে। শিশুর সুখে যে যতবেশী সহায়ক সে ততবেশী তাহার প্রিয় ও কাম্য হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মাতা এবং পিতাই শিশুর জীবনে এই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। অবশ্য এমন অনেক মানুষ আছে যাহারা জন্মের পর হইতে পিতা-মাতার সহিত কোনও সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায় নাই, অনেকের জন্মের পুর্বেই পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প পরেই মাতারও মৃত্যু ঘটিয়াছে বা বিশেষ কারণে শিশুর সহিত তাহাদের আর যোগাযোগ থাকে না। এমন অবস্থায় যে বা যাহারা তখন শিশুর প্রয়োজন মিটায় তাহাদের প্রতিই শিশু আসক্ত হয়। তাহারাই তখন শিশুর স্নেহ-ভালবাসায় পিতামাতার স্থান অধিকার করে। শৈশবাবস্থায় পিতামাতাকেও শিশু ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহার আপন মনের মত করিয়া সে তাহাদের সম্বন্ধে একটা কল্পনা গড়িয়া তুলে। সেই মনশ্চিত্র তাহার নিকট বাস্তব মাতা পিতা অপেক্ষা অধিক সত্য। কেবল শিশু সম্বন্ধেই বা এই কথা বলিব কেন? কমবেশী আমরা সকলেই তো এই প্রকার মনশ্চিত্রকে আশ্রয় করিয়াই চলি। ইহার ফলে সংসারে জটিলতা বাড়ে। আমি যাহা নিজের মনে অপর একজনের সম্বন্ধে গড়িয়া লইয়া চলিয়াছি, বাস্তবক্ষেত্রে সে যদি কোনও সময় ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলিয়া অতি স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় তবে আমরা আহত হই, রুষ্ট হই, দুঃখ পাই। আমাদের এই সকল মানসিক প্রতিক্রিয়া যে আমাদের নিজের ভুল বুঝিবারই ফল তাহা একটু চোখ মেলিয়া, খোলা মনে বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যে কথা বলিতেছিলাম আবার সেই আলোচনায় ফিরিয়া যাই। শিশুর প্রাথমিক জীবনের ভাল-লাগার এবং ভালবাসার পাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহার যে-ধারণা তাহাই তাহার পরবর্তী জীবনের আদর্শের ভিত্তি। তাহাদের সেই গুণই ভাল, কাম্য, তাই সে সেই কাম্য জিনিস চায়। একটু লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে অনেকের আদর্শই এই শৈশবীয় রঙে রসে সৃষ্ট আদর্শের পর্যায়ে থাকিয়া যায়। জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত বাস্তববোধ দ্বারা তাহার উপযুক্ত সংশোধন বা পরিমার্জন হয় না। এই জন্য হয়তো সেই আদর্শ এক রকমের ভাব-বিলাসের মত হইয়াই থাকিয়া যায়, না হয় অপরদিকে অতিমাত্রায় রুক্ষ বা চণ্ডপন্থী মনে হওয়ায় বাস্তবজীবনের বিভিন্ন কার্যে নানান বাধা ও সমস্যার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় আদর্শের পথে চলিতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখা দিতে পারে। নিজেকে অপরের তুলনায় অতি মাত্রায় হেয়, নিকৃষ্ট, পাপী ইত্যাদি মনে করিয়া জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে জর্জরিত জীবন যাপন করিতে থাকে। যে-সুখের আশায় মানুষ আদর্শ গড়িতে চায় এই ভ্রান্তি তাহারই মূলোচ্ছেদ করে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। চুরি করা খারাপ, অনেকেই ইহা মানিবেন। অনেকে ইহা অন্যায় বলিবেন, অনেকে ইহা পাপ বলিবেন। বেআইনী ও অন্যায় বা

পাপ এই দুই ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যাহা আইনসম্মত নহে এমন কাজ করিতে আমাদের ভয় বা দ্বিধা হইতে পারে। সে-ভয় হইল ধরা পড়িলে শাস্তি-পাওয়ার ভয়। কিন্তু অন্যায় বা পাপবোধের মধ্যে ধরা পড়িবার কথাটা বড় নহে ; অন্যায় করিলে তাহা কোনও এক অজানা শক্তির নিকট বিদিত হইবেই এবং সেজন্য কোনও না কোনও রকমের শাস্তি, ক্ষয়ক্ষতি, রোগশোক ইত্যাদি ভোগ করিতেই হইবে। এ জীবনে না হইলেও কৃতকর্মের ফল পরজীবনে ভোগ করিতেই হইবে এরূপ ধারণা অনেকের মনে থাকে। এই শ্রেণীর লোক চুরি করাকে পাপ মনে করিলে শাস্তির ভয় তাহার হইবেই। যদি কখনও চুরি করে বা চুরির ইচ্ছা মনে জাগে তবে তাহার ফলভোগের চিন্তায় সে কাতর হইতে থাকে। চুরি করা কেন অন্যায়, কিসের পাপ, পাপ কী এ সমস্ত প্রশ্ন তাহার মনে স্থান পায় না। নিজের মনের ধারণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাস্তি অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া উৎকণ্ঠায় ভুগিতে থাকে। অহেতুক অশান্তি তাহার বাড়ে। নিজেকে হেয়, খারাপ ইত্যাদি মনে করিয়া সঙ্কুচিত হয়। যে বাস্তব বিচার করিয়া চুরি করা খারাপ বলিবে, সে বুঝিবে চুরি করার ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আইনে নিষেধ না করিলে সমস্যা জটিল হয়। যে কেহ তাহার নিজের ইচ্ছা মত যদি অপরের জিনিস লইয়া যায়, তবে কাহারও কোনও নিরাপত্তা থাকে না। প্রয়োজন মত কেহ নিজের জিনিস পাইবে এ আশাও করিতে পারে না। এ অনিশ্চয়তা যেমন অসুবিধাকর তেমনই অশান্তিকর। আমার জিনিস সুবিধা পাইলেই আর কেহ লইয়া যাইবে, সেজন্য সর্বদা আমার নিজের জিনিস রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে—ফলে অন্য কাজে মন দেওয়ায় বাধা হইবে। বাধা দিতে গেলে মারধর এবং পরিণামে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে আসিয়া দাঁড়াইবে। আদিম এই অবস্থায় অনিশ্চয়তায় ভুগিয়া বহু যুগের অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ এরূপ কাজ অন্যায় বলিতে শিখিয়া মুলতঃ নিজের এবং পরক্ষে সকলের জীবনযাত্রা কিছুটা সহজ করিবার পথ বাহির করিয়াছে। প্রত্যেক নীতিবোধের পিছনে এইরূপ কোনও বাস্তব প্রয়োজন না থাকিলে তাহা সার্থক হইতে পারে না। কেবলমাত্র ভাবাবেগের উপর কোনও সত্য জীবনে প্রয়োজনীয় বা স্থায়ী হইতে পারে না। বস্তুজগতের সহিত ভাবজগতের সার্থক সমন্বয় জীবনের সফলতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমার ইচ্ছামত আমি যাহা করিতে পারিব, অপরের ইচ্ছামত তাহাকেও সে-কাজ করিতে বাধা দিবার আমার উপায় থাকে না, কোনও যুক্তি থাকে না। কেবলমাত্র নিজের সুখসুবিধা এবং ভাল-লাগা লইয়া সমাজ চলিতে পারে না। নিজের সুখে অপরের বাধা আমার কাম্য না হইলে, অপরের সুখেও আমার বাধা দেওয়া অপরের কাম্য হইতে পারে না। এই দুই অবস্থার সমন্বয় না হইলে সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না। উভয়কেই নিজের স্বার্থ কিছু ছাড়িতে হয় এবং অপরের সুখসুবিধার কথা ভাবিয়া চলিতে হয়। এমনকি আবশ্যক হইলে নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের সুখের চেষ্টা করিতে হয়। অপরের সহিত এই পরিমাণে একাত্মতাবোধ না জাগিলে সমাজ-গঠন সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে এই কথা আমাদের সকল কামনা-বাসনা মিটাইবার সম্বন্ধেই বলা চলে।

শিশুর যাহা ভাল লাগে, যাহাকে ভাল লাগে তাহার সম্বন্ধে নিজের ধারণা হইতেই আদর্শের সূচনা এ কথা বলিয়াছি। অভিজ্ঞতার ফলে এই ধারণা যদি ক্রমে পুষ্ট ও বাস্তবধর্মী না হয়, তাহা হইলে আদর্শস্থাপনের মধ্যে মনের যে-বিশেষ তাগিদ থাকে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে পারে, ইহাও বলা হইয়াছে। এখানে বলা দরকার যে আমার আদর্শে আমি যে আমার মাতা পিতা বা বন্ধুদের

নিকট হইতে পাইয়াছি এ কথা আমাদের মনে থাকে না। সত্য বলিলে এ সত্য কথাটা আমরা নিজেরাই জানি না। মনে থাকে না কবে কাহাকে কী ভাবে দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি। ব্যক্তি লোপ পাইয়া যায়, কেবল ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অনুভূতির অভিজ্ঞতাটুকুই থাকিয়া যায়। আমার সেই অভিজ্ঞতাই আদর্শ গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগে। ভাল-লাগার এই চাহিদা আমার মনে কাজ করে। যাহাকে ভাল লাগে তাহাকে আমি যেমন আমার কল্যাণকামী বলিয়া বুঝি বা যেমন চাই সেইরূপে নিজের মনের মধ্যে স্থান দিই। এই অন্তঃক্ষেপ (introjection) মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের আদর্শ প্রথম হইতে ক্রমে গড়িয়া উঠে। ক্রমে তাহা বদল হইতে পারে। নূতন রূপ নূতন ব্যাপ্তিতে তাহা জীবনে প্রকাশ পায়। ইহার ফলে অনেক আপাত সুখও ত্যাগ করি, মনে করি তাহারা আমার ভাল চায়। আমরা যে সকল কাজে আদর্শ অনুসরণ করি এমন নহে। তবু মোটামুটি একটা আদর্শ আমাদের থাকে। ভাল-মন্দের এক রকমের বিচার গড়িয়া উঠে। অবশ্য একটু ভাল করিয়া দেখিলে, আমাদের অধিকাংশের জীবনেই যে কোনও আদর্শ নাই, আমরা যে গতানুগতিক রীতিতে বিনাবিচারে বিনা আদর্শে চলি তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমরা অধিকাংশ মানুষই উত্তর দিতে পারিব না; বা এমন কথা বলিব যাহা নিজেদের জীবনে আমরা পালন করি না। তবু আদর্শের গুণগান করিতে কিছু কম করি না। এই গতানুগতিকতার মধ্যেও যে, অতি ক্ষীণ হইলেও, একটা আদর্শানুসরণ আছে তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমস্যার এত সহজ সমাধান সম্ভব নহে। যাহার সম্বন্ধে আমি আপন মনে ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন রচনা করিয়া অস্পষ্ট এক মানসরূপ গড়িয়াছি তাহার যে সমস্তটাই আমার শিশু মনের নিকট ভাল লাগিয়াছিল তাহা নহে। তাহার ব্যক্তিত্বে এমন অনেক বাধানিষেধ থাকে যাহা আমার প্রিয় না হইলেও প্রিয়জনের নিকট হইতে প্রীতিলাভের আশায় মানিয়া লইতে বাধ্য হই। যাহাদের সুখকর ভাল-লাগার অংশগুলি একত্রিত করিয়া মনগড়া আদর্শ রচনা করি তাহাদের আবার ঐ বিধি-বাধা-নিষেধগুলি লইয়া আমাদের মনে এক শাসক আসন জুড়িয়া বসে। ফলে আদর্শানুসরণের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিতে যে-কষ্ট ইত্যাদি দেখা দেয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই শাসকের শাসনের হুমকি ও কড়া নির্দেশেই সম্ভব হয়। মনে রাখিতে হইবে আমরা আদর্শের মূল সম্বন্ধে যেমন কিছু মনে রাখি না, এই শাসনের পিছনে যে শাসকের রুদ্ররূপ আমাদের মনে গৃহীত হইয়া কাজ করে সে-কথাও আমরা ভুলিয়া যাই। ফলে কেবল আদর্শ ও সেই সংশ্লিষ্ট নানান শাসন, নির্দেশমাত্র আমাদের মনে থাকিয়া যায়। সহজ সাধারণ মাত্রার মধ্যে থাকিলে যাহা সমাজজীবনে কল্যাণকর রূপ লইয়া দেখা দিতে পারে, অতিমাত্রা বা মাত্রাধিক্য হইলে তাহাই আমাদের মানসিক জীবনে বিপর্যয় ঘটাইয়া মানসিক রোগের সৃষ্টি করে।

আমাদের আদর্শ গড়িয়া উঠার সাথে সাথে নীতিবোধ জাগিতে থাকে। যে সকল আচার-ব্যবহার, চিন্তা, ও অনুশীলন আমাদের আদর্শের অনুকূল ও আদর্শলাভের সহায়ক ও নির্দেশক সে সমস্তই আমাদের নীতির পর্যায়ে পড়ে। যে সকল চিন্তা কর্ম ইত্যাদি তাহার বিরোধী তাহাই আমাদের দুর্নীতি-বোধ জাগায়।

নানান অর্থে নীতি শব্দের ব্যবহার যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে মূল সূত্র কী তাহাও বলিয়াছি। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন নীতির মধ্যে ধর্ম ও সমাজবিষয়ে নীতিবোধই আমাদের মনে প্রধান ও প্রবল। বর্তমান ভারতের সমাজব্যবস্থা শিথিল হওয়ায় সমাজ-

নীতিও দুর্বল হইয়াছে। সমাজের পুর্বাদর্শ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নূতন কোনও সমাজচেতনা আজও আমাদের জাগে নাই বলিয়া বাঁধনহীন, বিচ্ছিন্ন বা স্বেচ্ছাচারিতার নানান বিকৃত রূপ সমাজ-জীবনে দেখা দিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। জীবনীশক্তি যখন দুর্বল হইয়া পড়ে তখন পুরাতন নিয়ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া দিনযাপন করা সহজ এবং তাহাই সাধ্য। দুর্বলের পক্ষে নূতন কিছু শক্তিসম্পন্ন প্রাণবন্ত ব্যবস্থার প্রচলন করা অসম্ভব। প্রাণশক্তি তথা জীবনীশক্তি সজাগ থাকিলে মানুষ নিজের বেগে একদিকে যেমন পুরাতনের বাধা লঙ্ঘন করিতে পারে তেমনই নূতন পথে চলিতেও দ্বিধা করে না। সে পথ ভুল হইলে, দুঃখকর হইলে, আবার নূতন করিয়া পথের সন্ধান করিতে তাহার কোনও দ্বিধা থাকে না। জীবন আপন গতিতেই গড়িয়া তুলিতে পারে। ভুল করিলে তাহা সংশোধন করিতে পারে, আবার ভুল করিতেও ভয় পায় না। নিজ শক্তিতে শত ভুল সে প্রয়োজনমত সংশোধন করিয়া চলিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহার নীতি প্রয়োজনমত বদল করিতে পারে। নীতি তাই যুগে যুগে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। বহু অভিজ্ঞতায় মানুষ যাহা জানিয়াছে তাহা জীবন চালনায় সে প্রয়োগ করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যে-দেশে কিছুকাল আগেও সতীদাহ নীতিগতভাবে গৃহীত হইয়াছিল আজ সেই দেশেই বিধবা-বিবাহ, এমন কি অপরের একবার বিবাহিত স্ত্রীকেও বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে পুনরায় বিবাহ করিতে বর্তমান সমাজে দুর্নীতি বলিয়া মনে করা হয় না। পুনরায় বিবাহের জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া আইন বাঁচাইয়া বিবাহ করিলেও কেহ দুর্নীতি বলিয়া প্রতিবাদ করেন না। সমাজের এইদিকের কথা বাদ দিয়া ধর্মানুষ্ঠানের নীতি সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও একই কথা বলা চলে। সাধারণ মানুষ কোনও কালেই বিশেষ ধার্মিক ছিল কিনা সন্দেহ। কল্পিত সত্যযুগের সাধারণ মানুষ এই ঘোর কলিযুগের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী ধর্মনীতি মানিয়া চলিত এমন কথা বলা চলে কি? মানুষের মনের দিক হইতে বলিতে গেলে এ কথা স্বীকার করা চলে না। পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই ইহার কারণ বুঝা যাইবে। নীতির ভিত্তি আমাদের নিজের কল্পলোককে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহার উপর প্রয়োজনের মূল্য আসিয়া নীতিকে যত সার্থক করিয়া তুলিতে পারে, কেবলমাত্র আদর্শের খাতিরে নীতির সেবা জীবনে তত সার্থক হইতে পারে না। প্রয়োজনের রদবদল হইলে তাই নীতিরও বদল হয়। সমাজের শিক্ষার চাপে এক এক সময় এক এক আচরণের মোটামুটি নিয়ম মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া থাকে। সাধারণ মানুষ বিনাবিচারে, যেন বাধ্য হইয়াই তাহা পালন করিয়া চলে। ইহাকে আর যে নামই দেওয়া যাউক, নীতিবোধ বলা চলে না। মানুষের মনে ক্রমে এই বাধানিষেধের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রথমে লুকাচুরি করিয়া সে নীতি ভাঙ্গিতে শুরু করে, পরে তাহা প্রকাশ্য সমাজে আচরণ করিতে থাকে। সমাজনীতি বা ধর্মনীতির তাই পরিবর্তন ঘটিতে থাকে।

নীতির প্রয়োজন হয় আমাদের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাইয়া তাহা রুদ্ধ করিবার জন্যই। সুতরাং যেখানেই নীতি খাড়া করি সেখানেই প্রবৃত্তির প্রবল অস্তিত্ব আমরা প্রকাশ করি। সেই প্রবৃত্তি ও মনের সেই ইচ্ছা আছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার প্রয়োজনবোধে নিয়ম, নীতি ইত্যাদি মানুষ রচনা করে নিজের নানান ইচ্ছাকে বাঁধিবার জন্য। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে কাম ও আক্রম ইচ্ছাই অধিকতর প্রবল। সুতরাং মানুষের গড়া নীতির মধ্যে এই দুই প্রবৃত্তির প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতিই সর্বাধিক দেখা যায়। এখানে কাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সাধারণতঃ

আমরা কাম বলিতে যৌন-কামই ধরিয়া লই। সর্বপ্রকার ভোগলিপ্সাই কামজ। এই অর্থেই কাম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। মানুষের কাম ও আক্রম এই দুই প্রবৃত্তিই আমাদের স্বভাবের আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে প্রধান। কামজ-ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নানান নীতির প্রয়োগও তাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা সর্বপ্রকারের কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি খুঁজি। সুযোগ সুবিধা পাইলে মানুষ তাহা মিটাইতে চেষ্টা করে। কোনও কোনও সময় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যও আমরা নীতি খাড়া করি। আক্রম প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষের অপর মানুষকে হত্যা করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়। ইহাতে সমাজ-জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেওয়ায়, অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ হত্যা দুর্নীতিকর বলিয়া প্রচার করিল। কিন্তু কোনও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব নয়। যাহা ইচ্ছামত প্রকাশ করা শাস্তির যোগ্য, সেই হত্যাই দেশরক্ষা বা আত্মরক্ষার নামে প্রশংসার যোগ্য হইয়া উঠে। কামের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি আমরা অনুসরণ করি। যে-ভালবাসা সমাজের নীতিবিরুদ্ধ, কাব্যে সাহিত্যে যুগে যুগে আর্টের নামে আমরা সেই প্রেম-ভালবাসারই প্রচার দেখিয়া মুগ্ধ হই, প্রশংসা করি। নগ্নতা নিন্দনীয় হইয়াও চিত্রে, ভাস্কর্যে ও অন্যান্য কারুকলায় তাহারই বহুল প্রকাশ সর্বযুগে আদরণীয় হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। যাহা মানুষের সমাজে কাম বলিয়া নিন্দা করা হয়, দেবতাদের লীলার নামে অবাধে সেই কামই প্রেম নামে প্রচারিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধা পায়। মনের সম্মুখে একটু পর্দা টানিয়া আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথার মাধ্যমে, উপলক্ষে, আমাদের অবদমিত (repressed) ইচ্ছা রাধাকৃষ্ণের সহিত ঐকাত্মবোধ (identification) করিয়া মিটাইয়া লই। যে-নীতি আমাদের ইচ্ছার সহজ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে সেই নীতিই আমাদের কৃষ্ণলীলা ভোগ করিতে প্রণোদিত করে। একদিকের প্রয়োজনে যাহা রোধ করি, অপর দিকে সেই রুদ্ধ প্রবৃত্তি একটু পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ হইয়া পরোক্ষভাবে ভোগ করিবার পথ দেখাইয়া দেয়। প্রবৃত্তি মরে না; প্রকাশের রূপ বদল করে মাত্র। যদি প্রকাশের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া যায় তবে প্রবৃত্তির অন্য উদ্গতি (sublimation) সম্ভব না হইলে মানসিক রোগ দেখা দেয়। কাম ও আক্রম প্রবৃত্তির পরেই আমাদের আহারবিহারের ক্ষেত্রে নীতির প্রাবল্য দেখা যায়। কারণ একই; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের যে নীতিবোধ যুক্তিহীন ভয় বা পাপের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা শিশুসুলভ মনোভাবের প্রকাশক। যাহা আমাদের বা পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া যুক্তিসঙ্গত রূপ লইয়াছে সে-সকল সত্য, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং সে-পরিবর্তনে মনে কোনও পাপবোধ জাগে না। প্রয়োজনের জন্যই যে-নিয়ম করা হয়, সে-প্রয়োজন ফুরাইলে বা প্রয়োজনের রকম বদল হইলে পূর্ব নিয়মের বিলোপ বা পরিবর্তন অবশ্যকরণীয় হয়। তাহা না হইলে অন্ধ নিয়ম পালন জীবনের স্রোতে পাকের সৃষ্টি করিয়া অগ্রগতি যেমন রোধ করে তেমনই নিজের ও পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন পঙ্কিল করিয়া তুলে। শিশুর যখন যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনার ক্ষমতা থাকে না তখন শিক্ষার জন্য যে বাধানিষেধ আদেশ-নির্দেশ বা অনুশাসন বয়স্কদের নিকট হইতে মানিয়া চলিবার প্রয়োজন হয়, শিশু ক্রমে বড় হইয়া সে-সকল নিষেধ-নির্দেশকে যদি বিনাবিচারে না বুঝিয়া পূর্বের মতই নিষেধমাত্র মনে করিয়া তাহা অমান্য করিলে অন্যায়বোধের পীড়া অনুভব করে, তবে বুঝিতে হইবে যে মানসিক অবস্থায় সে তখনও শিশুর মতই রহিয়া গিয়াছে এবং বয়সোচিত পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এই না-বুঝিয়া নিয়মপালনে হয়তো বা কিছু কিছু সুবিধা কাহারও

কাহারও হইতে পারে, কিন্তু তাহা সম্মানের যোগ্য হইতে পারে না। কেবলমাত্র বয়সে এবং দেহের গঠনে বাড়িলেই যে মানসিক শক্তিতে যোগ্য পরিপক্কতা লাভ করা হয় না, ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং ইহা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি। বুদ্ধি বিচারশক্তি যাহার সাধারণ মান হইতে কম তাহার পক্ষে নিজে হইতে অবস্থা বিচার করিয়া চলা কঠিন এবং অনেক সময় বিশেষ ভুল করিবার সম্ভাবনা তাহার থাকে না এমন নহে। নীতি বলিয়াই নীতি পালন করাকে আমাদের নিজ প্রবৃত্তির সঙ্গত পরিচালনা সম্বন্ধে নিজের শক্তিহীনতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকারের বর্ম বা রক্ষাকবচ বলা যায়। প্রবলের নীতি ও দুর্বলের নীতি এক নহে। প্রকৃত শক্তিমানের নীতির বালাই নাই, তাহার সবলতা, বিচারশক্তি নীতির স্থান অধিকার করে। ইংরাজীতে চলতি কথায় বলে—'যুদ্ধ ও ভালবাসায় খারাপ বা অন্যায় বলিয়া কিছু নাই'। কিন্তু শিশুকাল হইতে যদি ভুল করিয়া শিখিবার সুযোগ বন্ধ করিয়া কেবল নিয়মের বাঁধনে তাহাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সে-শিশুর চরিত্রে বাস্তবজ্ঞানের অভাব সুস্পষ্ট হইয়া তাহার জীবনের গতি আবেগপ্রধান হইতে পারে এবং পাপ ইত্যাদি নানান ধারণা হেতু উৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া তাহা সহজ সুন্দর সুখের জীবনের বাধা হইয়া উঠিতে পারে।

যুদ্ধ, বিপ্লব বা কোনও বড় আন্দোলনের সময় বা তাহার পূর্ব হইতেই প্রচলিত অনেক নীতি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ও পরে এবং ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় হইতে পূর্বাচরিত বহুনীতি পদ দলিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বভাবের যে-প্রবৃত্তিকে যুগ যুগ ধরিয়া নানান বাঁধনে বাঁধিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, বাহিরের নূতন এক বৃহত্তর সংঘর্ষের সময় সকল বাধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, সেগুলি আবার সজাগ হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। মূল প্রবৃত্তি মরে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ভারতবাসী আজও নিশ্চয়ই ভুলিয়া যায় নাই। সে সময় হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ, দাহন ইত্যাদি যে পরিমাণে ও সম্প্রদায় বিশেষের প্রশংসায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হইতেই আমাদের প্রবৃত্তির মূল চেহারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যাঁহারা ঐ সকল আচরণে যোগ দেন নাই তাঁহাদের স্বভাবে যে ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি নাই এমন নহে। বিপ্লবের বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নীতির পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে যে-আদর্শের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহা যে পরিমাণে সক্রিয় থাকে সেই পরিমাণেই প্রবৃত্তিকে দমিত করিয়া রাখে মাত্র। কিন্তু অবস্থা বিশেষে দমন করা আর চলে না। ফলে মুনিদেরও মতিভ্রম হয়।

অতি সংক্ষেপে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহাতে নীতিবোধ কেমন করিয়া গড়ে, তাহার সুস্থ পরিণতি কী, এবং তাহা যে পরিবর্তনশীল এই কথাই বিশেষ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের জীবনে প্রেম বা ভালবাসা চিরকাল মূল্য পাইয়া আসিয়াছে। ভালবাসার টানে এই সেদিনও ইংলণ্ডের রাজা সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। এমন কত মানুষের জীবনেই, অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবেশে, একই ঘটনা ঘটিতেছে তাহার হিসাব কাহারও জানা নাই। সমাজের সর্বস্তরে ভালবাসা যে প্রচলিত নীতি অগ্রাহ্য করিয়া বা এড়াইয়া গিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রমাণিত করে, সহজ মন লইয়া একটু দেখিবার চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই প্রকার ঘটনাকে দুর্নীতি বলিয়া হেয় করিবার চেষ্টা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং ইহা ঐ শিশুসুলভ অপ্রকৃত বিচারহীনতার পরিচায়ক। যথেচ্ছ কামাচার সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু জাগ্রত সজীব সবল মানুষ নিজের ভালবাসা কাম ও

অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে কত সহজভাবেই যে গ্রহণ করিতে পারে তাহা আমাদের মহাভারতের নানান উপাখ্যান হইতে ও বাৎসায়নের কামসূত্র পড়িলে বুঝিতে কঠিন হয় না। সকলপ্রকার ভালবাসার মূলেই আছে আমাদের কামনা অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির কোনওপ্রকারের চরিতার্থতার প্রকাশ ও চেষ্টা। ভালবাসাকে অনেকেই স্বর্গীয় আখ্যা দিয়া পূজার নৈবেদ্য সাজান; কিন্তু কামের উল্লেখমাত্র শুনিলেই আঁৎকাইয়া উঠেন এমন শুচিবাইগ্রস্তলোকের অভাই নাই। ইহা একপ্রকারের অবদমনের (repression) ফলে আত্মরক্ষার বাঁধ বাধিয়া আত্মনিপীড়ন ছাড়া আর কিছু নহে। এই মনোভাব সুস্থও নহে, স্বাভাবিকও নহে; সুতরাং শ্রেয়ও নহে। বর্তমানকালে আমাদের সমাজ তাহার স্বকীয় শক্তি হারাইয়া নিয়মের দোহাই দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে একদিকে যেমন চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে সকল বাঁধন ভাঙিয়া দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকেও তারিফ করিতেছে। ইহার কোনওটাই সুস্থ নহে; কিন্তু ইহাই সমাজের বিশেষ অবস্থায় স্বাভাবিক, তাই এমন ঘটে। ইহাকে অস্বীকার করাও ভুল। সময় আবার নূতন নীতি গড়িয়া তুলিবে। কাব্যে সাহিত্যে যে-ভালবাসা সম্মানিত হয়, কাম্য হয়, জীবনে তাহার প্রকাশ নিন্দনীয় হইবে ইহার পিছনে যুক্তি নাই। যদি সাহিত্যকে মনের নানান ইচ্ছার প্রকাশের সুযোগ মাত্র মনে করিয়া লওয়া যায় এবং এই সুযোগ থাকায় বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে সেই সকল ইচ্ছার প্রকৃত আচরণ বহু পরিমাণে সংযত করা সম্ভব এরূপ মনে করিলে আর কিছু বলিবার থাকে না। তেমনই খেলার মাঠে, দাবাখেলায়, শিক্ষায় ও অন্যান্য নানান ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মূলে যে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি কাজ করে এবং অন্যান্য ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইয়া এই ইচ্ছা প্রকাশ পায় তাহাও স্বীকার করার প্রয়োজন আছে। মন এ সমস্তই চায়—কেবল আচরণটুকু সময়োপযোগী করিতে পারিলেই তাহা নীতি-গ্রাহ্য হয়। এই উপযোগিতার প্রশ্নের সহিত বাস্তব পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রবৃত্তির গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া চলে না, তাহাতে বিকার দেখা দেয়। প্রবৃত্তির বেগকে বাহিরে আসিবার কোনও না কোনও পথ দিতেই হইবে; মানুষ তাহা না দিয়া সুস্থ মনে বাঁচিতে পারে না। এইজন্যই মানুষের গড়া সমাজের নিয়মের মধ্যে সকল প্রবৃত্তির প্রকাশের কিছু কিছু আঁকাবাঁকা পথ মানিয়া লওয়া হয়। মানব-মন ও তাহার জীবন এই পটভূমিকায় দেখিলে নীতি সম্বন্ধে অন্ধ ঘোরালো জটিলতা দূর হইতে পারে। কোনও বিকারই নীতির উদ্দেশ্য নহে। জীবনের সুস্থতা ও মধুরতার জন্যই নীতির প্রয়োজন। নীতি পূজা পাইবার যোগ্য নহে। নীতিই যখন পূজ্য হইয়া দেবতার স্থান অধিকার করে তখন আমাদের জীবনের গতি লুপ্ত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। জীবনের জন্য নীতি, নীতির জন্য জীবন নহে। উদ্দেশ্য ভুলিয়া যখন অনুষ্ঠান বড় হইয়া উঠে তখনই মানুষ প্রকৃত নীতি-ভ্রষ্ট হয়। জীবনের সত্যের উপর আস্থা রাখিতে পারে বলিয়াই শক্তিমান নিয়ম ভাঙে, নিয়ম গড়ে। নীতিকেই সত্য না করিয়া মানুষ নিজেকে, জীবনকে সত্য করিয়া তুলিলে প্রকৃত মূল্য পাইতে পারিবে। নীতিকেও সহজ বিচারের সম্মুখীন করিতে হইবে। অর্থাৎ বিচার করিয়া চলিতে হইবে—তবেই মানুষ পরিণত অবস্থার পরিচয় দিবে। তাহা না হইলে কেবল নীতি ইত্যাদির বচনের শাসন অন্ধভাবে মানিয়া চলিলে মানুষের প্রকৃত গৌরব তাহাতে প্রচারিত হয় না; বরং মনের যে প্রাথমিক শিশু-ভাবের পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই অপরিণত মনোভাবেরই তাহা পরিচয় দেয়। এই পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই। ইহাতে আমাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

রামধনু

নবেন্দু কেশরী

[মনের বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতি লেখক নিজের ভাষায় গাঁথিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। লেখকের নানান রসের, নানান বর্ণের সংক্ষিপ্ত এই লেখাগুলির "রামধনু" নামকরণ সার্থক হইয়াছে। মনের বহুল ভাবের পরিচয় এই লেখাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া এই পত্রিকায় তাহা ক্রমে প্রকাশ করা হইবে।]

১

সংসারের সব সম্পর্কই দোকানদারী। দেনাপাওনার সম্বন্ধের উপর গড়া। সে-দেনাপাওনা কোথাও বা টাকাকড়ি, মান-সম্মান, নিরাপত্তা, সুখসুবিধা আবার কোথাও বা স্নেহভালবাসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

* * * *

২

নিজের স্বার্থে প্রয়োজন হলে মানুষ অতি সহজেই প্রাত্যহিক জীবনযাপনে, মত ও পথের বদল ক'রে চলে কিন্তু অনেক সময় তা সে স্বীকার করে না।

* * * *

৩

মানুষ লাভ চায়; কিন্তু কোনটা লাভ, কোনটা বা লোকসান তা কি জানে?

* * * *

৪

আমরা সুখ চাই। কিসে সুখী হই তা কি জানি? আশু সুখের তাগিদে চলেছি। ক্ষণিক সুখে যে প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না এই কথাটাই ভুলে যাই।

* * * *

৫

নিজেদের চাপা উৎকণ্ঠার তাড়নায় সুখের পিছনে ছুটে চলি, ক্লান্ত হই। তাই অবিরাম একের পর এক সুখের উপকরণ দরকার হয়।

* * * *

৬

সুখের তাগিদে ছুটে নিজের শান্তি আমরা হারাই।

* * * *

৭

যে আমার দূরের—যে কাছে এল না, আর যে আমার কাছে এসে দূরে স'রে গেল, এ

দুয়ের মধ্যে অসীম-তফাত। কাছে এসে যে দূরে স'রে যায় সে তার মন থেকেই আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এ তার এক বিশেষ মনোভাব। যে দূরেই রয়ে যায় তার এমন কোনও বিশেষ মনোভাব থাকে না বলেই সে যেন কাছে না এলেও তাকে কাছের মনে করা সহজ। দূরে যে স'রে যায় সে আরও দূরের হয়ে যায়; দূরত্ব সে বজায় রাখতে চায় বলেই।

* * * *

৮

মানুষ যে একা, এ কথাটা সইতে না পেরে নানান আয়োজনে উপকরণে সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে সে অপ্রিয় সত্যটাকে ভুলে থাকতে চায়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই অন্যকে মূল্য দেয়।

* * * *

৯

ছোট্ট শিশু আপন মনে হাত পা নেড়ে খেলা করছে, হাসছে, মুখে নানান কলরব ক'রে চলেছে। খুশিভরা চাহনি মেলে মা তাই দেখছে! কী বুঝেছে সেই জানে। তার ভাবনাটুকু সত্য কিনা জানি না; তার আবেশটুকু সত্য।

-

স্বপ্ন রচনা করেও যদি মন বলে 'এই আমি পেলাম', তবে সেই আমার পাওয়া। প্রকৃত পাওয়া বস্তু দিয়ে হয় না। পাওয়াটা আমার অনুভূতি।

* * * *

১১

জীবনটাকে কীভাবে চালাতে চাই. গড়তে চাই, তাই জানি না। কখনও মনে হয় এটা, কখনও মনে হয় ওটা। এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে আয়ু যায় ফুরিয়ে। ফিরে চেয়ে দেখি কতগুলো হিজিবিজি আঁচড়ের দাগ পড়ে আছে, কোনও রূপ তাতে ধরা পড়ে নি।

* * * *

১২

একদা শুভলগ্নে মন যাকে একান্ত আপন ব'লে আপন করলে, অকালে দেখা গেল সে আমায় আপন ব'লে স্বীকার করতে পারে নি। দুজনের মধ্যে পড়ে থাকে সীমাহীন দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদের ব্যবধান।

* * * *

১৩

মন খুলে যে বলতে পারে "আমি পেয়েছি," সে ভাগ্যবান।

১৪

মুখের হাসি, চোখের হাসি, এ সব নামেই হাসি। মন-ভরা হাসি ক'জন হাসতে পারে, শিশুর মত

১৫

বাইরে যাকে চাইতে পারি না, ডাকতে পারি না, মনে মনে তাকে ডাকি, তাকে পাই। বাইরের না-পাওয়ার শূন্যতা মনের পাওয়ার পূর্ণতায় ভ'রে ওঠে।

*   *   *   *

১৬

অনাদরে অবহেলায় যে আমাকে দূরে ঠেলে দিলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় এ উপেক্ষা অসহনীয় এ ভুল আমার কাটবে কবে ?

*   *   *   *

১৭

আমাকে দিয়ে কতটুকু কার প্রয়োজন তাই দিয়ে আমার দাম। প্রয়োজনই মূল্য বিচারের মাপকাঠি। মানুষের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্য কারও কোনও না কোনও প্রয়োজনে আমারও কিছু ঠাঁই আছে, তাই আমার সামান্যটুকুও দাম ক্ষণিকের জন্যে হলেও আমি পাই।

*   *   *   *

১৮

যে চাহে না মোরে, মিছে তারে ডাকা।

*   *   *   *

১৯

নিজের ব্যস্ততায় মানুষ ছুটে চলে, ভাবে তাগিদটা কাজেরই।

*   *   *   *

২০

আমাকে যে সইতে পারে না, আমার মন তার প্রতি বিরূপ না হলেও তার প্রতি আকর্ষণবোধ করে না। এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন আমি তাকে ভালবাসি।

*   *   *   *

২১

কেন শ্রাবণ ঝরে
এই ফাগুন ভোরে।
কেন চাহি যে তারে
যে চাহে না মোরে।

*   *   *   *

২২

জানালায় ব'সে একটা কাক তারস্বরে ডেকে চলেছে। আমার ভাবনা ধারায় বাধা পড়ে। বিরক্ত বোধ করি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাই। দেখি অদূরে কোনও থামের দিকে গলা লম্বা ক'রে দেখছে, ডেকে চলেছে। চেয়ে রইলাম; মনে বিরক্তি-বোধ কি তখন ছিল ?

২৩

জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন অকারণেই মন তলিয়ে যেতে চায়, অস্পষ্ট কী যেন বেদনা অনুভব করে। মনে হয় এ বেদনা অকারণে নয়; তার কারণটা ধরা যায় না বলেই এমন মনে হয়।

*   *   *   *

২৪

যাকে ভালবাসা যায় তার কাছ থেকে ভালবাসা না পেলে নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়। এই দেওয়া পাওয়া না হলে ভালবাসা সার্থকতা পায় না। উভয়ধারার মিলনে যা কূল ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশে সফলতা লাভ করতে পারে, সেই মিলনের অভাবে দেখা দেয় রিক্ততার বালুচর।

*   *   *   *

২৫

আমরা কাজ করি কিছু বাস্তবের প্রয়োজনে, কিছু আত্মপ্রচারের জন্য, আর কিছু আত্মগোপনের জন্য।

*   *   *   *

২৬

শত্রুকেও ভাল লাগে যখন সে আমায় বড় ব'লে মানে।

*   *   *   *

২৭

ঘন বরিষনে যে রোদন ঝরে
সে তব ব্যথিত বেদনা।
ঝরা-পাতা মাঘে উদাসী বেলায়
বুঝেছি সে-সবই কল্পনা।

*   *   *   *

২৮

আমারি রচিত ভুবনের মাঝে
আমারেই আমি খুঁজি।
শত আয়োজনে শত আভরণে
শেষ হয়ে গেছে পুঁজি।

*   *   *   *

২৯

আমার সকলই দিয়েছি তোমারে
জানি না সে কোন কবে।

পথ চেয়ে আমি বসে থাকি একা
তুমি কি আমারে লবে ?

*   *   *   *

৩০

ক্ষণিকের সুখ ক্ষণিকের আশা
ভরে দেয় মোর বুক
ম্লান করে যত ধরণীর ধুলা
জেগে থাকে তব মুখ।

*   *   *   *

৩১

এ যুগের মানুষ অর্থের মোহে বাঁধা পড়ে ভাবছে অর্থই জীবনের প্রধান কাম্য। এক এক কালে মানুষ এক এক বস্তু বা ভাবকে মূল্য দিয়ে তার সেবা ক'রে চলে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাবে তার সে পুজায় দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি তার উপর বর্ষিত হয় না।

*   *   *   *

৩২

আমরা অর্থ ও কাম চাই। কোনও এক পোশাকী ধর্ম যদি তার সহায়ক হয় তবে আপত্তি নেই ; মোক্ষর কথা মনেই পড়ে না।

*   *   *   *

৩৩

নারী, তুমি বুলায়েছ অমৃত পরশ
হৃদয়ে মোর
কণ্ঠে আমার পরায়ে দিয়াছ
মিলন ডোর।

*   *   *   *

৩৪

মানুষ নেশা করে নিজেকে ভুলতে। ভালবাসে সেই একই কারণে। নিজে ভুলতে চায়, পরকেও ভোলাতে চায়। এই ভোলানোর স্বপ্নলোকে আমাদের বাস।

*   *   *   *

৩৫

তোমাকে আজও আমি চিনতে পারি নি, তুমি কি আমাকে চিনেছ ?

*   *   *   *

৩৬

যুদ্ধ যারা করে অপরকে তারা শত্রু মনে ক'রে মারতে উন্মত্ত হয়, হত্যা ক'রে তার উল্লাস জাগে। তবু আমরা মানুষ ব'লে গর্ব বোধ করি।

*　　*　　*　　*

৩৭

তোমার কথা সারা দিন, জাগরণে শতবার মনে পড়ে। ভাবতে ভাল লাগে তোমার কথা। ইচ্ছে করে তোমার যা ভাল লাগে তাই করি। তুমি কি আমার কথা একবারও ভাব? তোমাকে যা দিতে চেয়েছি, কতবার তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। আমার ইচ্ছে তাই বোবা হয়ে গেছে।

*　　*　　*　　*

৩৮

মানুষই মানুষকে স্বর্গের সুখ দিতে পারে। সেই মানুষই মানুষের স্বর্গ ধ্বংস করে দিতে পারে।

*　　*　　*　　*

৩৯

ব্যর্থতার দুঃখ ভুলতে ভগবানকে খুঁজি। এক মনোভাবকে আর এক মনোভাব দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা। সত্য বুঝতে ক'জন চায়।

*　　*　　*　　*

৪০

তোমারেই চাই
　　তবু নাহি পাই
আছ তুমি আছ
　　তবু তুমি নাই।

*　　*　　*　　*

৪১

শিশু এক সময় সামান্য পেয়ে খুশীতে ভরে যায়, আবার কখনও সে আকাশের চাঁদ চায়। আদর পেলে সব চাওয়া ভুলে যায়।

*　　*　　*　　*

৪২

মানুষ সব রকমের ভোগই চায়; বাস্তব পরিবেশ প্রতিকূল ব'লে ভুল করে ভোগের বাসনাটাকেই সে অস্বীকার করে।

*　　*　　*　　*

৪৩

নিজের সম্পূর্ণ রূপটা দেখতে না চাওয়ায় আমরা আধখানা হয়ে আছি।

*　　*　　*　　*

৪৪

তোমার ভালবাসায়
আমায় তুমি গড়েছ
তোমারি অনাদরে
তুমি আমায় ভেঙেছ।

* * * *

৪৫

রাজপথে কত লোক চলে। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি, হঠাৎ কেউ একজন তাকিয়ে দেখে। সবাই চলে যায়। প্রয়োজন নেই, তাই সময় নেই।

* * * *

৪৬

যে-কথা চিন্তা করতে বসি, এক সময় দেখি মন আমার নিজের অজান্তে অন্য কথা ভেবে চলেছে।

* * * *

৪৭

মাঝে মাঝে মন অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শ পেয়ে যেন নূতন আলোর জগতের সন্ধান পায়। কেমন করে বলব তা কী?

* * * *

৪৮

বুকে যা বাজে ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারি না। এ দুঃখ জানাব কাকে?

* * * *

৪৯

মানুষ এতই দুর্বল যে এই বস্তুজগত এবং নিজের জীবনের প্রকৃত রূপ সে সইতে পারে না। তাই ভালবাসার মোহ সৃষ্টি ক'রে, কর্মের জয়গান ক'রে, আদর্শের ধ্বজা উড়িয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে।

* * * *

৫০

ভালবেসে মানুষ ভালবাসা চায়। তা না পেয়েও যে ভালবাসার পথে চলে সে আদর্শের নামে নিজেকেই অন্য একরূপে ভালবাসে।

সমাজ-মনোবিভার দৃষ্টিতে দল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., এলএল. বি. *

সমাজ-মনোবিভার বিষয়বস্তু হ'ল, মানুষের সামাজিক আচরণ। কিন্তু সামাজিক আচরণ বলতে কী বুঝব? সমাজ-মনোবিভায় আন্তর্ব্যক্তিক (inter-personal) পরিস্থিতিকে সাধারণভাবে সমাজ বলা হয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যেখানে মানসিক আদানপ্রদান চলে সেখানে সামাজিকতার উদ্ভব হয়। কাজেই সামাজিক আচরণ আন্তর্ব্যক্তিক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া। এ আচরণ প্রধানতঃ তিনভাবে দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ, দুই ব্যক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হলে তাদের মধ্যে ভাববিনিময় হতে পারে এবং উভয়ে উভয়ের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। দুই পূর্বপরিচিত ব্যক্তি চলেছেন স্বতন্ত্রভাবে আপন কাজে। উভয়েই নিজের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করে চলেছেন। গম্ভীরভাব। হঠাৎ উভয়ের দেখা। মুখে হাসি ফুটে উঠল। কুশল বিনিময় ও করমর্দন হ'ল। এখানে দুই ব্যক্তির আদান-প্রদান হ'ল সামাজিক আচরণ। উভয়ে উভয়ের আচরণকে প্রভাবিত করলেন। কারণ পূর্ব-গাম্ভীর্য দূর হয়ে উভয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল ও করমর্দন ঘটল। দ্বিতীয়তঃ, যখন কোনও ব্যক্তি কোনও দলের সম্মুখীন হয় তখনও সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং সেখানেও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হয় সামাজিক আচরণ। দলের সম্মুখে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে। যেমন ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এলে তাকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। বাইরে সে যেমনই ব্যবহার করুক না কেন, ক্লাসে অর্থাৎ দলের মধ্যে তার আচরণ সংযত হয়ে পড়ে। এখানে দল ব্যক্তিকে প্রভাবিত করছে। তেমনি ব্যক্তিও দলের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন দলীয় নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলটি বিশেষভাবে আচরণ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, দুটি দলের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ার (interaction) ফলে যে-আচরণ দেখা দেয় তাও সামাজিক আচরণ। দলের একক আচরণ থেকে তা পৃথক। যেমন দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ থাকতে পারে। নিজেদের দেশের মধ্যে উভয়ে উভয়কে গালি দিতে পারে। কিন্তু ঐ দেশ দুটির একটি থেকে অন্যটিতে কোনও প্রতিনিধিদল (delegation) গেলে সেখানে তাদের সৌজন্য দেখানো হয়।

অবশ্য আন্তর্ব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও, এ কথা বলা চলে না যে এরূপ আচরণের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে সর্বদা মুখোমুখি উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন কোনও ব্যক্তি অফিসে যাবেন অথবা কোনও সভায় যাবেন; সেখানে যাবার আগে তিনি পোশাক পরবেন। কিন্তু পরবার আগে ভাবতে পারেন যে কোন পোশাকটি পরলে লোকে কি বলবে; কোন পোশাকে তাকে স্মার্ট দেখাবে অথবা কোন পোশাকে ভারিক্কি মনে হবে ইত্যাদি। এমনি ভেবেচিন্তে তিনি পোশাক নির্বাচন যখন করবেন তখন সেটিও সামাজিক আচরণ হবে। অপর ব্যক্তিদের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করেই

* দর্শনশাস্ত্রের উপাধ্যায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা

এখানে তিনি প্রতিক্রিয়া করছেন। তবে অপরের উপস্থিতি এ ক্ষেত্রে দৈহিক নয়—মানসিক। কাজেই সামাজিক পরিবেশ রচনায় অপর ব্যক্তির মানসিক উপস্থিতিও ধর্তব্য।

শুধু তাই নয়। সামাজিক পরিবেশ বলতে আন্তর্ব্যক্তিক পরিস্থিতি বোঝালেও এ কথা সত্যি নয় যে সকল ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যক্তিরই প্রতি প্রতিক্রিয়া হতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়াও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন রাস্তায় চলবার সময় সাংকেতিক আলোই যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গাড়ীচালক আলোর নির্দেশ অনুযায়ীই প্রতিক্রিয়া করবেন এবং এটিও সামাজিক প্রতিক্রিয়া। আসলে এ ক্ষেত্রে বস্তুর মাধ্যমে ব্যক্তিরই প্রতি প্রতিক্রিয়া করা হচ্ছে। আলো এখানে আইনরক্ষাকারী ব্যক্তির প্রতিভূমাত্র। কাজেই সমাজ-মনোবিদ্যায় আন্তর্ব্যক্তিক কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এরূপ বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ককে বুঝতে চেষ্টা করাই সমাজ-মনোবিদ্যার কাজ। আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের বিস্তৃততম ও জটিলতম রূপ দেখা দেয় দলের মধ্যে। কাজেই দলের স্বরূপ অনুধাবন করা সমাজ-মনোবিদ্যার একটি প্রধান কাজ। দল কেমনভাবে গঠিত হয়, কেন গঠিত হয়, কেমনভাবে ভাঙ্গে বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেমনভাবে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়ে সমাজমনোবিদ্যায় বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই গবেষণার আলোকে দলের দুই একটি দিক সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হ'ল, দল কাকে বলব? কতকগুলি ব্যক্তির মাত্র একত্র উপস্থিতিকে (togetherness) দল বলা চলে না। দল যেহেতু সামাজিক বিষয় তাই কেবল দৈহিক একত্রাবস্থান নয়, মানসিক বিনিময় দলের একান্ত বৈশিষ্ট্য। বাসে বা ট্রামে চলেছেন একত্রে বহু নরনারী। এখানে জনসমাবেশ আছে, কিন্তু দল নেই। অবশ্য জনসমাবেশ বিশেষ অবস্থায় দলে পরিণত হতে পারে। যেমন গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড ধরে চলেছেন বহু যাত্রী বাসে, সাইকেলে, মোটরে, গরুগাড়ীতে। ঝড়বৃষ্টিতে একটি গাছ উপড়ে পড়েছে রাস্তার উপর, রাস্তা বন্ধ করে। যাত্রীরা সেখানে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে আপনা আপনি অবস্থা অনুধাবন করছেন। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে গুঞ্জন উঠল, 'আচ্ছা মশাই, এক কাজ করলে হয় না!' এরপর আরম্ভ হ'ল শলাপরামর্শ। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজন ছুটলেন গ্রামের দিকে মজুরদের ডেকে আনতে। যন্ত্রপাতি নিয়ে মজুর এল। কেউ বুদ্ধি দিলেন কেমনভাবে গাছটাকে ধাক্কা দিলে সহজে রাস্তা থেকে সরে যাবে। কেউবা মজুরদের সঙ্গে হাত লাগালেন। কেউ বা গাড়ীগুলোর দিকে লক্ষ রাখলেন। অনেক ধস্তাধস্তির পর রাস্তা পরিষ্কার হ'ল। পরস্পর পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে যে যার গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন। যদিও আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক এখানে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তবু এখানে দল গঠন হয়েছে এবং দলটিই কার্যোদ্ধার করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ছিল এক আটকে-পড়া ব্যক্তির সমষ্টি। ক্রমশঃ সেখানে আন্তর্ব্যক্তিক আদানপ্রদানের দ্বারা এক সামাজিক অবস্থার উদ্ভব হ'ল এবং দল গঠন হ'ল।

ছোট অথবা বড়, আনুষ্ঠানিক (formal group) বা বে-আনুষ্ঠানিক (informal group) দল-গঠনের ব্যাপার লক্ষ করলে দেখা যায় যে দলগঠনের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রথম ও প্রধান বিষয় হ'ল : সাধারণ লক্ষ্য (common motive)। ছোটখাটো বে-আনুষ্ঠানিক দলের কথাই ধরা যাক, যেখানে অনেকের একত্র উপস্থিতির ফলে ঘটে ভাববিনিময়। ভাববিনিময়ের ফলে যখন দেখা যায় যে উপস্থিত সকলে এক সাধারণ লক্ষ্যে পৌছুতে পারে তখন সকলে ঐ লক্ষ্যকে

কেন্দ্র করে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অরণ্যে অনেক কৃষকবালক গরু চরাতে গেছে। গরু ছেড়ে দিয়ে সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। ক্রমশঃ জানা গেল নিকটেই ফলের বাগান আছে এবং সকলেই ফল খেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে সকলে একটি দলে গঠিত হয়ে উপস্থিত হয় বাগানে। আনুষ্ঠানিক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত দলগুলিও এমনি সাধারণ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলের কথাই ধরা যাক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মূলে এমনিই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য একদিন প্রেরণা জুগিয়েছিল। উদ্দেশ্যটি হ'ল: স্বরাজ। স্বরাজকামী ব্যক্তিরা ক্রমশঃ ভাববিনিময়ের দ্বারা একত্রিত হন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তেমনি আইন-সভায় বিভিন্ন মতাবলম্বী কতকগুলি বিরোধী দল থাকতে পারে। কিন্তু একটি সাধারণ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তারা সময় মাফিক যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে। কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করা—এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিরোধীদলকে নির্বাচনের সময় এমনি দল গঠন করতে দেখা গেছে।

অনেক সময় বিপদ বা হতাশা উপযুক্ত লক্ষ্য হিসাবে দল গঠনে সহায়তা করে। যেমন, গ্রামে চোরডাকাতের উৎপাত হলে গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাসেবকদল তৈরি করে রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করেন। তেমনি হতাশাও দলগঠনে ইন্ধন জোগাতে পারে। যেমন, অবসর-প্রাপ্ত কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার হয়তো এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিজেদের ছেলেদের ভরতি করতে ব্যর্থ হলেন। তখন এই ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন মিলে এর প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ক্রমশঃ সকলে মিলে একটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গঠনে উদ্যোগী হয়ে পড়বেন। এরূপ উদ্যোগের দ্বারা অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।

দল-গঠনের ব্যাপারে দ্বিতীয় বিষয় হ'ল: পারস্পরিক পরিচিতি ও প্রভাব। সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যখন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা হয়, তখন একে অপরকে জানবার সুযোগ পান। কারও মধ্যে বুদ্ধি দেখা যায়, কারও বিদ্যা, কারও গঠনক্ষমতা, কারও বা পরিকল্পনা ক্ষমতা ইত্যাদি। মেলামেশার ফলে সকলের গুণাবলী সকলের জানা হয়ে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি-পরিচয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পরস্পরের উপযুক্ত প্রতিন্যাস (attitude) গড়ে ওঠে। ভবিষ্যতে দলভুক্ত সভ্যদের নিজেদের মধ্যে আচরণ এই ব্যক্তি-পরিচয়কে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। যেমন, কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, প্যাটেল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলেরই এক একটি নিজস্ব পরিচয় গড়ে উঠেছিল। এবং এই পরিচয়ই তাঁদের প্রতি অপর সভ্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত।

দল-গঠনের তৃতীয় বিষয় হ'ল: দলীয় সংগঠন রচনা। দলকে পরিচালনার জন্যে কার্যনির্বাহক সমিতি বা পরিচালক সমিতির দরকার হয়। এই সমিতি গঠন-ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করে দ্বিতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ ব্যক্তি-পরিচয়। সকলের মধ্যে সবগুণ থাকে না বা সমমাত্রায় থাকে না। মেলামেশার ফলে যখন ব্যক্তি-পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন সেই পরিচয় অনুযায়ী বিভিন্ন সভ্যকে বিভিন্ন কার্যভার এবং পদ ও মর্যাদা দেওয়া হয়। যার মধ্যে নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে নেতৃত্বপদে বরণ করা হয়। ব্যক্তির উপযুক্ততায় পারস্পরিক পরিচিতির দরুন পরস্পরে পরস্পরের পদ ও মর্যাদাকে মেনে নিয়ে দলীয় সংগঠনকে দৃঢ়করণে সাহায্য করেন।

দল-গঠনের চতুর্থ বিষয় হ'ল: নীতি নির্ধারণ। কেবল সংগঠন রচনা হলেই দল সম্পূর্ণ হয় না। দলকে চলতে হলে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। দলের ভিত্তি উদ্দেশ্য সাধনে। কিন্তু উদ্দেশ্য

সাধন করতে হলে চাই নীতি। এই নির্দিষ্ট নীতিকে অবলম্বন করেই উদ্দেশ্য-সাধনের দিকে অগ্রসর হতে হয়। লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের বা ব্যক্তির এক হতে পারে কিন্তু নীতি ভিন্ন হতে পারে। কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের জন্যে সত্য এবং অহিংসাকে নীতিরূপে গ্রহণ করেন। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ্‌হিন্দ ফৌজেরও লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁরা অহিংসাকে নীতি ব'লে গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্যগত একতা থাকলেও এই নীতিকে কেন্দ্র করে তা হলে সামাজিক ব্যবধান (social distance) রচিত হতে পারে। নীতি-নির্ধারণের পর দলীয় সভ্যদের ঐ নীতি মেনে আচরণ করতে হয়। তার ব্যতিক্রম ঘটলে ব্যতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে দল থেকে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন ওঠে।

এখন সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সাধারণ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে দলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভিত্তির দৃঢ়তা ও দলের পুর্ণতা লাভের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে দলকে পরিচালনা করতে হয়। ক্রমশঃ যদি উদ্দেশ্য-সাধনের দিকে অগ্রগতি ঘটে তা হলে দল স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর উদ্দেশ্যলাভের দিকে যদি আশানুরূপ অগ্রগমন না ঘটে তা হলে ক্রমশঃ দল ভেঙ্গে পড়ে।

একটি দিনপঞ্জী

উদয়চাঁদ পাঠক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬

সামান্য মেঘে রঙের খেলা চলেছে পশ্চিমাকাশে। দিন শেষ হয়ে এল। কুলায়ফেরা পাখির কূজন শান্তপ্রায়। কোন খেয়ালী তার থলি উজার করে ফাগ ছড়াল ঐ আকাশে? অবাক লাগে—যত দেখি ততই অবাক লাগে, এ কী অদ্ভুত খেলা চলছে দিনের পরে দিন। আবার এই আজকের দিনেই এই অপরাহ্নের শেষ ক্ষণে। পলে পলে এই নতুনের বর্ণালী খেয়াল কেমন যেন অন্তরে বেদনার আঘাত হানে, মৃদুগভীর স্পর্শে। এক এক দিন মনে হয় আর যেন সইতে পারি না। কত যুগ যুগান্তের মূক বেদনা যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে, কণ্ঠনালী রোধ করে ফেলতে চায়, বাকরোধ করে। বোবার গভীর অর্থপূর্ণ না-বোঝা চাহনি নিয়ে চেয়ে থাকি। বুঝি না কিছু। বয়েস অনেক হ'ল। কতবার এই রূপের বিলাশ দেখেছি, তবু সে পুরনো হ'ল না, তার অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা আজও স্পষ্ট হ'ল না। চেয়ে চেয়ে দেখি, তাকিয়ে থাকি—কি যে বুঝি আর কি যে না বুঝি তা যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে না।...... থেকে থেকে মনে হয় কিছুই যেন বুঝতে পারি না, এ জীবনে কিছুই বোঝা হ'ল না। ধরা দিতে এসে যা নাগালের বাইরে চলে গেল, তার খোঁজ আর পাব কি করে? মানুষের মনটাই এই রকম। বুঝতে চায় সব, বুঝতে পারে না কিছুই। সামান্য যা বুঝতে পারে বলে মনে করে তার পাকে প'ড়ে না বোঝাটাই আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষ কত ক্ষুদ্র! এই সামান্য নিয়েই তার আস্ফালনের অন্ত নেই। ক্ষুদ্র বলেই তার এত প্রতাপের জাহির।

এই আত্মপ্রতাপের জন্যেই কি সোমেশ ললিতাকে হারাল? এর উত্তর কে দেবে? ললিতা কি এর জবাব দেবে? সোমেশ সাধারণ আর দশজনের মতই ছেলে। লেখাপড়া ক'রে কখন থেকে সে মনে করতে শুরু করেছে সে দশজনের মত নয়; একেবারে দশের মধ্যে বিশেষ এক। তার চলায় বলায় লক্ষ না করলেও লোকের কাছে এ সহজ পথটা ধরা পড়ে যায়। তাতে তার লজ্জার কারণ হয় না বরং গৌবব-বোধের মাত্রা যায় বেড়ে। তার নীচের ক্লাসে-পড়া গীতা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিজেদের মধ্যে করে থাকে। সে-খবর কানাঘুষো হয়ে সোমেশের কানেও কিছু কিছু এসেছে; গ্রাহ্য করে নি বা উল্টো একটু এমন হাসি হেসেছে যা ভাষায় প্রকাশ করলে অর্থ দাঁড়ায়—ওরা সামান্য জীব, বলতে দাও, যত ওরা না বুঝতে পারে তত ওদের টিপ্পনী যায় বেড়ে। অন্য কলেজে পড়ত গীতার বন্ধু; ছেলেবেলার বন্ধু ললিতা। সোমেশের নাম তার কানে উঠল, ক্রমে মর্মেও প্রবেশ করল। সময়ে তা প্রজাপতি নির্বন্ধে পরিণত হ'ল। ভালবাসার জোয়ার প্রথম বেগে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল উভয়ের জীবনে। বাঁধন-ভাঙা কূল-ছাপানো বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, কোনও দৃকপাত না করে, বিবাহ-পূর্ব উভয়ের জীবনের আসেপাশে আত্মীয়, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীর দলকে। কোথায় নিয়ে, কোনপারে, কোন চড়ায় ফেলেছে

তা তাকিয়ে দেখবার এদের সময় সুযোগ বা মনের অবস্থা কোনওটাই ছিল না। ললিতা স্ত্রীসুলভ বাস্তব বুদ্ধির টানে আপত্তি করেছে, কিন্তু সোমেশ বন্যাবেগে সে-ক্ষীণকণ্ঠ যত না শুনতে পেরেছে, অগ্রাহ্য করেছে তার ঢের বেশী। ললিতা সময় সময় ভীত হয়ে মিনতি জানিয়ে বলেছে অমন সর্বনাশা বেগ সোমেশ যেন সম্বরণ করে চলে। আবেগ-ঢালা ভালবাসার বেগ থামাবে কে? পুষ্পধনুর যে-তীর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। পুরুষ তা বুঝেও বোঝে না। সামনে ছুটে চলা তার স্বভাব, ছুটে-চলার গতিতে নতুন করে ব্যাঙ্কের হিসেব মিলিয়ে তাকে চলতে হয় না। সোমেশ বলেছিল ভালবাসার ব্যবসা এ তার নয়, যে তহবিল মিলিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে চলতে হবে। ললিতা বারে বারে অনেক বাধা দিয়ে ক্রমে নিরাশ হয়ে ভীত হয়ে বলেছে, এ সর্বনেশে ভয়ঙ্করের চলন তার সইছে না। সোমেশ বুঝতে পারে নি—বলেছিল ভয় কি? তুমি চলতে না পার আমি আছি; নির্ভয়ে নির্ভর কর, আর তোমার ভাবনা কিছু থাকবে না। ভালবেসে থাক যদি তবে ভাবনা কিছু ক'রো না। দুজনের চলন এক হওয়া চাই; না হলে গতির ছন্দপাত হবে, জীবন-কাব্যের সুর যাবে কেটে, কোথাও একটা বিকার দেখা দেবে বিকৃত পরিণাম নিয়ে। তার না থাকবে গতি, না থাকবে সুর, না থাকবে রূপ। ললিতার হিসেবী মন এ বেহিসেবী জীবনগতি মেনে নিতে পারে নি। সোমেশের জীবনের সঙ্গে দ্রুত গমনের পথে লয়ের মিল হ'ল না।

এক সময় ললিতা যখন সরে দাঁড়াল তার নিজের বাস্তব গণ্ডির মধ্যে, সোমেশ চেয়ে দেখলে তার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ধুধুবালুচর। একটু জিরিয়ে জুড়িয়ে নেবে এমন ছায়াঘন তরুর দেখা সেখানে একটিও মেলে না। এক মুহূর্তে তার প্রচণ্ড বেগ যেন প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার অফুরন্ত মুখর স্বভাব একদিনে যেন মূক বধিরের মত নির্বাক হয়ে থেমে গেল। যত ললিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ললিতা তত তার থেকে দূরে সরে গেছে। সোমেশ মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে দুটো যন্ত্রের তার দুই সুরে বাঁধা; ঐকতান তাই সম্ভব হ'ল না। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, যুক্তি দিয়ে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছে; তাতে বাইরের দিকে কথা সাজানো চলে কিন্তু মনের দিকের পাক খোলে না—গতি জাগে না।

ললিতা নিজের জীবন নতুন করে আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে নিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। উৎসাহ নিয়ে মেতেছে তার নতুন ঘর সাজাতে। সোমেশ কিছু তার চোখে দেখতে পায়, কিছু কানে শোনে, আর বাকিটুকু বুঝে নেয় আভাসে ইঙ্গিতে। কিছু তার করবার নেই। নিজের বলে যতদিন জেনেছিল তাকে নিয়ে যেমন খুশি চলেছিল। এখন সে পরের। ললিতাকে দোষ দিয়ে কোনও বন্ধু মন্তব্য করায়, সোমেশ বলছিল ভরাপালের নৌকো মরা গাঙের দিকে ফিরে তাকায় না। বন্ধু ক্রুদ্ধ আক্রোশে বলেছিল, প্রাণহীন, নিষ্ঠুর নারী নিজের স্বার্থ নিয়েই সরে পড়ল, অন্য একটা জীবনকে পদদলিত করে যেতে তার বাধল না। সোমেশ ফিকে হেসে বলেছিল, উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান, ঘৃণা, ভালবাসতে গিয়ে আমি কুড়িয়ে আমার জীবনের পাত্র পূর্ণ করেছি তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু মন মানতে চায় না। ঘৃণিত হয়ে নিজের উপরই ঘৃণা এসে গেছে। জানি, বুঝতেও পারছি জীবনটা এই রকমই। তবু কেমন যেন জীবনের স্বাদ হারিয়ে গেছে মনে হয়। বন্ধু বলেছিল, পাকা খেলোয়াড়ের হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়েছ। ললিতা আপন কাজ উদ্ধার করে নিয়ে আবার নতুন ঘর বেঁধেছে আর ও শক্তিহীন হয়ে শুকিয়ে মরছে। বন্ধু রূঢ় ভাষায় ললিতাকে বলেছিল

"পাখোয়াজ মেয়ে।" সোমেশ তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছে "আর যাই কর মানুষকে অশ্রদ্ধা ক'রো না।" ললিতা যদি সইতে না পেরে থাকে, সে যদি আমাকে ভুল বুঝে আমার উপর আস্থা হারিয়ে থাকে, তাতে তাকে দোষ দেব কী বলে? আমি পারলাম না, হেরে গেলাম। আমি হারিয়েছি—হয়তো সে আমায় চায় নি। আমার সম্বন্ধে সে যে-স্বপ্ন গড়েছিল তার সেই স্বপ্নরূপকেই সে আমার মধ্যে খুঁজেছে; পায় নি বলে ছেড়ে চলে গেছে। সইতে পারে নি এই আমাকে। মানুষ কত কম সইতে পারে! এই দেখ না তুমি নিজেও তো ললিতাকে সইতে পারছ না। দুঃখ বেদনায় পুড়ে খাঁটি হয়ে ওঠ। মানুষ সম্বন্ধে তিক্ততা রেখ না।" বন্ধু তাকে আঘাতের ভাষায় বলেছিল "ছোটবেলা থেকে তোকে দেখে আসছি, দুর্দাম তোর চলবার রকম। পাগলা ঘোড়ার পিঠে বিনে লাগামে লাফিয়ে উঠে যেদিক সেদিক ছুটে চলা ছিল তোর দুরন্ত খেলা। ইস্কুলে মাষ্টারমশায়রা তোর রকম দেখে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। নির্ভীক দুরন্ত সেই তুই একেবারে ভেঁড়ুয়া বনে গেলি? কোথাকার এক মেয়ে তাকে ভালবাসলি, আর নিজে পুড়ে ছাই হলি? সে মেয়ে আগুন ধরিয়ে সরে গেল, মজা দেখল দূরে থেকে; আর কেমন বোকা বানিয়েছে, আঙুল দিয়ে তোকে দেখিয়ে দোসরের সঙ্গে মজা করে হাসে। তোর লজ্জা করে না? তুই পুরুষ, আর সামান্য একটা মেয়েছেলে তোকে ভেঙে দিয়ে যাবে!" সোমেশ শান্তভাবে বলেছিল, "জীবনটাকে দেখতে শেখ, বুঝতে শেখ। ললিতা আমাকে জীবনের নতুন পরিচয় দিয়ে গেছে—আমার মূলধন বাড়ল; যদি তাতে জীবনের পথ বদলে যায় তাই যাক।"

সোমেশকে চিনি অনেকদিন হ'ল। তাকে বালক বয়সে দেখেছি, সত্যি তার সজীবতা, প্রাণপ্রাচুর্য যেন সর্বদা সবদিকে ছিটকে পড়ত। গল্প, খেলা, বেড়ানো, কাজ, হৈচৈ করা কোনটাতেই তার তখন জুড়ি ছিল না। সর্বত্র সব কাজে সে উপস্থিত; সে না থাকলে যেন ঠিকমত সব ঘটলেও মস্ত একটা কি ফাঁক থেকে যেত। গ্রামের সবাই তা জানত। পরে কলকাতায় এল, পড়তে; থাকত এক কলেজ হষ্টেলে। একদিনেই আর সবাই তাকে চিনে নিল। বিনা চেষ্টায় আপন স্বভাবেই সে নিজের স্থান করে নিল। দৈবাৎ কেউ প্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়ালে বা তার বিরোধীতা করতে এলে, সে এমন অবলীলাক্রমে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করত যে সোমেশের বিরুদ্ধে কিছু বলবার বা করবার সুযোগই তারা পেত না। মনে মনে গজরাত হয়তো কেউ কেউ; কিন্তু তার সহজ অগ্রাহ্য করার মধ্যে এমন একটা নির্লিপ্ততা থাকত যে কেউ কিছু করেও যেন তাকে ছুঁতে পারত না। সেই দুরন্ত ছেলে কিনা একেবারে শান্ত হয়ে গেল; হয়তো বা স্তিমিতই হয়ে গেল।

ললিতা তাকে চায় না এ কথা সে বুঝতে পেরেছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু, তবু ললিতা মাঝে মাঝে এমন দরদের সুরে কথা বলেছে যা থেকে সোমেশের চমক লাগত—তার মনের আকাশে সাতরঙা রামধনু রং খেলে যেত। সোমেশ ভাবের আবেগে মাতাল। বিচারের ক্ষমতা আছে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী, তবু সে যা চায় তা নিজের মনের সম্পূর্ণ আবেগের সত্যতায় চায়; সে-চাওয়া নিরেট চাওয়া, তাতে কোনও ফাঁকি নেই। তাই যখন সে হারায় তখন একেবারে শূন্য হয়ে যায়। মনের ভাণ্ডারে তার কোনও সুমারনবিশ আজও খাতা খুলতে পারে নি। যত প্রচুর করে সে পায় তত রিক্ত করেই সে হারায়। মন তার কৃপণ হতে জানে না। তার রিক্ততায়ও সে অকৃপণ। যতটুকু তার সে আমায় জানিয়েছে, বুঝতে পারছি সোমেশের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়তো যাই

গেছে বা ঘটে যাবে। কিন্তু তার মনের প্রকৃত পরিচয় বদল হবে না—তার স্বাভাবিক উদারতা নিয়েই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। কে জানে হয়তো এই তার ধর্ম।

ললিতাকে আমি ভাল চিনি না। দেখা হয়েছে, সামান্য আলাপও হয়েছিল। স্বল্পভাষী বলে মনে হয়েছে, তাতে স্বভাব জানবার বাধা বেড়েছে। জানি না, ক্রমে কেন সে সোমেশের দিকে এগিয়ে এল, আবার কেনই বা তাকে দূরে সরিয়ে ভিন্ন পথে নিজে চলে গেল। তার খবর আজও পাই নি। সোমেশ জানিয়েছে, ললিতা তাকে বলেছে তার সঙ্গে মনের মিল হবে না। একে যা চায় অপরে তা দিতে পারবে না। ললিতা বলেছে সে মিথ্যাচারী হতে পারবে না। জানি না কী তার সত্য, আর কী তার মিথ্যা। সত্যমিথ্যার এত লাইনটানা বিচার জীবন সম্বন্ধে সে কি করে করলে জানি না। হয়তো আমারই অক্ষমতা, আমি বুঝতে পারি না; সত্যমিথ্যা বিচার করতে গেলে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। ভালমন্দ, ঠিকবেঠিক, সত্যমিথ্যা এ সবের কিছু ভিত্তি বা মূল আছে কি? মনে হয় মানুষ নিজের মনে কতগুলো খুঁটি খাড়া করে নিয়ে তার উপর ঘর বাঁধে। মনে করে সে খুঁটিই খাঁটি সত্য, আর সব মিথ্যা। পাপ, অধর্ম, অন্যায় এ সবের বিচার ঐ ভিত্তির উপর রচনা ক'রে চলে। ভাবতে পারে না, হয়তো ভাবতে চায় না, নিজের বা দশের গড়া খুঁটিগুলোরও মূল্য বিচার করা দরকার। দাঁড়াতে গেলে পায়ের তলায় চাই শক্ত কোনও স্থান; তাই দুর্বল মানুষ অন্ধের মত যে-খুঁটিতে ভর দিয়ে চলে অভ্যস্ত হয় তা ছাড়তে তার ভয় হয়; বিচারের আঙিনা তাই সে এড়িয়ে চলতেই চায়, তাতেই তার নিশ্চিন্ত দিনযাপনের সুবিধে পায়। দাঁড়াতে চাই কিন্তু যার উপর ভার রেখে দাঁড়াব প্রতিক্ষণে যদি দেখা যায় তাতে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ানো চলবে না, বিচারের ফলে যদি সমস্ত ভিতটাই নির্ভর করবার অযোগ্য হয়ে যায়, তবে চলাটাই বিপন্ন হয়ে ওঠে। সত্য তাই সকলের দেখবার নয়। কতগুলো সূত্র খাড়া করে তারই নির্দিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে দেখে চলার নিশ্চিন্ততাই কাম্য হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যা কী ভয়ঙ্কর হয়ে লুকিয়ে থাকে তা দেখতে চায় না মানুষ। কদাচ যদি কেউ তা দেখবার সাহস এবং শক্তি নিয়ে এগিয়ে যায় তাকে সমাজ দেয় অপবাদ ধিক্কার। তাদের প্রতিবাদ যত হয় তীব্র, ভেতরে ভেতরে তারা তত দুর্বল হতে হতে এক সময় হয়তো বিকৃত উন্মত্ততায় মাতে, না হয় নিজের অজানতে ভেঙে পড়ে। তবু বলে তারই হ'ল জয়………

দুদিন হ'ল এই কথাই ভাবছি। কিছু মীমাংসা করতে পারি নি। ভাবনা বেড়েই চলেছে এক থেকে অন্য একে। প্রমোদের কথা মনে পড়ল। যৌবনের সূচনাতেই তার প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। লেখাপড়ায় যেমন সুনাম খেলাধুলায়ও তেমনি। সকলের সুখ্যাতি তাকে টলাতে পারে নি। কিন্তু কোন গোপন সুড়ঙ্গ পথে লুকিয়ে এল তার ভবিষ্যতের কালনাগ। যে সব বন্ধুমহলে তার ঘনিষ্ঠ যাতায়াত তার মধ্যেও বিশেষ করে রীতার প্রতি দেখা দিল পক্ষপাত। রীতা নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেছিল; গর্বও ছিল তার মনের গোপনে। সব সময় তা সে গোপন করতে পেরেছে তা বলা যায় না। তবু বাড়াবাড়ি করে নি তা নিয়ে। হঠাৎ দেখা গেল পাহাড়ী নদী তীরের বাঁধ ভেঙে গতি বদল করে ভিন্ন ধারায় ছুটেছে। প্রমোদকে অনেকে দেখতে পেল কোনও দিন সীমার সঙ্গে, কোনওদিন বা রমার সঙ্গে; সীনেমায়, রেস্তোরায়। রীতার সঙ্গে তার তখন আর দেখাই হয় না দিনের পর দিন। যদি বা দেখা হয়ে যায় দুকথায় শেষ করে আলাপ; আবার দেয় ছুট। দিন যায়

ঘুরে আবার সে ফিরে এল রীতার কাছে। বললে আর নয়; তাকে ছাড়া দিন চলবে না, বিয়ে করে এবার তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। আয়োজন করতে তার সময় লাগে না। নিজের বাপ-মাকে সে বুঝিয়ে দিলে বিয়ে তার ঠিক হয়ে গেছে, আর রীতার বাপ মা সুপাত্র বুঝে আপত্তি করেন নি। মেয়ের ভাগ্য ভাল এই বলে মেয়ের মা স্বস্তি বোধ করলেন। বিয়ে হয়ে গেল; দেখা গেল প্রমোদ একেবারে বদলে গেছে। ঘর পালাবার ক্ষেপামী তার এবার ঘর বাঁধবার দিকে মোড় ফিরিয়েছে। সবাই আশ্বস্ত হ'ল, বন্ধু মহলের কয়েকজন ছাড়া; তাদের মতে যে ঘর ভাঙতে অভ্যস্ত সে ঘর বাঁধতে পারে না। এ প্রমোদের দুদিনের ঘর ঘর খেলা—ঘর বাঁধা নয়। রীতা প্রমোদকে সে-কথা বলায় সে বলেছিল, যে ভাঙতে জানে সে গড়তেও জানে। এ কথাটা ওরা জানে না বলেই অতীতটাকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে থাকতে চায়। পাহাড়ী নদী যখন পাথর ভেঙে সমতলে নেমে আসে তার স্রোত যায় স্তিমিত হয়ে; মাঝে মাঝে গভীর জলের ডোবা দেখা যায়, স্রোত সেখানে নেই বললেই চলে। কোন মানদণ্ডে বিচার করে বলবে পাহাড়ের ভিতরে-থাকা অবস্থার দুর্দাম উন্মুক্ত স্রোতের নদীটাই সত্যিকারের নদী, আর ঐ মন্দস্রোত গভীর জলের নদীটা নদীই নয়? রীতা আশ্বস্ত হয়, প্রমোদকে আরও বেশী করে বিশ্বাস করে, তার উপর আরও নির্ভর করে যেন শান্তি পায়। শরতের সোনালী দিনগুলি হেমন্তের ভরা ভাণ্ডারের পুর্ণতায় রূপ নেয়। তারও পট পরিবর্তন হয়। আসে শীতের কুয়াশা-ঢাকা দিন, ঝরাপাতার দিন। রিক্ততার সাজ একদিকে দেখা দিতে থাকে, অপরদিকে জাগে বসন্তের গোপন কূজন। প্রমোদের অন্তরে যে দক্ষিণবায়ু বইতে শুরু করল তা ঘর ভুলিয়ে তাকে পুষ্পিত বনে ডাক দিল। প্রতীক্ষামানা হ'ল উপেক্ষিতা; আর যার পিছনে ধাওয়া করে নাগাল পেতে হয় বসন্তের সম্ভার উজাড় হয় তারই জন্যে। রীতা হারাল প্রমোদকে, কিন্তু প্রমোদ রীতাকে হারাল এমন কথা তার মনে কদাচ ঠাঁই পায় নি। সে যেন হারানো জানে না; পাওয়াটাই তার আসল কথা। নতুন করে স্বপ্নের ঘর সে বাঁধল রামধনু রঙে রাঙা। সে রং যখন মিলিয়ে গেল তখন সে ঘরে ফিরল ঘরের টানে নয়, পরের এক নূতনতর সুযোগের অপেক্ষায়। রীতা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়, মনের মানুষকে খুঁজে পায় না। নদীর গভীর জলে পাক দেখা দিয়েছে; তলিয়ে গেছে ধরবার যা কিছু। রীতার হয়েছে সেই পাকের টানে তলিয়ে যাওয়া কবর। প্রাণটা নিয়ে ওখানে সে বেঁচে আছে। কিসের আশায়?............

জীবনের এ কী পরিহাস! যে চাইল সে পেল না; যে পেল সে পাওয়ার মর্যদা দিতে পারল না। রীতা একেবারে মূক হয়ে গেছে। তার সন্তানের দিকে চেয়ে সে ভাবিকালের স্বপ্ন দেখছে। ছেলে বড় হবে, তার দুঃখ ঘোচাবে—বোধ হয় এই তার আশা। হতে পারে সে নিজের জন্যে আর কিছু আশা করে না। ছেলে মানুষ হ'ক, তার জন্য নিজের যা করণীয় মনে করে তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে। ছেলেকে ভালবাসে—নিজের ছেলে ব'লেই, হয়তো ভয়ও পায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। ছেলেও বড় হবে। পুরুষ! রীতার মনের কথা জানি না। তার সঙ্গে দেখা হয় নি বহু বছর। তাকে দেখেছি তার সুখের দিনে। সহজ সুন্দর রূপ নিয়ে আনন্দে সে ভেসে চলেছিল—কোথাও কোনও শঙ্কা কি তার ছিল না? নিজের জীবনের এই পরিণতিকে সে ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে সে চুপ করে আছে! তার মন কি চায় না জীবনের সুখ আনন্দ যা এই জীবনেরই সম্পদ! এ থেকে বঞ্চিত করেছে যে তার সম্বন্ধে তার কি কোনও অভিযোগ নেই? জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নেই। এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। কিন্তু কেন এমন হয়? প্রমোদ কেবল নিজের দিকেই চেয়ে চলবে। অন্যকে

অপরের দিকে তার এ আসক্তি কেন? নিজের ভোগ মেটানোই কি একমাত্র উত্তর? রীতা যে-জীবন যাপন করছে এই কি জীবনের তাৎপর্য? শুনতে পাই রীতার প্রতি সমবেদনার করুণ নানান উক্তি; আর প্রমোদ সম্বন্ধে নানান নিন্দাবাদ। প্রমোদ কী ভেবে জীবনের এই স্রোত বেছে নিল? এটা কি তার বেছে নেওয়া না ভেসে যাওয়া? রীতা নীরবে চোখের জল মোছে। কিন্তু তাইতে কি তার সব শান্ত হ'ল? সে জীবনের কাছে যা আশা করেছিল, কেন সে তা পেল না? সে কি তার নিজের দোষে? কোথায় তার দোষ? সে যদি প্রমোদের প্রমত্ত চলার পথে রঙীন প্রজাপতির পাখা মেলে তাকে প্রলুব্ধ ক'রে থাকতে না পেরে থাকে সেটা কি তার ত্রুটি? জীবনের মূল উদ্দেশ্যে কি একজন অন্য একজনকে জালে বাঁধবে? বাঁধতে কি কেউ পারে? সে চেষ্টা তো অনেকে করেছে কিন্তু প্রমোদকে ধরে রাখতে কেউ পেরেছে কি? রেশমের গুটি পোকা সময় হলে আপনি নিজের গড়া বেষ্টনী কেটে উড়ে চলে যায়। আবার নিজের বাঁধা ঘরে নিজেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে এও দেখেছি। তবে কী? কোনটা সত্য? মানুষ কিসের উদ্দেশ্যে ছুটেছে? সব লোকেই তো বলছে চায়। সে-চাওয়ারও কোনও নির্দিষ্ট একমাত্র কিছু নেই। তবু সবাই বলছে চাই। কী চায়? কী পায়? জীবনের ভোগ মানে কি যথেচ্ছাচার? প্রমোদ তবে জীবন নিয়ে কী করে চলেছে! নিষ্ঠাহীন ভোগবাসনার চরিতার্থতায় অপরের জীবন অবহেলায় আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে যার বাধে না তার জীবন সম্বন্ধে মর্যাদাবোধের পরিচয় কোথায়? নিজের জীবনের সুস্থ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যে নিজের আচরণে পদদলিত করেছে, জীবনের মর্যাদা সে কি দিতে জানে? মর্যাদাবোধ, মূল্যবোধ তার কি আছে? হ'ক না সে বিদ্যায় বা আর দশটা বিষয়ে পারদর্শী, কিন্তু তার মধ্যে মানুষের দেখা পেলাম কই? মানুষকে কেবল জীবমাত্র বলে মেনে নিতে মন চায় না। মানুষ জীব বটে, কিন্তু এই জীব নিজের জীবন গড়তে পারে। সেখানে সে স্রষ্টা। যে-মানুষের জীবনে এই সৃষ্টি সম্ভব হ'ল না তার সে একান্ত দীনতা সইবে কী করে? সে-দীনতা, সে-শূন্যতা, সে-ব্যর্থতা সে ঢাকবে কী দিয়ে? প্রাণধারণ করতে গিয়ে তার প্রাণের মূলধনই গেছে শূন্য হয়ে। যা পড়ে রইল তাকে কী আখ্যা দেব?.........

মনে পড়ে গেল মিতার গভীর বেদনায় আক্ষেপের সামান্য কথাগুলি। একদিন বলেছিল "আমার জীবনে ভালবাসাকে যে জাগিয়ে তুলেছিল আমার সেই দীপে তাকে আমি পুজা দিতে পারি নি। আমার নীতি, গর্ব তখন আমায় ঘিরে ছিল। যখন নিজের বাধা, ভুলবোঝা দূর করে নিজেকে চিনতে পারলাম, তখন তাকে আর পেলাম না; সে তখন আমার ধরা-ছোঁয়ার নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। মন কেঁদে মরছে; তাকে ডাকে—তুমি এস, আমি নৈবেদ্য সাজিয়ে তোমার জন্যে বসে আছি, তুমি এস, তুমি এস, হে আমার সব, তুমি এস। সে-ডাক আমার শূন্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। পৌঁছনর মত ঠাঁই আর নেই। এ আমার প্রতীক পুজা, সারা জীবন ধরে চলবে। দেবতার উদ্দেশ্যে পাথর শিলায় আমার অর্ঘ নিবেদন, "তুমি নাও, হে আমার তুমি নাও, আমাকে সার্থক হবার একবার সুযোগ দাও। সুযোগ আর পাবে না তুমি, মিতা। জীবনের শুভলগ্ন শুভক্ষণে এসে অনাদরে ব্যর্থতায় ফিরে চলে গেছে, আর সে ফিরে আসবে না। বর্ষণমুখর তামস্র রজনীর বুক-ভাঙা ক্রন্দন তার শেষ নেই। চিরযুগ ধরে হারিয়ে পাবার ইচ্ছায় ব্যর্থ রোদন কোনওদিন থামবে না। মিতা তুমি কেন এ ভুল করলে। যে তোমার জীবনের যা সত্য, মহার্ঘ, যা পরমধন,—সেই ভালবাসা তোমার জীবনে যে জাগাল তুমি তাকে অবহেলায় অনাদরে দূরে সরিয়ে দিয়ে আজ তুমি কাঙাল হয়ে

রিক্ত হয়ে গিছে তাকে আবার ফিরে আসতে ডাকছ। তোমার গর্ব, তোমার অহংকার, তোমার নীতি-পালনের ভ্রান্ত আত্মমর্যাদা বোধ, তোমাকে সত্যের আলোক থেকে অন্ধকারের কালো গহ্বরে নামিয়ে এনেছে। অহংকারের বশে তুমি নিজেকে বড় রাখতে চেয়েছ। নিজেকে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিবেদন করতে পার নি পূর্ণ মূল্যে, যে তোমাকে চেয়েছিল ভালবাসার কঠোর সাধনায়, ভালবাসার কঠোর নিষ্ঠা ও আত্মসংযমে যে ছিল অটল। অন্ধ তুমি। যে-ভালবাসায় সে তোমার দুয়ারে শিবের মত ভিখারী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে তুমি অনাদরে অবহেলায় দিলে সরিয়ে। আজ সে উপেক্ষার গ্লানি ফিরে এসে তোমাকে কাঁদায়। মিতা, সে এককে হারিয়ে, তোমার সব থাকতেও তুমি সর্বহারা। ইচ্ছা করে, স্নেহের মৃদু কোমল স্পর্শে তোমার তপ্ত তৃষিত অন্তরকে শান্ত করি। ইচ্ছে করে জগতের সকল ব্যথিত অন্তরে আমার অন্তরের স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে তাদের বেদনা মুছে দিই। আজকের এই হেমন্তের নিশীথে লক্ষ শত ব্যথিত অন্তর যেন মূক বেদনায় স্তব্ধ হয়ে আছে। মাতৃস্নেহে সকলকে বুকে টেনে তাদের জ্বালা জুড়িয়ে দিই। ইচ্ছে করে আরও কত কী……

মানুষ ভালবাসা চায় নিজের দুঃখ বেদনা অসহায় অবস্থার উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচবার জন্যে, সুখের জন্যে। ভালবেসে দুঃখ পায় তবু ভালবাসা চায়। সুখ চায়। আবার এই মানুষই বলে—

"তবু তোমায় আমি পাইনি
　　যে সেকথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
　　শয়নে স্বপনে॥"

কত বিচিত্র এই জগৎ! কত বিচিত্র এই মানুষ! ক্ষুদ্র সামান্য, তবু কত গভীর!

টোটেম ও টাবু*

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪

মৃতের টাবু আমাদের অনেক খবর দিল। কি ভাবে এই টাবুর সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাখ্যাও আমরা করেছি। এই সূত্রে এখানে আরও কিছু বলে রাখতে চাই ; ভবিষ্যতে সমস্ত টাবুকেই বোঝবার পক্ষে এগুলো প্রয়োজন হতে পারে।

প্রক্ষেপণের সাহায্যে মৃতের টাবুর ব্যাপারে কিভাবে নির্জ্ঞান মনের আক্রোশ দৈত্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় সে-কথা বলেছি। আদিম মানবের মানসিক-জীবন গঠনে একের পর এক বহু প্রক্রিয়া কাজ করে যায়। এ সবের মধ্যে যেগুলির অবদান সব চেয়ে বেশী, উপরোক্ত উদাহরণটি তাদের মধ্যে মাত্র একটি। এই উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে প্রক্ষেপণের সাহায্যে একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে। অন্যান্য আরও অনেক মানসিক অবস্থাতেও ঐ একই প্রকার উদ্দেশ্যে এর দ্বারা সাধিত হয় ; যার ফলে উদ্বায়ু রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রক্ষেপণ যে কেবল প্রতিরোধের জন্যই সৃষ্ট হয় তা নয় ; কেন না, যেখানে কোনও দ্বন্দ্ব নেই সেখানেও প্রক্ষেপণ হতে পারে। অন্তরের রূপকে বাইরে অভিক্ষেপ করাটা আদিম প্রক্রিয়া। ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবোধকে বদলে দিতে পারে। অতএব বহির্জগতের রূপায়ণে এর অবদান সবচেয়ে বেশী। যা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয় নি এমন অনেক অবস্থাতে আমাদের ভাবনাজ এবং প্রক্ষোভ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আন্তর প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের মতই বহির্জগতে প্রক্ষেপণ হয়ে থাকে। এগুলি অন্তর্জগতেই থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল ; কিন্তু বাইরে আসাতে বহির্জগতের আকার বদলে দিয়েছে। এরূপ হয়েছে খুব সম্ভবতঃ এইজন্য যে, প্রথমে অন্তর্জগতের প্রতি মনযোগ পড়ে নি ; কেবল বাইরে থেকে যেসব উদ্দীপনার স্রোত এসেছে তার উপরই লক্ষ ছিল এবং অন্তরস্থ মানসিক ক্রিয়ার সুখ ও ব্যথা এই সাড়ার উপরই সন্তুষ্ট ছিল। আন্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রথমে শুরু হয়েছে টুকরো-টাকরা শব্দের মাধ্যমে। সেই ভাঙা শব্দসমষ্টিকে সম্বন্ধযুক্ত করে ধীরে ধীরে যে ভাষা গড়ে উঠেছে তা একদিন অবিমূর্ত চিন্তাকে প্রকাশ করেছে, এবং প্রত্যক্ষ করার শক্তি অর্জন করেছে। এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছবার আগে সে-কালের মানুষ নিজের মনের ধারণাকে বাইরে অভিক্ষেপ করে দুনিয়ার ছবিটাকে তাদের নিজের মতন করে বদলে দেখত। আমরা এখন আমাদের সজ্ঞান প্রত্যক্ষ শক্তির জোরে পিছন ফিরে মনোবিদ্যার দিকে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারি।

নিজের মনের দুষ্ট ইচ্ছাকে দৈত্যদানব কল্পনা করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়াটা আদিম জাতিদের কল্পিত দুনিয়ার সামান্য একটা অংশকে প্রকাশ করেছে মাত্র। তাদের এই দুনিয়া সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে পারব যখন আমরা পরে সর্বপ্রাণবাদ (animism) সম্বন্ধে আলোচনা

* অনুবাদ—ধনপতি বাগ, এম্. এসসি. শ্রীনিকেতন।

করব। তখন আমরা এরূপ রীতি প্রবর্তনের মনোবৈজ্ঞানিক কারণ জানবার চেষ্টা করব। তখন দেখব যে সেগুলো আমাদের মতকে সমর্থন করছে। এইভাবে আমরা সেই উন্মাদ রোগীর সামনা-সামনি এসে দাঁড়াব। এখন আমরা এইটুকু বলে রাখতে চাই যে স্বপ্নের বেলায় গৌন অনুযোজনার (secondary elaboration) যে-স্থান, এখানে এইসব রীতি প্রবর্তনের মূলে সর্বপ্রাণবাদও সেইরূপ কাজ করে থাকে।[১] এরূপ রীতি বা তন্ত্র প্রবর্তনের প্রথম ধাপে সংবিৎ যেসব কাজের বিচার করেছে তার প্রত্যেকটির দুটি প্রধান মূল বর্তমান। যথা, রীতিবদ্ধতা, ও আসল কিন্তু যার মূল নির্জ্ঞান মনে।[২]

এই সম্পর্কে ভুণ্ড (Wundt)[৩] বলেছেন যে "অতিকথা বা রূপকথার মধ্যে দৈত্যদানবের যে সব গুণাবলী বর্ণিত হয় তার মধ্যে দুষ্টগুণগুলোরই প্রাধান্য বেশী। অতএব জাতির ধর্ম হিসাবে দেখতে গেলে দুষ্ট দানবরা ভাল দানবদের চেয়ে বেশী পুরনো।" এই সব থেকে মনে হয়, খুব সম্ভবতঃ দানবের যাবতীয় ধারণা মৃতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কের মধ্যে উভয়বলতা বর্তমান। মানবের প্রগতির সঙ্গে দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী মনোভাব প্রকাশ পেল ঐ একই মূল থেকে ; সেই দুই বিরুদ্ধধর্মী মনোভাব হ'ল দানব বা ভূতের ভয়, এবং পূর্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা।[৪] যেসব ব্যক্তির মৃত্যু বেশীদিন হয় নি তাদেরই আত্মাদের উপর সব সময় দানবত্ব প্রয়োগ করা হয়। দানবের প্রতি বিশ্বাসের মূলে শোকতাপের যে-কার্যকারিতা আছে তা ঐ সত্য ঘটনার চেয়ে বেশী প্রমাণ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। শোকতাপ অত্যন্ত বিশিষ্ট রকমের মানসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে ; ইহা মৃতের থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং তার স্মৃতিকে ভুলতে সাহায্য করে। এই কাজ যখন শেষ হয় তখন দুঃখ, বিষণ্ণতা ও ভর্ৎসনা প্রভৃতির জোরও কমে যায়। যাদের আত্মাকে একদিন দুষ্টদানব মনে করে মনে ভীতির সঞ্চার হ'ত, আজ তাদের পূর্বপুরুষ মনে করে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং দুঃখের দিনে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

যুগের পর যুগ জীবিতের সঙ্গে মৃতের সম্পর্কের পরিবর্তন যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তা হলে আমরা দেখতে পাব যে উভয়বলতার জোর অসাধারণ রকমের কমে গেছে। আমাদের নির্জ্ঞান মনে এখনও যে জাতক্রোধই থাক না কেন, তাকে দমন করার জন্য বিশেষ কোনও মানসিক শক্তির প্রয়োগ করার দরকার হয় না। আগে যেখানে তুষ্ট ঘৃণার সঙ্গে ব্যথিত কোমলতার লড়াই চলত এখন সেখানে দেখি ধর্মভাব—এ যেন ক্ষত-শুকানো দাগের মত ও দাবি জানাচ্ছে : *De mortuis nil nisi bonum*। কেবল উন্মাদ রোগীরাই এখনও প্রিয়জনকে হারিয়ে অপরিহার্যভাবে কটুবাক্য বর্ষণ ক'রে

১ *Interpretation of Dreams*, দেখ।

২ যেরূপ অস্মিতার মাধ্যমে কবি তাঁর বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগকে ভিন্ন ব্যক্তির মত বাহিরে প্রকাশ করে থাকেন, আদি মানবের অভিক্ষেপণ ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেইরূপ হয়ে থাকে।

৩ *Myth and Religion*, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৪ ছোট বেলায় যারা ভূতের ভয়ে কাতর থাকত বা এখনও আছে, এমন উন্মাদগ্রস্ত লোকেদের মনঃসমীক্ষণের সময়, ভূত যে পিতার প্রতিরূপ তা প্রমাণ করা প্রায়ই শক্ত হয় না। এই সূত্রে P. Haeberlin সাহেবের লেখা *Sexual Ghosts* (*Sexual Problems* Feb. 1912)-এর সঙ্গে তুলনীয় ; যেখানে পিতার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার আর একজন কামোন্মত্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শোকপ্রকাশকে নিষ্প্রভ ক'রে দেয়। এরূপ ব্যবহার যে পুরনো উভয়বলী প্রক্ষোভ-ভাব প্রসূত তা মনঃসমীক্ষণ দেখিয়েছে। কিভাবে যে এই পরিবর্তন হ'ল বা কি পরিমাণে তার প্রকৃতির বদল হ'ল এবং উভয়বল মনোভাবের শক্তির উপশমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সত্যিকারের উন্নতি কতটা সাহায্য করল তার আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু এই উদাহরণের সাহায্যে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখনকার সভ্য মানুষের তুলনায় তখনকার আদিম মানুষের মানসিক আবেগ খুব বেশী পরিমাণে উভয়বলতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এই উভয়বলতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে টাবু, যা উভয়বলী দ্বন্দ্বের আপোষের লক্ষণ, তাও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়। উদ্বায়ুরা এই দ্বন্দ্বের পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হয় এবং এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে টাবুও জোরালো হয়। মনে হয় তারা বহুপুরুষ-আগে-ফেলে-আসা জিনিসকে প্রাচীনের প্রকৃতি-রূপে সঙ্গে নিয়ে এসেছে এবং সাংস্কৃতিক দাবির খাতিরে এর ক্ষতিপূরণ করার জন্য উদ্বায়ুকে প্রাণান্তকর মানসিক প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে।

ভুণ্ড যে টাবুর দুটো গোলমেলে রকমের মানে, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) আখ্যা দিয়েছিলেন, সে-কথা বোধ হয় আমাদের স্মরণে আছে। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে টাবু শব্দটির দ্বারা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কিছুই না বুঝিয়ে, বুঝিয়েছে একটি দানবীয় কিছুকে যাকে স্পর্শ করা যাবে না। এইভাবে পরবর্তী ধারণার পরস্পর-বিরোধী উভয়প্রান্তের একই বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এই স্থায়ী গুণটি থেকে প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুয়ের মধ্যে গোড়াতে সম্পর্ক ছিল ; পরে অবশ্য তারা ভিন্ন হয়ে গেছে।

এই মতের তুলনায় আমাদের আলোচনায় আমরা ভিন্ন প্রকার অর্থ পাই। গোড়া থেকে টাবু শব্দের দুটো অর্থ ছিল, এবং ইহা সব সময় নিশ্চিতভাবে উভয়বলতা সূচিত করত। টাবু নিজেই একটা উভয়বলী শব্দ, এবং এর সঙ্গে আরও একটু জোর করে আমরা বলতে পারি যে, এর নির্ধারিত অর্থ থেকে আমরা যা আন্দাজ করতে পারতাম সেইটাই আমরা আমাদের গভীর গবেষণার দ্বারা পেয়েছি ; তা হচ্ছে এই যে, টাবু-নিষেধের মূল হচ্ছে প্রক্ষোভীয় উভয়বলতা। প্রাচীনতম ভাষার গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কোনও সময়ে এমন বহু শব্দ ছিল যাদের আর একটা অর্থ ছিল ঠিক উল্টো অর্থাৎ তাদের কিছু মাত্রায় উভয়বলী বলা যেতে পারে ; যদিও খুব সম্ভবতঃ টাবু যে-অর্থে উভয়বলী ঠিক সেই অর্থে নয়।[৫] এইরূপ পুরনো শব্দ যাদের দুটো পরস্পর-বিরোধী অর্থ ছিল তাদের মৌখিকভাবে কিছু অদল বদল হয়েছে, এবং যে একটিমাত্র শব্দ দিয়ে দুটো মানে বোঝাত, পরে সেগুলো দুটো ভিন্ন শব্দ হয়ে গেছে।

[ক্রমশঃ]

৫ *Jahrbuch fur Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen*-এ Abel-র *Gegensinn der Urworte* উপর লিখিত আমার প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা কর। Bd II, 1910.

মনের কথা

সু. রা.

লেখক "খেদোন্মত্ত বাতুলতা" (manic depressive psychosis) রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসার্থে আসেন এবং সেই সময়ে তিনি কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদি নানান রকমের রচনা করেন। তাহারই কিছু অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত করা হইল। পূর্ব সংখ্যায়ও কিছু প্রকাশ করা হইয়াছিল।

দুই প্রান্ত

অগাধ ঐশ্বর্য, দুর্বিষহ দীনতা। দুই প্রান্তে মানবের জীবন বাঁধা প'ড়ে গেল। মাঝে যারা রইল দু-পারের টানে তাদের হাসি পায় কান্না দেখে, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, অনুভূতি-হীন প্রাণী, জীবন মরণের দোলার মাঝে যাদের জীবন--তারাই তো প্রাণী।

আদুরে দুলাল নয়, নিঃস্ব ভিক্ষুকের সন্তান নয়। এদের মাঝেই তো জীবনের স্বাদ। বাঁচার মত বাঁচতে গেলে ধনীর দুলাল হতে হবে কেন? বা দীন দরিদ্রের নিঃস্ব ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে কেন?

একজনে বলে, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।" আর একজন বলে, "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।" কিন্তু যে বলে, "মরনরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—কিংবা বলে, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে!" এই—যে একলা চলার স্পর্ধা রাখে সে-ই আছে দু'প্রান্তের মাঝখানে।

"ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফলল না
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়
দিনের আলো যার ফুরাল
সাঁঝের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়"

বিশ্ববিধাতা তাকে টেনে নেন কোলে, বলেন—"ওরে আয়
আমারে নিয়ে যাবি কেরে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়
ওরে আয়।"

প্রথম প্রণয়িনীকে চিঠি

প্রিয়া,

আবার আঘাত পেয়ে চমকে উঠছ? নীরবতা, ভুলে যাওয়ার নিদর্শন সব সময়ে নয়। সমকালীন পরিবেশ যদি আমাকে মূক করে দেয় সে-অপরাধে তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারব না—এতটা ভীরু আমি নই। তোমার সাথে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে কালিমার কোনও রেখা নেই। তাই প্রতি সূর্যোদয়ে তোমায় মনে পড়ে আর সূর্যাস্তে বিলীন হয় তোমার স্মৃতি। অঙ্কশায়িনী হবার ইচ্ছার ক্ষণিক আভাস তুমি দিয়েছিলে, কিন্তু সেটা ক্ষণিকই। আবার বেঁধেছিলে নিজেকে সংযমের নাগপাশে। তুমি জ্বলেছ, আমিও জ্বলিনি কম। তাই তোমার আমার মাঝে যে প্রেম প্রীতি তা আজ সোনার মত খাঁটি। কোথাও সোহাগার পরশ নেই। তোমারই ধৈর্য তার জন্যে আমার কাছে পুজার সামগ্রী।

চৈতের উদাসী সন্ধ্যায় নদীর পরপারে গাছের ফাঁকে আজও সে-চাঁদ ওঠে যে সাক্ষী আছে তোমার আমার নিষ্কলুষ আত্মদানের শুভ লগনটির। সে-চাঁদ আজও ওঠে। মাঝে মাঝে ব্যথা-ভরা চোখে জল টেনে আনে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করি নি; পশুমন মাঝে মাঝে লালসার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতে চায়, কিন্তু সংযমের কশাঘাতে সে পিঞ্জরাবদ্ধ হয় বার বার।

কেমন আছ? কোথায় আছ? আমি এক দুস্তর পরীক্ষায় প্রায় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। আরও কিছুদিন চলবে এ পরীক্ষা। তোমাদের ভগবান জানেন কি আছে আমার কপালে! নির্দোষ একটা প্রাণীকে কী দোষে যে তিনি বার বার এই পরীক্ষার সামনে আনেন তা তিনিই জানেন।

তোমাকে শুধু চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে। ভয় নেই, আমি এখন পিঞ্জরাবদ্ধ পুরুষ সিংহ। তুমি তো আলিপুরেও কোনও কোনও দিন গেছ। এবার একদিন আমার কাছে এস। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আমার সাধের প্রণয়-প্রার্থিনীকে। কিছু জানিয়ে ছোট করব না, তুমি অনেক বড়—

আজ এখানেই ইতি করি

প্রেমাস্পদ।

* * * * *

রীনার তখন সামনে পরীক্ষা। বি. এ. দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল সে। মেণ্ট্যাল-হস্‌পিট্যাল্ থেকে সমীরনের লেখা ঐ চিঠি এসে হাজির হ'ল তার কাছে। বিস্ময় ও পুলক, সুখ ও বেদনায় রীনার মন ভরে গেল—কানায় কানায়। অবাধ্য অশ্রু দুটি চোখ ভ'রে উপচে পড়ল। মনে মনে বললে "সমীরণ! সমীরণ! আমি তোমারই, আজও তোমারই আছি। হে ভগবান! শক্তি দাও, যেন নিজেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সমীরণের প্রেমপাশে বাঁধা থেকেও নিজের শক্তি ও সংযম না হারাই।"

২৪ বৎসরে পদার্পণ

১৯৬৩ সনের ৫ই ফেব্রুআরি তারিখ নানান অবস্থার মধ্যে দিয়া চলিয়া লুম্বিনি পার্ক ২৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ২৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, ব্রহ্মদেশ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু ইত্যাদি বহু প্রকারের সমস্তার ছোট বড় ঝড় কাটাইয়া উঠিয়া স্বল্প-অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল যে প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহাই নহে। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও লুম্বিনি ১৯৪০ সনে মাত্র তিনটি শয্যা লইয়া স্থাপিত হইয়া আজ ১৭৫ শয্যাযুক্ত হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিরই পরিচয় দেয়। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমাজকল্যাণে ব্রতী থাকায় সমাজের সহৃদয় জনসাধারণ এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণ সংস্থার সাহায্যে ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেবার যে-আদর্শ লইয়া এই হাসপাতালের কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহাই ইহার প্রাণশক্তি দান করিয়াছে। বর্তমানে মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হাসপাতাল একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপরিচালিত হাসপাতালগুলি বাদ দিলে, এতগুলি শয্যাযুক্ত মানসিক হাসপাতাল আর নাই। ইহা ব্যতিরকে, এই হাসপাতাল ভিন্ন ভারতে আর কোনও মানসিক হাসপাতালে উপযুক্ত মনঃসমীক্ষক দ্বারা রোগীর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় না। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত এই হাসপাতালের মত এত সংখ্যক শয্যাবিশিষ্ট মানসিক হাসপাতাল পৃথিবীর আর কোনও দেশের মনঃসমীক্ষা সমিতির পরিচালনাধীনে নাই। ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতে বহু বিভাগের বহু বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় লুম্বিনির আজও সে-সৌভাগ্য হয় নাই। আমরা আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে হাসপাতালের বর্তমানের স্থানাভাব ও দারুণ অর্থাভাবের সমস্যা দূর হইবে। সে-সম্ভাবনার সূচনা আমরা লক্ষ করিতেছি। এই পত্রিকার পূর্ব কয়েক সংখ্যায় লুম্বিনির অর্থাভাবের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সে-অভাব সম্পূর্ণ পূরণ না হইলেও বাকি দেনার অনেক টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যে পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।

সরকার ও সমাজকল্যাণ সংস্থার অর্থ সাহায্যে হাসপাতালের যে নূতন অংশের নির্মাণ কার্য চলিতেছিল তাহার কাজ মোটামুটি শেষ হওয়ায়, ১৯৬৩ সনের ৩রা মার্চ একটি সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে নূতন অংশের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। শ্রীমতী বিভা মিত্র এম. এল. এ. ঐ অনুষ্ঠানের সভানেতৃত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীজয়নুল আবেদিন নূতন অংশের দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা এম. এল. সি. প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় অন্যান্য মান্য অতিথিদিগের মধ্যে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, লেঃ কর্ণেল এন. সি. চ্যাটার্জি ও অর্থসচিব শ্রী কে. কে. রায় এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলেই লুম্বিনি পার্কের জনসেবার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করেন। এই প্রসঙ্গে সরকারের তরফ হইতে, বর্তমান জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাধ্যমত সাহায্য করা হইবে এই আশা

তাঁহারা দেন। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করিবার পর সভার কার্য শুরু হয়। এই সভায় লুম্বিনি পার্কের ডিরেক্টর হাসপাতালের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে বর্তমানে যে সকল কাজ অবশ্যকরণীয় তাহা নিম্নলিখিতভাবে তালিকাভুক্ত করিয়া নিবেদন করেন এবং ইহার আর্থিক দায়িতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :—

১। শিশু রোগীদের জন্য পৃথক বিভাগ। সম্প্রতি ২০জন রোগীর ব্যবস্থাযুক্ত এই বিভাগের জন্য প্রয়োজন ৫০,০০০৲

২। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্য যে রোগী আসেন তাঁহাদের জন্য ১০ বেডযুক্ত পৃথক বিভাগ নির্মাণের ব্যয় ২০,০০০৲

৩। আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য পৃথক ২০ বেডযুক্ত বিভাগের জন্য মোট নির্মাণ ব্যয় ৪০,০০৬৲

৪। বর্তমানের স্ত্রীবিভাগের ভাড়াবাড়ী ক্রয় ও আবশ্যক মেরামত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য আনুমানিক ব্যয় ২০০,০০০৲

৫। দুরারোগ্য মানসিক রোগীদের জন্য কলিকাতার বাহিরে উপযুক্ত কোনও স্থানে আশ্রম নির্মাণ জন্য ২৫০,০০০৲

৬। চিকিৎসকগণের বাসস্থান নির্মাণ ৮০,০০০৲

৭। হাসপাতালের সেবক-সেবিকাদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যয় ৬০,০০০৲

৮। উপযুক্ত পরীক্ষাগার (laboratory) নির্মাণের ও আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের ২৫,০০০৲

৯। অন্যান্য কর্মীদিগের বাসস্থানের জন্য ১০০,০০০৲

১০। হাসপাতালের সংলগ্ন জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে কাঠাপ্রতি ৪-৫ হাজার টাকা দরে জমি বিক্রয় হইতেছে।

১১। হাসপাতালের নিজস্ব যানবাহন ব্যবস্থার জন্য ২০,০০০৲

এই সকল এককালীন ব্যয় বাবদ ও হাসপাতালের নিয়মিত ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং কর্মীদের বেতন সময়োপযোগী হারে দিবার জন্য চলতি খরচ মিটাইতে বৎসরে আরও ২০০,০০০৲ টাকা একান্ত প্রয়োজন। দুর্গত মানুষের কল্যাণের জন্য এই অর্থ অতি সামান্য। আমরা আশা করি লুম্বিনি এই অর্থ সরকার ও জনসাধারণের সাহায্যে অবশ্যই পাইবে।

সেদিনের উদ্বোধনী সভায় যে আশ্বাস আমরা সরকারের উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম অচিরেই তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা যে আবেদন করিয়াছিলাম তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেশের জরুরী অবস্থার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার লুম্বিনির বাকি দেনা ও বাৎসরিক (১৯৬২ সনের) ঘাটতির মোট পরিমাণের মধ্যে ৩৯,৭০০৲ টাকা এককালীন দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ দেনাই আমরা শোধ দিতে পারিয়াছি। সরকার ও জনসাধারণের যে-সহানুভূতির পরিচয় নূতন করিয়া পাইলাম তাহাতে আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। অতীতের নানান সমস্যার মত এবারও লুম্বিনি আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভবানীপুরস্থ শ্রীসুনীল বসু মহাশয় তাঁহার ৫নং সুবারবন স্কুল রোড, কলিকাতা-২৫-এ স্থিত নিজ বাসভবনের দুইটি ঘর বিনা ভাড়ায় লুম্বিনিপার্কের বহির্বিভাগীয় মানসিক রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া জনসাধারণের যে উপকার করিলেন সেজন্য তিনি আমাদিগের এবং জনসাধারণের কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন। বাংলাদেশে, এই কলিকাতা শহরেই, এমন সহৃদয় ব্যক্তি আরও অনেক আছেন যাঁহারা এইরূপ সাহায্য করিয়া মানসিক রোগাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার আরও অধিকতর সুযোগ আমাদিগকে দিতে পারেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা পাইব। শ্রীযুক্ত বসুমহাশয়ের দৃষ্টান্ত আরও অনেককেই জনকল্যাণের দিকে প্রেরণা যোগাইবে। এই সহৃদয়তার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে জানাইতেছি।

১লা বৈশাখ ১৩৭০ সন, নববর্ষের দিন হইতে প্রতি সোমবার, বুধবার, ও শুক্রবারে বৈকাল ৫-৩০ হইতে ৭-৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। ভবানীপুরস্থ—লুম্বিনি ক্লিনিক (২) —বহির্বিভাগে সর্বপ্রকার মানসিক রোগীদিগকে বিশেষ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এইরূপ সহায়তা লাভ করিয়া আমরা দক্ষিণ কলিকাতা ও উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে আরও এইরূপ বহির্বিভাগে মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

আমরা আরও এক শুভ সূচনার ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি। বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের অবসর সময়ে বিনা বেতনে এই হাসপাতালের জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য কিছু কিছু কাজ করিয়া দিতে ইচ্ছা জানাইয়াছেন। আমরা অতি সম্মানের সহিত তাঁহাদের এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশে এই ধরনের সাহায্য নানা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট পায়। আমাদের দেশে এই ধরনের সাহায্যের বিশেষ চলন ছিল না। স্বাধীন দেশে সহৃদয় মানুষ পীড়িত দুস্থ মানুষের দরদ বোধ করিবে ইহাই তো সুষ্ঠু মানবতার লক্ষণ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণের এই সহানুভূতিতে সেই মানবতার বিকাশ দেখিয়া আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। মানবকল্যাণের ক্ষেত্র স্বার্থবুদ্ধি যুক্ত না হইলে সে-কল্যাণচেষ্টা একদিন মানুষ স্বীকার করিবে এবং তখন তাঁহাদের সহায়তা ও সাহায্য লাভ সম্ভব হইবে, আমাদের এই বিশ্বাস এতদিনে বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। ইহা আমাদের অতি আনন্দের বিষয়। আমরা দেশের সহানুভূতিশীল জনসাধারণকে আমাদের আন্তরিক সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমানে লুম্বিনিতে স্ত্রীবিভাগে ৩৫টি ও পুরুষ-বিভাগে ১৪০টি —মোট ১৭৫টি শয্যা আছে। আহার্য, ঔষধ ও অন্যান্য সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পূর্ব নির্দ্ধারিত হারে খরচ লইয়া হাসপাতালের ব্যয় মিটানো সম্ভব হইতেছে না। এইজন্য ১৯৬৩ সনের 'মে' মাস হইতে অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, বাধ্য হইয়া রোগীদের জন্য মাসিক খরচের হার কিছু বাড়াইয়া নিম্নলিখিত হার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। 'ক' শ্রেণী—৩৫০৲, 'খ' শ্রেণী ২৬০৲, 'গ' শ্রেণী ১৮০৲, ও কন্‌সেসন্—১২৫৲। ইহাতে জনসাধারণের কিছু অসুবিধা হইতে পারে জানিয়াও এই ব্যবস্থা করা ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। অনেক বিবেচনার পরে লুম্বিনির কর্মসমিতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্থির করিয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া জনসাধারণ এই ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ বুঝিতে পারিবেন, আমরা ইহাই আশা করি।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য লুম্বিনির তরফ হইতে কয়েকটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান করিতে

মনস্থ করা হইয়াছে। কর্মী ও অর্থ দুই-ই যে কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন। ২৩ বৎসর ক্রমোন্নতি করিয়া যে-প্রতিষ্ঠান লুম্বিনির মত বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে সেই প্রতিষ্ঠান আরও উন্নতি করিতে পারিবে। আরও উপযুক্ত রূপে মানসিক রোগীর চিকিৎসা ও সেবার সুযোগ পাইবে আমরা ইহা মনে করি। সরকার, জনসাধারণ ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের অবস্থার কথা বরাবর এই পত্রিকার মাধ্যমে ও দৈনিক সংবাদপত্রের সহযোগিতায় প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রের তরফ হইতে যে-সহায়তা আমরা পাইয়াছি সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৯৬৩ সালের জানুআরি হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত আয় ব্যয় ইত্যাদির তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

	আয়	ব্যয়
জানুআরি	২৬,৫১৮·৩০	২৪,৫০৫·১২
ফেব্রুআরি	২১,৮৩৫·৮১	২৩,৪৭৮·৭৭
মার্চ	৬৫,৬২২·৬০	২৪,৭১২·৭৯

রোগী ভরতি ও নির্গম

	ভরতি	নির্গম
জানুআরি	৩৬	৪১
ফেব্রুআরি	২৮	২৮
মার্চ	৩৪	২৯

চিকিৎসার ফলাফল

	আরোগ্য	উন্নতি	মৃত্যু	অপরিবর্তিত
জানুআরি	২৩	১৪	১	৩
ফেব্রুআরি	১৩	১১		৪
মার্চ	১৫	১২		২

বহির্বিভাগে মানসিক রোগী

	নূতন রোগী	পুরাতন রোগী	মোট
জানুআরি	৫১	২০৪	২৫৫
ফেব্রুআরি	৪৯	২৪০	২৮৯
মার্চ	৫১	২৫২	৩০৩

—তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

গত ৩০শে মার্চ ১৯৬৩ সন, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে অন্যান্য কার্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সমিতি ইত্যাদি গঠিত হয়।

১৯৬৩-৬৪ সনের জন্য সমিতির বিভিন্ন পদে নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্বাচিত হন।

সভাপতি—তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.

সচিব—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.

সহসচিব—কনক মজুমদার, এম. এস্‌সি.
তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.
হিরণ্ময় ঘোষাল

গ্রন্থাগারিক—সুরমা দাশগুপ্ত, এম. এ.

সহ-গ্রন্থাগারিক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল.
হাসি গুপ্ত, এম. এ.

সমিতির নির্বাহী-পরিষদ্—ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, সুরমা দাশগুপ্ত, হাসি গুপ্ত, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং এম. ভি. অমৃত।

মনঃসমীক্ষা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ্—ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, বি. দেশাই, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত, হাসি গুপ্ত এবং সুরমা দাশগুপ্ত।

পত্রিকা পরিচালনা পরিষদ্—ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এফ. পি. মেহতা, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমদানাথ চৌবে, তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, কনক মজুমদার, ডঃ দেবব্রত সিংহ, হিরণ্ময় ঘোষাল, এবং ডঃ রমেশ দাশ।

'চিত্ত'—সম্পাদক: ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ; সহ-সম্পাদক: ডঃ দেবব্রত সিংহ এবং হিরণ্ময় ঘোষাল।

'সমীক্ষা'—সম্পাদক: ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ; সহ-সম্পাদক: দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য।

'চিত্ত' এবং 'সমীক্ষা' পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগিবৃন্দ—ডঃ এস. জেড্. অর্গেল (নিউ ইয়র্ক), ডঃ রমেশ দাশ, অরুণ ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণা হালদার, হাসি গুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, এম. ভি. অমৃত, নির্মলকুমার ঘোষ এবং সি. ভি. রামন।

লুম্বিনি পার্ক কার্য-সমিতি—ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হাসি গুপ্ত, জ্ঞানবতী লাট্, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কনক মজুমদার, শ্যামসুন্দর সিংহানিয়া, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, সুরমা দাশগুপ্ত, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত, সত্যপ্রসন্ন সেন, কমলাকান্ত মৈত্র, লুম্বিনির অধিকর্মা, মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও একজন আবাসিক চিকিৎসক এবং নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের একটি করিয়া প্রতিনিধি:

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন, নিখিল ভারত নারী সম্মিলনী (কলিকাতা শাখা), ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি, কলিকাতা পৌরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্ষদ।

'বোধায়না' পরিচালনা সমিতি—ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনসূয়া নাগ, প্রমদানাথ চৌবে, ডঃ দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জি. বোথরা, অনাথনাথ দত্ত, ডাঃ অনাদিনাথ ঘোষাল, সমীরকুমার বসু, কনক মজুমদার, জ্ঞানবতী লাট্, নির্মলকুমার মিত্র এবং সোমনাথ ভট্টাচার্য।

Statement about ownership and other particulars about newspaper (**Chitta**) *to be published in the first issue every year after the last day of February.*

FORM IV

[See Rule 8]

1.	Place of Publication	Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39.
2.	Periodicity of its publication	Quarterly
3.	Printer's Name Nationality Address	Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc. Indian 37, South End Park, Calcutta-29
4.	Publisher's Name Nationality Address	Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc. Indian 37, South End Park, Calcutta-29
5.	Editor's Name Nationality Address	Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc. Indian 37, South End Park, Calcutta-29
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Indian Psychoanalytical Society 14, Parsibagan Lane, Calcutta-9

I, Tarun Chandra Sinha, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief,

TARUN CHANDRA SINHA

Dated, 2nd May, 1963 Signature of Publisher

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha. D.Sc., for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9.29-1.

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা) ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

পঞ্চম বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০

চিত্ত

সূচীপত্র

চিত্ত

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০

ব্যক্তিমানস ও সংস্কৃতি

দেবব্রত সিংহ, এম. এ., ডি. ফিল.*

(১)

আমরা যে-যুগে বাস করছি সে-যুগটা এক কথায় অস্থিরতার যুগ। আমাদের দেশে যে কোনও কারণেই হ'ক এ অস্থিরতা হয়তো এখনও খুব বেশী প্রকট আকার ধারণ করে নি; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সেটার লক্ষণ যে সমূহ প্রকট এটা অনস্বীকার্য। অনেকে এটাকে কোনও বিশেষ দুর্লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন না কিংবা এটার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। অনেকে কিন্তু একে অতটা উপেক্ষা করতে পারেন না; তাঁরা একে রীতিমত একটা সংকট হিসাবেই গণ্য করেন। অথচ এ সংকটের সমাধান বাতলাতে গিয়েও কেউ কোনও হদিস পান না। অবশ্য অনেক রাষ্ট্রনীতিক মত, ধর্মীয় মত, অনেক সম্প্রদায় ও 'ism' আছে, যা মানুষের সমস্ত অস্থিরতার সুন্দর সমাধান নির্দেশ করে দেয়—আপাতদৃষ্টিতে যা দেখলে মনে হয় যেন আর দুর্গতির সম্ভাবনা নেই, মানবসমাজের কল্যাণ অনিবার্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় এ সবই হয় কোনও 'theory'-র উপর অথবা কোনও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ জড়বাদীই হ'ক আর আধ্যাত্মবাদীই হ'ক, প্রত্যেকেই নিজ নিজ তত্ত্বদৃষ্টি দিয়ে মানবসমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের মূলসূত্র ধরিয়ে দেবার দাবি করেন।

* দর্শনশাস্ত্রের সহ-অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা সমাজবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে 'আদর্শ' সমাজব্যবস্থায় পৌছানো যায় কিনা, কিংবা মানব-স্বভাবকে কোনও বিশেষ 'discipline'-এর মধ্য দিয়ে 'দেবত্বে' উত্তীর্ণ করা যায় কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু কোনও বিশেষ theory-র প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস না রেখেও যে-কথাটি মানা যায় তা হচ্ছে এই যে, মানুষের মনের গভীরেই দুঃখ এবং সুখের বোধ নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের গুরুত্বপুর্ণ অবদানটির কথা আলোচনা করা যাক।

ফ্রয়েড দেখালেন যে আমাদের অন্তরে স্ফুট ও অস্ফুটভাবে **দ্ব্যর্থতা** বিরাজ করে এবং সে-দ্ব্যর্থতাকে বুঝে মেনে নেওয়াই এই অস্থির যুগে বাস করবার উপযোগী সুস্থিত চরিত্রের লক্ষণ। যে-যুগে কোনও কিছুই, এমন কি বিরোধ নিজেও সুস্থির ও সুনির্দিষ্ট নয়, সে-যুগে চলার পক্ষে সম্ভবতঃ এটাই উপযোগী।

(২)

ফ্রয়েড মানসপ্রক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করেছেন—যে-দ্বন্দ্ব আমাদের বাস্তব-বিভ্রমের মূলে। তিনি দেখিয়েছেন, 'অহম্' (ego)-এর মধ্যে দুই বিপরীত সত্তা বিরাজমান। একদিকে ব্যষ্টিগত প্রবল মানস-তাড়না ভিতর থেকে আসছে, অপর দিকে সমষ্টিগত অনুশাসন তার রাশ টানছে যখন সে কাম্যবস্তুর নিকট অসতর্কভাবে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হচ্ছে। এই বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে বহু কামনা অপরিতৃপ্ত থেকে যায়, বহু অভিলাষ অবদমিত হয়। সাধ্যের বাইরে যেন অপরিতৃপ্ত কামনার এক দিগন্ত রচিত হয়। নীতি ও আচারের অনুশাসনের বাইরে যেমন বন্ধনহীন ভোগ, সুখ ও কামুকতার জগতের স্বপ্ন দেখে, তেমনি আবার অপরাধবোধেও ভারাক্রান্ত হয় 'অহম্'।

যে অপ্রতিহত গতিতে মন এই আপাত পরিতৃপ্তির পথে চালিত হয়, তা বুঝতে হলে ব্যক্তিবিশেষের মানসজীবনের পটভূমিকা বিচার করা দরকার। 'অহম্'-এর মধ্যে যে দুই বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্ব, তার সূচনা হয় ব্যক্তির শৈশব অবস্থাতেই। শিশু পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার বাবা এবং বিশেষ করে মাকে আশ্রয় করে এবং তাদের ঘিরেই রচনা করে নানারূপ আবেগাত্মক কল্পনা। এই আবেগাত্মক অনুভূতি থেকেই তার চরিত্রের বিভিন্ন দিকের সূত্রপাত হয়—মানসিক ও নৈতিক এমন কি বহু দেহগত অসুস্থতারও ভিত্তি প্রস্তুত হয়। ফ্রয়েড বলেছেন "শৈশবের প্রথম ছয় বছরের মধ্যেই ছোট্ট মানুষটি তার নিজের ও ভিন্ন লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রকার নির্ধারণ করে ফেলে—সে তাকে পরিবর্ধন করতে পারে, রূপান্তরিত করতে পারে, কিন্তু তা থেকে কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারে না।"

মানুষের উত্তর-জীবনের ভূমিকায় তার শৈশবের এই যে একান্ত প্রভাব আবিষ্কৃত হ'ল, তা থেকে দুটি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। একদিকে শিক্ষাদাতার পক্ষে আবেগমূলক যুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'ল—অর্থাৎ সহানুভূতির মধ্য দিয়ে শৈশবের প্রবৃত্তি ও তাড়নার একটা বোধ থাকা দরকার। অপর দিকে, এটাও পরিষ্কার হ'ল যে, শিশুর শিক্ষায় প্রকৃত পরিণতি আনতে গেলে কেবল শৈশবে-চাপানো আচরণের আদর্শকে মেনে নিলে চলবে না। একটা ধরাবাঁধা কার্যসূচীর অনুসরণেই মানবস্বভাবের বিকাশ হয় না। বরং বিরোধের মধ্য দিয়েই শিক্ষার ভূমিকা রচিত হয়। এ বিরোধ শেষপর্যন্ত কাম (eros) এবং সংস্কৃতি—এই দুই পরস্পরবিরোধী, অসমন্বিত অথচ পরস্পর-সংযুক্ত উপাদানের বিরোধ। এ দুয়ের দ্বন্দ্বের ফলেই সেই ব্যাপক অশান্তির উদ্ভব হয়, যার কথা ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত "*Das*

Unbehagen in der Kultur" ("সভ্যতার অস্বস্তি") শীর্ষক পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন। শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি তার মধ্য দিয়ে পূর্বানির্দিষ্ট মান অনুসারে ভাবী জেনারেশনকে তৈরি করবার প্রয়াস সূচীত হয়। আন্তর তাড়নাগুলিকে সমাজসম্মত মানে চালিত ক'রে শিক্ষা সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

ভিতরের দাবি—যা ব্যক্তিমানসের অনেক গভীরে নিহিত আছে, আর সমাজ ও সভ্যতার মান —এ দুয়ের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই বিরাজ করছে। এই দ্বন্দ্বের জন্যই মানবপ্রকৃতির মূলগত স্ববিরোধ পরিস্ফুট হয়। 'অহম্'-এর সবচেয়ে আত্মসচেতন মুহূর্তেই যেন তার অন্তর্নিহিত 'দুর্বলতা'ও ধরা পড়ে। মানুষ যতই তার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনার পরিচয় পাবে—তার গূঢ় ইচ্ছা নিজের কাছে ধরা পড়বে, ততই আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে সে রেহাই পাবে। আপন সত্তার নির্জ্ঞান স্তরে নিহিত এই তথাকথিত 'নিম্নতর' অভিপ্রায় ও প্রবণতার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি সেগুলির প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করবার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। নিজেকে জানাই নিজেকে জয় করবার পথ। জ্ঞান-বিচারের আলোকেই নির্জ্ঞানের আধিপত্যকে অতিক্রম করা যেতে পারে। ফ্রয়েডের সংক্ষিপ্ত 'ফরমূলা'য় বলা যায়—"যেখানে ছিল 'ইদম্' (id) সেখানে থাকবে 'অহম্' (ego)।"[১]

(৩)

ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণকে পুরোপুরি অনুসরণ করলে পর সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিচারকে মূলতঃ পালটাতে বাধ্য হব। কারণ, জীবনের অর্থ ও মূল্য নিয়ে জিজ্ঞাসাতেই সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। ফ্রয়েড এই জীবন-জিজ্ঞাসার মূলেই প্রশ্ন তুললেন। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করলেন, যে মুহূর্তে মানুষ জীবনের অর্থ ও মূল্য নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করে, তখনই সে হয় 'অসুস্থ' (মনের দিক দিয়ে)। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে জীবনের অর্থ ও মূল্য, এ কোনওটারই অস্তিত্ব নেই ; এটা নিতান্তই মনের দাবি, মনের সৃষ্টি। তা হলে কি জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে মানবমনের যে মহত্তর পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে নিছক অসুস্থ মনের প্রকাশ বলেই গণ্য করতে হবে ? বিষয়টিকে আর একটু পর্যালোচনা করা যাক।

এটা ঠিক যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে কোনও ভাবেই হ'ক একটা জিজ্ঞাসা—তাদের অর্থ ও মূল্য নিয়ে প্রশ্ন না জাগলে কোনও প্রকৃত সৃজনশীল মানসক্রিয়ার উদ্ভব হয় না—তা সে সাহিত্য হ'ক, শিল্পকলা হ'ক, ধর্ম হ'ক, আর দর্শনই হ'ক। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার মনোভাবই কি প্রাত্যহিক বাস্তব-জীবনকে অবদমিত করে রাখবার প্রয়াস হিসাবে গণ্য হয় না ? জীবনের আপাতদৃষ্ট বাহ্যিক পরিচয়ের অতিরিক্ত জীবনের কোনও গভীরতর অর্থ ও তাৎপর্য খোঁজবার পিছনে অগোচরে একটি মানসিক দুর্বলতা কাজ করছে। জীবনের বাস্তব স্বরূপটাকে অস্বীকার করতে প্রবৃত্ত হই বলেই তার এমন এক

[১] মনের গঠনে ইদম্ (id) এবং অহম্ (ego)—এই দুই উপাদানের বিভেদ ও বিরোধ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে একটি মূলগত সত্য। মানসরাজ্যের আদি স্তর তা দিয়েই তৈরি, যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায়, স্বভাবে নিহিত থাকে বিশেষতঃ দেহাবয়বের সঙ্গে জড়িত তাড়না সমূহ। এক কথায় ফ্রয়েড একে id (জার্মান শব্দ "Es") বলে অভিহিত করেছেন। মানসযন্ত্রের এই আদি অংশ আমাদের জীবনে আগাগোড়াই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এই 'ইদম্' এবং বহির্জগতের মধ্যে সংযোগকারী যে অংশ তাকেই 'অহম্' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মূল্য ও অর্থ আবিষ্কার করতে চাই, বাস্তব ক্ষেত্রে যার অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে জীবন অর্থ ও মূল্য-নিরপেক্ষ; অন্য কোনও পরিচয় তার নেই। তাতে অর্থ ও মূল্যের আরোপ মনেরই খেলা। বলিষ্ঠ স্বাভাবিক মন জীবনের বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে পারে—তার দৃষ্টি matter-of-fact। কিন্তু যে-মন জগতের বাস্তবরূপকে উপেক্ষা করে তার মনগড়া তাৎপর্য তার উপর চাপিয়ে দিয়ে সেই তাৎপর্যকে রূপায়িত করবার জন্য নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তখন সে-মনকে অসুস্থ ছাড়া আর কি বলা যায়? অথচ এমন জিজ্ঞাসু অসুস্থ মনই তো আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সৃষ্টিমুখর হয়ে ওঠে—মানবিক সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কোথায় তবে জিজ্ঞাসু মনের প্রকৃত অসুস্থতা?

ফ্রয়েড যখন এই মানসিক অবস্থাকে 'অসুস্থ' বলে অভিহিত করেছেন, তখন বস্তুতঃ তাঁর দৃষ্টি রয়েছে মানসজীবনের অপর একটি দিকে—বলা চলে অন্ধকারের দিকে। কেন মানুষের মন বাস্তবের স্বরূপকে স্বীকৃতি না দিয়ে গভীরতর জিজ্ঞাসায় আদৌ লিপ্ত হয়? যে-মন সবল ও সংহত নয়, অথচ যার মধ্যে স্বভাবতঃই নানান কামনা-বাসনা বাসা বেঁধেছে, সে-মন ঘোরান পথে তার চরিতার্থতা খোঁজে জগৎ ও জীবনকে সন্দেহ ক'রে। অর্থাৎ নিজের আন্তর তাড়নে সে জীবনের কাছে প্রত্যাশা করে, দাবি করে এমন কিছু যা বাস্তবপক্ষে জীবনে নেই। ফলে মন কল্পনার আশ্রয় নেয়—নিজের ব্যক্তিগত কল্পনা, তার সঙ্গে মেলে সমষ্টিগত কল্পনা; সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদির মারফৎ যা মানবসভ্যতার ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিপদ ঘটে তখনই যখন সেই কল্পনায় সৃষ্ট জগতের মধ্যে সে নিজের অগোচরে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে নিজের মনের সৃষ্টিতে নিজেই বিভ্রান্ত হয়। দুনিয়ার নিয়ম অস্বীকার করে যা সে নয় সেভাবে তাকে দেখে।

এখন, যে-মন প্রকৃত সৃজনশীল, যাদের দানে মানব-সভ্যতা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সত্যিকারের 'অসুস্থ' মনের পার্থক্য সুস্পষ্ট—যদিও উভয়ক্ষেত্রেই আপাতদৃষ্টিতে একই প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসু মনোভাব সুস্পষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে বাস্তবকে অতিক্রম করলেও বাস্তব জগতের ধর্ম ও নিয়ম সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব ঘটে না এবং সেইজন্যই বাস্তবজীবন ও মানসসৃষ্টির জগতের মধ্যে বিভ্রম ঘটাবার অবকাশ হয় না; উভয় জগতের স্বকীয়তাই স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে নিজের অবদমিত অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনার চরিতার্থতা খোঁজবার আগ্রহই প্রবল থাকে এবং সে-আগ্রহে বাস্তবের সম্বন্ধে যথার্থ সচেতনতা কমবেশী লোপ পায়। ফলে একদিকে আন্তর তাড়না-প্রসূত কল্পিত জগৎ, অপরদিকে ব্যক্তিমানস-নিরপেক্ষ নিছক বাস্তব জগৎ; এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাতে লিপ্ত হয়ে ব্যক্তির ব্যবহারে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়।

(৪)

মানব-মনের সত্যরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে ফ্রয়েড কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিই নির্দেশ করেন নি; জীবনের বাস্তব সত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। এই জীবন-নিষ্ঠা (নিছক তত্ত্বনিষ্ঠা নয়) সমস্ত মনোবিশ্লেষণের মধ্যেই যেন একটা দ্বৈততার আভাস এনে দিয়েছে। সংজ্ঞান মনের বিচারের দ্বারা নির্জ্ঞান মনের আবিলতা থেকে মুক্তির নেহাত একটি 'আশাবাদী' মতবাদ দিয়েই ফ্রয়েড ক্ষান্ত হন নি। যুক্তি দিয়েই যে গোটা মানবসত্তার একটি পুরোপুরি রূপ ধরা পড়বে এমন কথা নয়, যুক্তির বাইরেও জীবনের দাবিই শেষপর্যন্ত প্রবল। তাই ফ্রয়েডের উক্তি—"জীবনকে সহ্য করাই তো শেষপর্যন্ত

সমস্ত জীবের প্রধান কাজ।" মানব-মনের যেসব সৃষ্টি বাস্তবের নিরিখে নেহাত ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, জীবনের নিরিখে তাদেরও মূল্য মানতে হবে। অর্থাৎ জীবনকে সহ্য করার ও বাড়ানোর ক্ষমতা দিয়েই মনের ভ্রমের মূল্য বিচার হবে। এইভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবনের যে প্রাধান্য মেনে নেওয়া হ'ল তার মধ্যে মনোবিশ্লেষণের যেন একটি আন্তর স্ববিরোধ রয়েছে—যা একদিক থেকে ফ্রয়েডের মতের উৎকর্ষই সূচিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ফ্রয়েডের মতটি নিছক একটি তত্ত্বদর্শন না হয়ে বাস্তব জীবনের আঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবার দাবি রাখে।

অপর দিকে আবার দেখতে পাই মানস-জীবনের সত্য আবিষ্কারে ফ্রয়েডের যে অবিচল নিষ্ঠা, সেটা কোনও পূর্বার্জিত বিশ্বাস, ঐতিহ্য, প্রামাণ্য কিংবা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভিলাষ দ্বারা ব্যাহত'হয় নি। এই প্রসঙ্গে Goethe Prize গ্রহণ উপলক্ষে (১৯৩০ সালে) ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে: "আমার জীবনের সব কাজ একটি মাত্র লক্ষ্যেই চালিত হয়েছে—সুস্থ এবং অসুস্থ মনের প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মতর বিকলতা সমূহ আমি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সেই সব লক্ষণের সূত্র ধরে, যে যন্ত্র এই প্রক্রিয়াগুলিকে চালনা করে তা কিভাবে গঠিত এবং কোন শক্তি তার ভিতরে একত্র এবং পরস্পর কাজ করে তা নির্ধারণ করতে চেয়েছি।"

(৫)

মানবসত্তায় নিহিত অযৌক্তিকের রাজ্যকে অনাবৃত করতে গিয়ে ফ্রয়েড কিন্তু কোনও যুক্তিবিরোধী জীবনবাদের প্রচারে প্রবৃত্ত হন নি। বরং তিনি বুদ্ধির কাছেই মানবপ্রকৃতির বুদ্ধি-অতিরিক্ত রূপের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই স্তরে বুদ্ধি ক্রিয়াশীল নয় অথচ তা সংজ্ঞান পদ্ধতির পথে বুদ্ধির গোচর হয়। তাঁর *Die Zukunft einer Illusion* ("ভ্রান্তির ভবিষ্যৎ") গ্রন্থে ফ্রয়েড মন্তব্য করেছেন—"... বুদ্ধির স্বর মৃদু, কিন্তু যতক্ষণ না তা শ্রুতিতে পৌঁছচ্ছে তার বিরাম নেই। অবশেষে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যানের পর তা সত্যিই শ্রবণের গম্য হয়।" যুক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একমাত্র যা তার জীবনকে সত্যিকারের সহজ করে তুলতে পারে। যুক্তির এ শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ফ্রয়েড একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হলেন, তার সঙ্গে কল্পিত মুক্তির আশাকে জড়াতেও তেমনি অসম্মত হলেন। তাঁর মতে মনঃসমীক্ষণের লক্ষ্য এমন সব পরিস্থিতিকে উদ্‌ঘাটন করা যার মাধ্যমে মানস-ব্যাপারে যা প্রকট তার ব্যাখ্যানের সূত্র আবিষ্কার করা যায়। আর এই সূত্র ধরেই মানসলোকের আবৃতস্তরে পৌঁছানো যায়।

সভ্যসমাজের যে বিভিন্ন প্রথা ও আচার-পরম্পরা নির্বিচারে স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে আসছে, তার ভিত্তিমূলে আঘাত হানল ফ্রয়েডের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য, ফ্রয়েড নিজে ছিলেন আজন্ম 'অবিশ্বাসী', প্রচলিত ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। অবশ্য নিছক 'নাস্তিকতা' ফ্রয়েডের লক্ষ্য ছিল না। ধর্মপ্রবণতার যে সমালোচনা তিনি "ভ্রান্তির ভবিষ্যৎ" গ্রন্থে করেছেন, সেটাও কোনও ধর্মশাস্ত্রঘটিত নয়, বরং সেটা নৃতাত্ত্বিক বিচারণা। তত্ত্বদর্শনের আলোয় ফ্রয়েডের বিচার নয়; তাঁর বিচার মানবসভ্যতার ইতিহাসের আলোয়। সেই বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিতেই তিনি মনঃসমীক্ষণকে উপস্থাপিত করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই মনঃসমীক্ষণের সহায়তায় যা ক্ষতিকর তার পরিবর্তে যা মানবসমাজের স্থায়ী উপকারী তার প্রতিষ্ঠা করা।

মানবসমাজের বাঞ্ছনীয় একটি পরিস্থিতি অর্জনের পথ নির্দেশ করতে গিয়ে ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি ও সত্যের সীমা কখনও লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ তাঁর আবিষ্কৃত সত্যকে তিনি চূড়ান্ত সত্য বা বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত অথবা বিকৃত হতে দেন নি। মানবপ্রকৃতির আন্তর সত্য বিষয়ীর (subject) সত্যতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড তাই কোনও নতুন আদর্শবাদ বা নীতিবাদ প্রচার করেন নি। নতুন নীতির স্রষ্টা তো 'অহম্' নিজে। সে তো নিছক বাইরের কোনও নীতিমান অনুসরণ ক'রে চলতে পারে না।

নির্জ্ঞান সত্তার গভীরে যে পিছটান রয়েছে—যা বাসা বেঁধেছে সুদূর শৈশবে—তাকে 'অহম্'-এর সংজ্ঞান বিচারে উত্তীর্ণ হতে হবে। দায়িত্বের বোঝা তাই 'অহম্'-এর উপরেই পুরোপুরি এসে পড়বে। যেমন, মানবপ্রেমের ব্যাপারে বলা যায়, এই 'অহম্' যে কেবল প্রেম পেতে চায় তা নয়, তার নিজের দিক থেকে এই প্রেম বিতরণ করবারও প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সত্তর বছর বয়সে ফ্রয়েড তাঁর স্বভাবসুলভ স্পষ্টতা সহকারে (হয়তো অতিরিক্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে) মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে যে-কথা লিখেছিলেন তার উল্লেখ করে এই আলোচনার সমাপ্তি করছি। …"আমি নিজেই মানবপ্রেমকে যে আঁকড়ে ছিলাম তা কোনও ভাবপ্রবণতা থেকে নয় কিংবা আদর্শের অনুসরণেও নয়, বরং ভেবে চিন্তে হিসেব করে ; কারণ, আমাদের আন্তর তাড়না এবং পারিপার্শ্বিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসত্তাকে ধরে রাখবার পক্ষে এই প্রেমকে অনেকটা যন্ত্রবিজ্ঞানের মতই অপরিহার্য মনে হয়েছিল।"

একটি অপরাধের বিশ্লেষণ

কমল মুখোপাধ্যায়, এম. এসসি. *

সমাজবদ্ধজীব মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য মানুষই তৈরি করেছে কিছু নিয়ম। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মানুষ চেয়েছে সমাজের কল্যাণ তথা তার নিজের কল্যাণ, স্থিতি আর ব্যাপ্তি। জীবশ্রেষ্ঠ সামাজিক মানুষ পরিপূর্ণভাবে আজও তা পায় নি; বিশ্বজোড়া অশান্তির বিষাক্ত হাওয়াই তার প্রমাণ। ত্রুটি হয়তো আছে কিন্তু তবু চেষ্টার শেষ নেই। আদর্শগত পরিপূর্ণতা মানুষের শুধু আজকের লক্ষ্য নয়; এ বহুযুগের চিরন্তন সাধনা। প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে "Man's continual striving for perfection in spite of all error and misunderstanding, defeat and disappointment, his perpetual attempt to transform all occurrences into harmony, to make the external express the inward and the partial success which attended his efforts show that the task he is attempting is one in line with the genius of reality।"[৫] শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক ব্যবহারের সভ্যতম প্রকাশের মাধ্যমে মানুষ ঢেকে রাখতে চেয়েছে তার আদিম রিপুর সহজাত রূপ। কিন্তু সব কালে বা সব স্থানে তা হয়েছে কি? সব নিয়ম বা আচারের বিচ্যুতির মতই এর বিচ্যুতি সামাজিক আয়াসলভ্য নয় এবং গোষ্ঠী বা ব্যক্তিমানুষের সামাজিক চেতনাকে ভ্রূকুটি কুটিল ব্যঙ্গে যেন তটস্থ করে তোলে। গোষ্ঠীর কথা যাক। জাতি বা গোষ্ঠীর ইতিহাসে যা সত্য ব্যক্তিমানুষের জীবনেও মোটামুটি তাই। সেই কারণে বর্তমান প্রবন্ধে ব্যক্তিমানুষের কথাই ধরা যাক।

শৈশব হতে শুরু আর বার্ধক্যে সমাপ্তির সম্ভাবনা—জীবনের আশা নিরাশা, দ্বন্দ্বদোলা চাওয়া আর পাওয়ার। জীবনের যাত্রা থেকেই শুরু হয় অভিজ্ঞতা, ক্রমশ বিকাশ লাভ করে আমাদের ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা প্রকৃতি, অনুভূতি, বোধ আর বিচার। কুমোর যেমন মাটি নরম থাকতে থাকতে চাকে দেয়, পারিপার্শ্বিকতাও তেমনি ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির গড়ন তৈরি করে কাঁচা অবস্থায় অর্থাৎ শৈশবে। সুতরাং বলা যায় আমাদের আজকের পাওনাগণ্ডা, সুখ, আশা ও দুঃখবোধের ভিত্তি আমাদের শৈশবের বিশেষ কয়েকটি বৎসর। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর গবেষণায় ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মানুষের জীবনে এই শৈশব অবস্থার গতিপ্রকৃতি ও বিকাশের ধারার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈচিত্র্য, পিতামাতা বা ঐ স্থানীয় অন্যান্য পরিজনদের চারিত্রিক, মানসিক ও যৌনগত লক্ষণ বা বৈলক্ষণ ইত্যাদির মধ্য হতেই নির্দিষ্ট হয় শিশুর কামজ গতিপ্রকৃতি তথা উত্তরজীবনে তার ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক ও মানসিক মূল্যবোধ। সাধারণভাবে বলতে গেলে শৈশবকালে নিজস্ব শারীরিক গণ্ডি থেকে শুরু হয়ে এই কামশক্তি (libido) ক্রমে পিতামাতা, অন্যান্য পরিজন, জিনিসপত্র তথা বিভিন্ন আগ্রহ, আশাআকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের মাঝে পরিব্যাপ্ত হয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

---

* সহ-মনোবিৎ, আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, কলিকাতা

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গতি প্রকৃতির রূপে প্রকাশিত হয়। তাই আমাদের ব্যক্তিত্ব ও তার প্রকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে ঐ কামজ ধারার ক্রমবিকাশের উপর। সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের সুরে বাঁধা এই কামনার ক্রমবিকাশের ধারা। এর যে কোনও স্বভাবীতার ব্যতিক্রম আপাতদৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ হ'ক না কেন, উত্তরজীবনে যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক রোগীর জীবন-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ যেমন এই সত্য সপ্রমাণ করেছে, সামাজিক ব্যাধিগ্রস্ত কিছু অপরাধীর জীবন-বৃত্তান্তও এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আমাদের দেশে অপরাধ-মনোবিদ্যার গবেষণাক্ষেত্রে ফ্রয়েড-সৃষ্ট মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ ও ব্যাপকতা না থাকলেও, সাধারণভাবে অপরাধীদের জীবন ও কার্যধারা নিয়ে মনোস্তাত্ত্বিক বিচার-আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে এবং এই রকম একটি জীবন-বৃত্তান্ত বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

যার কথা বলব, ধরা যাক তার নাম 'ণ' বাবু। অবিবাহিত, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় প্রায় এসে পৌছেছেন। এই 'ণ' বাবু অনেকবারের পর এইবার ধরা পড়ে দণ্ডিত হয়েছেন, একটি ১৭।১৮ বৎসরের কিশোরী হরণের দায়ে। মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল এর আগেই কয়েকবার এই ধরনের কাজে 'ণ' বাবু প্রত্যক্ষভাবেই লিপ্ত ছিলেন এবং এবারের মত প্রতিবারেই লক্ষ্য ছিল নারী-পণ্য বিক্রয়ে অর্থ-প্রাপ্তি। তবে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যে মূল্যমান নির্ধারিত হ'ত তা আমাদের নির্দিষ্ট 'ণ' বাবুর আর্থিক অবস্থার কাছে সামান্য। এখন সংক্ষেপে মূল ঘটনায় আসা যাক। এই কিশোরীটি 'ণ' বাবুর প্রতিবেশী কন্যা, স্বামী পরিত্যক্তা। পিতাপুত্রীর সহজ সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে 'ণ' বাবু এবং কিশোরীটির ঘনিষ্ঠতা। গত ২।৩ বৎসর যাবৎ এরা একই পাড়ার বাসিন্দা। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বাস জন্মাবার পর 'ণ' বাবু এই কিশোরীটিকে অন্য প্রদেশবাসী একটি লোকের কাছে বিক্রয় করে অসৎ উদ্দেশ্যে। কিশোরীটিকে কোথাও নিয়ে যাবার অছিলায় বাইরে এনে কিছু উত্তেজক পদার্থ খাইয়ে উল্লিখিত ক্রেতার কাছে দেওয়া হয় এবং ঐ লোকটি কিশোরীটিকে অন্যস্থানে নিয়ে গিয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে পর পর কয়েকদিন ধরে। কিশোরীটি কেন এবং কি কারণে আশ্রয় ছেড়েছিল—শুধু মাত্র ছলনায় ভুলে না নিজস্ব যৌন-তাড়নায়—তা এখানে মুখ্য আলোচনার বিষয় নয়; তবে মনে হয় দু রকম ঝোঁক বা তাড়নাতেই সে চালিত হয়েছিল।

'ণ' বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে একান্নবর্তি বৃহৎ পরিবারে 'ণ' বাবুর বাল্যকাল কেটেছে। 'ণ' বাবুর পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায়ের কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। পুত্রসঙ্গ বড় একটা হয়ে উঠত না বা সে-ধরনের বিশেষ কোনও অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না হয়তো। 'ণ' বাবুর মাতা সংসারের কাজে অন্যান্যদের মত ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এ ছাড়াও ছিল তাঁর ভীষণ পুজাআর্চার বাতিক এবং বেশ শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন এই মহিলা। দিনের অবসর সময়টুকু কাটত তাঁর পুজার ঘরেই। অর্চিতা দেবী ছিলেন লক্ষ্মী এবং আরও অনেক দেবদেবী। 'ণ' বাবুর বাল্যজীবনের স্মৃতি থেকে জানা যায় যে মায়ের কাছে যাবার বা থাকবার ইচ্ছা হলেও, 'ণ' বাবু মায়ের কাছে থাকতে পেতেন না; কারণ শিশু 'ণ' বাবুর ঠাকুরঘরে ঢোকাই নিষেধ ছিল। কখনও যদি কোনও অজুহাতে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকতেন, মার খেতে হ'ত তার জন্য। শুধু তাই নয়, এই গর্হিত আচরণের জন্য 'ণ' বাবুর মা মারা যাবেন—এমন ভয়ও দেখানো হ'ত 'ণ' বাবুকে। যথেষ্ট ভয় পেতেন 'ণ' বাবু ঠাকুরঘরে ঢুকতে; আবার মাকে ভীষণ ভালও বাসতেন আমাদের 'ণ' বাবু। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় শিশুর দিকে নজর দিতে না

পারলেও সমস্ত কাজের শেষে দিনান্তে রাত্রিবেলায় শোবার সময়ে স্নেহ আদর আর ভালবাসায় ভরিয়ে তুলতেন 'ণ' বাবুর মা তাঁর শিশুকে। কিন্তু শুধু ঐ রাত্রিটুকুই। দিনেরবেলায় যে সেই। 'ণ' বাবুর এখনও মনে পড়ে ভীষণ ঘুমের ঘোরে মায়ের সেই আদর ভাল লাগলেও তার পুরো ভাগটা নেওয়া যেত না। আর সেই আদরের রেশ নিয়ে শিশুর কোনও উপায় ছিল না দিনেরবেলা মায়ের কাছে কোনও আবদার বা দাবি উপস্থিত করার। করলে শাস্তির ভয় ছিল ষোল আনা।

'ণ' বাবুর বর্তমান মনোবৈজ্ঞানিক প্রতিন্যাস অভীপ্সায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখা যায়।

সম্ভাব্য মনোস্তাত্বিক বিশ্লেষণ

এই জীবন-বৃত্তান্ত মনোস্তাত্বিক মতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাতৃসঙ্গলাভে ও মাতৃসঙ্গ-কামনার ব্যর্থতা 'ণ' বাবুর বাল্যজীবনে (যে সময় শিশু তার মাকে বিশেষ পরিজন হিসাবে পেতে চায়) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ণ' বাবু তাঁর মাকে চেয়েছিলেন নিজের কাছে কিন্তু তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না ঠাকুর ঘরের বাঁধন থেকে তাঁর মাকে বাইরে আনার। সুতরাং প্রধান বাধা তাঁর মায়ের পুজোআর্চার ঘটা। ভয় দেখিয়ে, আর কিছুটা শাস্তির মাধ্যমে এই বাধাকে আরও দুরতিক্রম্য করে তোলা হয়েছিল শিশু 'ণ' বাবুর কাছে। যার ফলে সম্ভবতঃ অন্যান্য শিশুর সাধারণ জীবনযাত্রার মান ও ধরণধারণ থেকে এবং অপরপক্ষে মাতৃসঙ্গ বা মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক প্রাপ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে 'ণ' বাবু মানসিক জগতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটা no man's land-এ, যেখানে মানসিক জগতের চাপ ছিল প্রবল কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাবার কোনও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা ছিল না। 'ণ' বাবুর চাওয়া ও পাওয়ার মানসিক লোকসানের খতিয়ান থেকে সম্ভবতঃ তার মনে গড়ে উঠেছিল এক উদ্বেগ—"হয়তো মাকে বুঝি আর পাব না বা মা হারিয়ে যাবে"। এই অনুভূতিকে আরও দৃঢ় ও নিশ্চিত করে তোলা হয়েছিল এবং তুলেছিলেন 'ণ' বাবুর মা স্বয়ং, পুত্রকে পাপভয় এবং তাঁর নিজের মৃত্যু আশঙ্কা দেখিয়ে—যা আগেই বলা হয়েছে। এ সবের মিলিত ফলে খুব সম্ভবতঃ 'ণ' বাবুর কামশক্তির বিকাশের ধারায় ইডিপস পিতৃ-প্রতিরূপের (Oedipal father image-এর) স্থানে এক বৃহত্তর এবং শক্তিমান মাতৃ-প্রতিরূপ (mother image) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বলা যেতে পারে 'ণ' বাবুর অহম্ (ego) ঐ বৃহত্তর শক্তির বিশেষ চাপেই বা ভয়েই পরবর্তীকালে পুজা অর্চনা ও দেবদেবীর, বিশেষতঃ গৃহদেবীর, প্রতি ভক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। 'ণ' বাবুর এই ভক্তিকে তাঁর অধিশাস্তা শক্তির গঠনমূলক রূপ হিসাবে দেখলে ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে হয় "The development of the ego consists in a departure from the primary narcissism and......departure is brought about by means of the displacement of libido to an ego ideal imposed from without while gratification is derived from the attainment of the ideal."[৬]

যৌনজীবনে অবিবাহিত 'ণ' বাবু কখনও কোনও যৌন সম্পর্কে আসেন নি এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনও আসক্তি নেই। এই বর্তমান দুঃক্রিয়া আইনত দণ্ডনীয় হলেও, 'ণ' বাবু এর মধ্যে বিশেষ কিছু দোষ দেখেন না; কারণ 'ণ' বাবুর মতে তিনি যদি এ কাজ না করতেন মেয়েটি হয়তো

আরও বিপথগামিনী হ'ত বা আত্মহত্যা করত। টাকা নেওয়ার ব্যাপারে 'ণ' বাবু সামাজিক বিবাহে পণপ্রথার উল্লেখ করেন।

'ণ' বাবুর অতীত ইতিহাস, তাঁর ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতি ও তাঁর জীবনদর্শনের তাৎপর্যগত মূল্যবোধের মান থেকে স্বতঃই মনে হয় যে 'ণ' বাবু সম্ভবতঃ মর্ষকামী হয়ে উঠছিলেন তাঁর বাল্যজীবনের আবেগ ও কামজনিত ব্যর্থতার (frustration) ফলে এবং এই মর্ষকামীতা 'ণ' বাবুর মনের নৈতিক অববাহিকায় প্রবাহিত হয়েছিল বললে ভুল হ'বে না। এর প্রামাণিক সমর্থনে Otto Fenichel-এর লেখা কয়েকটি লাইন প্রণিধানযোগ্য—"The method of ingratiation and hidden rebellion against a severe super-ego may be sexualized in moral masochism, submissive and suffering attitudes directed at the achievement of or blackmailing into forgiveness may simultaneously serve as a distorted kind of passive sexual pleasure...... ।"[২] এ ছাড়াও বাল্যজীবনে 'ণ' বাবুর পিতামাতার ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ('ণ' বাবুর প্রতি) Otto Fenichel প্রদর্শিত নৈতিক মর্ষকামীতার (moral masochism) কারণগত প্রকৃতি যথেষ্ট মিল আছে (যেমন: "The childhood history of a moral masochist revealed a very weak father and a fantastic, religious, inconsistent and strict mother ...")[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'ণ' বাবুর নৈতিক মর্ষকামীতার উদ্দেশ্য ও কারণগত প্রকৃতির এক সঙ্গতি-সূচক ফল হ'ল 'ণ' বাবুর বর্তমান জীবনের অপরাধমূলক কার্যাবলী। এখন প্রশ্ন, শুধু কি নৈতিক মর্ষকামীতাই 'ণ' বাবুর অপরাধের একমাত্র পটভূমি? উভয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধ কি? আমরা বলতে পারি নৈতিক মর্ষকামীতার একমাত্র ফলাফল অপরাধ বা দুষ্ক্রিয়াজনিত কার্যকলাপ নয়। আলোচনার জন্য এখানেও আমাদের বাল্যজীবনের ইতিহাসে ফিরে আসতে হবে।

শিশুর কামজীবনে ক্রমবিকাশের ধারায় বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা বা পর্যায় হ'ল ইডিপস অধ্যায়; কারণ মনঃসমীক্ষকদের মতে কামজীবনের এই ইডিপস ক্রমাবস্থার গতিপ্রকৃতিই বিশেষভাবে মানুষের উত্তরজীবনের ব্যবহারিক গতি ও বিচ্যুতির মান। বিশিষ্ট মনঃসমীক্ষক Melanie Klein-এর ভাষায়:—"Psycho-analysis has shown that the Oedipus complex plays the largest part in the entire development of a personality......the whole charactei-formation too is directed from the Oedipus development, that all shades of difficulties of character, from the slightly neurotic to the criminalistic, are determind by it ।"[৩]

যদিও খুব জোরের সঙ্গে হয়তো বলা যায় না, তবু যা জানা গেছে তাতে দেখা যায় আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি শৈশবে যে চূড়ান্ত বৈরভাব, উদ্বেগ ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল (যার প্রধান ও প্রথম উৎস ছিল তার মা এবং তারও উপরে 'ণ' বাবুর মায়ের অতিরিক্ত পূজাআর্চায় আসক্তি), সেই মানসিক অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় অবদমনের এবং হয়তো অস্মিতাহানিতার (depersonalization)। চরম শক্তিময়ী পরম মাতার প্রতি শিশু 'ণ' বাবুর যে বিরাগ সহজাতভাবে দেখা গিয়েছিল তাঁর ইডিপস কামজীবনের অনাবশ্যক বাধারূপে, বিরাট শক্তি ও শুদ্ধতার প্রতীক চিহ্ন

সেই পরম মাতার (great mother) বিশাল ক্ষমতা ও প্রভাবের বাহ্যিক অভিভাবনে (suggestion) সেই বৈরভাব সোজাসুজি প্রকাশ হ'তে পারে নি এবং 'প' বাবুর মনে এক উভয়বলতার (ambivalence) সৃষ্টি করেছিল। নির্জ্ঞান থেকে বৈরভাব প্রকাশ পেল সংজ্ঞানে ভক্তির ছদ্মবেশে এবং বললে সম্ভবতঃ ভুল হবে না যে, অপরপক্ষে ঐ বৈরভাব সুযোগ বুঝে প্রকাশ পেল 'প' বাবুরই জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বিকৃতি ও দুঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এমন কি এই বিকৃতি ও দুঃক্রিয়াজনিত কার্যকলাপের মধ্যেও 'প' বাবুর মানসিক দ্বন্দ্ব ও উভয়বলতা প্রতীয়মান। নারীহরণ ও পরোক্ষ যৌনকার্যের উদ্দেশ্যে নারী স্থানান্তকরণের মধ্যে 'প' বাবুর যে-বিকৃতি দেখতে পাই তার ষোল আনা পরিপূর্ণতা দেখা যায় এই ব্যাপারে অর্থের বিনিময়যোগে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নারীহরণ ও বিক্রয়ের পশ্চাতে 'প' বাবুর নির্জ্ঞানে পরম মাতার প্রতি বৈরিতা, কামশক্তি, ভয় ও ভালবাসার এক মিশ্রদ্বন্দ্ব প্রতীয়মান বলে মনে হয়। পরম মাতার প্রতি এই ধরনের প্রতিন্যাস বা নির্জ্ঞানস্থ ইচ্ছা অত্যন্ত আদিম ও সহজাত বলে জানা গেছে। The Primal Crime and Unconcious প্রবন্ধে দেখা যায়:—"The earliest crime to be discovered both in history of the race and in the development of the individual seems to be patricide. But the crime which antedates it on an historically older level and even more deeply repressed in the unconscious of all of us is the murder or rape of the mother." অন্য আর এক জায়গায়—"The mother of pre-oedipal era is the woman who gives life and who can take it away. Her dominance is absolute......It is possible that the mother image of this deepest unconcious level was not murdered like the father on the Oedipal level. She was dethroned, degraded, stripped of her power by other means by the first rape"[৩]

উপসংহার

'প' বাবুর অপরাধজনিত ঘটনা এবং জীবন-বৃত্তান্ত ইতিহাস থেকে যৌনদুক্রিয়া এবং অপরাধী-মনের কারণগত বৈলক্ষণ বা বিকৃতি সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলা চলে না; কারণ বর্তমানযুগের মনোবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে কোনও সাধারণ মাপকাঠিতে ফেলে বিচারবিশ্লেষণ কিছুটা অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক মনে করে। আমাদের ব্যক্তিত্ব একে অপরের উপর নির্ভরশীল হ'তে পারে কিন্তু প্রতিটি সত্ত্বাকে সার্বিক বলতে অনেক মনোবিৎই নারাজ। এমন কি আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যগতমান স্বনির্ভরশীল এবং স্বয়ংক্রিয়। জীবনের সুদূর ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বর্তমান কার্যধারার সম্পর্কগত যোগসূত্র থাকলেও বর্তমান ধারায় তার কার্যকারীতা অত্যন্ত ক্ষীয়মান। বিশিষ্ট মনোবিদ্ Dr. Allport-এর ভাষায় "The theory declines to believe that energies of adult personality are infantile or archaic in nature. Motivation is always contemporary." আর এক জায়গায়: "......For whatever the *original drives or 'Irritabilities' of infants are, they* become completely transformed in the course of growth into contemporaneous

systems of motives"[১]। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতার উপর ঠিক এতটা নির্ভর করা যায় না। বিভিন্ন প্রতিন্যাস ও ব্যবহারিক প্রকাশ পারিপার্শ্বিকতার উপর নানাভাবে নির্ভরশীল এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যক্তি বা সমাজজীবনের ইতিহাসকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে, কালের সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তন যেমন স্বতঃসিদ্ধ ("The me, like every other aggregate, changes as it grows" —W. James) ও সত্য, তেমনি সত্য বর্তমান পরিবর্তনশীলতার অতীত রূপ—তার পশ্চাদ্‌পট।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণের রচনার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে বলতে হয়— "Human life is an organic whole where each successive phase grows out of what has gone before. We are what we are on account of our affinity with the past।"[৫] বর্তমান প্রবন্ধে 'প' বাবুর জীবনের অপরাধ পারিপার্শ্বিকতা বা ব্যবহারিক ধারার প্রতিসরণ বলা চলে। সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তিজীবনে ফেলে-আসা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার বিচারশক্তি ও বোধের উপর নির্ভর করে ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতি। সুতরাং পারিপার্শ্বিকতা একটা বিশেষ অবস্থা যার ব্যাখ্যাত অর্থ বা রূপ ব্যক্তিবিশেষের উপর কিছুটা নির্ভরশীল। সহজ ও স্বভাবী মানসিক বিকাশের মধ্যে এই তারতম্য বিশেষ প্রকট না হলেও, অস্বভাবী প্রকাশের মধ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ধারায় শৈশবকালীন অনুভূতি, আবেগ, উদ্বেগ ও বিষাদের গুরুত্ব কতখানি। বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত গবেষণার পর Melanie Klein দেখিয়েছেন, "Anxiety guilt and depressive feelings are intrinsic elements of the child's emotional life and therefore permeate the childs' early object relations, which consist of relation to actual people as well as to their representatives in his inner world"[৪]। সুতরাং পরিশেষে দায়িত্বের বোঝা অনেকখানিই বর্তায় শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার উপর। সুষ্ঠু পরিবেশ, স্বাস্থ্যসম্মত রুচি ও অভ্যাস ব্যক্তিত্বকে সুস্থ সবল ও স্বভাবী করে তোলে এবং প্রয়োজনমত সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা জীবনকে দেয় সহিষ্ণুতা, স্বাভাবিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে চলার বিচারবোধ। সহজাত আদিম প্রবৃত্তির অবদমন ও তার সামাজিক প্রকাশের জন্য শিশুকে নির্ভর করতে হয় তার অভিভাবকের উপর প্রায় পুরোপুরিভাবে। আলোচ্য 'প' বাবুর শৈশবজীবনে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল তাঁর প্রতি পিতামাতার অবহেলাজনিত আচরণ। ঠিক মত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত মনের খোরাক থাকলে সম্ভবতঃ 'প' বাবুকে অপরাধের পথে দেখা না যেতেও পারত।

যে সব বই বা রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে:—

১ Allport, G. W. *Personality, A Psychological Interpretation.*

২ Fenichel, Otto. *The Psychoanalytic Theory of Neurosis.*

৩ Gortjahn, Martin. *The Primal Crime and Unconscious (Searchlights on Delinquency).*

৪ Klein, Melanie. *Contributions to Psychoanalysis.*

৫ Radhakrishnan, S. *An Idealist View of Life.*

৬ Rickman, John. *A General Selection from the Works of Sig. Freud.*

মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা

প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম.এসসি. *

আদিমযুগে প্রকৃতির কোলে মানুষ আর পশু পাশাপাশি বেড়ে উঠছিল। আকৃতিতে প্রকৃতিতে মানুষে পশুতে পার্থক্য ছিল খুবই কম। কিন্তু পশুর মত হীন জীবনযাপনে বাধা দিল পশুর থেকে উন্নত মস্তিষ্ক আর পরিণত মন। তা ছাড়া ধীরে ধীরে ভৌগলিক ও জৈবিক প্রয়োজন তাকে গোষ্ঠীবদ্ধ করল। প্রয়োজন হ'ল আইন-কানুনের, বিধি-নিষেধের দ্বারা গোষ্ঠীর শৃঙ্খলা ও একতা রক্ষার। উদ্দাম পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করার প্রয়োজন বোধ করল এই গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম মানুষ। কারণ, একক স্বার্থ ও প্রকৃতির ইন্ধন জোগালে ভেঙ্গে নষ্ট হবে গোষ্ঠীর সংঘশক্তি—হানাহানির থাকবে না শেষ। ফলে মানুষ সংযত করল তার প্রকৃতিকে ; সামঞ্জস্যপুর্ণ করতে হ'ল তার কার্যকলাপ। গোষ্ঠীর প্রয়োজনে বলি দিতে শিখল স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষাকে। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ আর নিরাপত্তা কেবল সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীই দিতে পারে জেনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল মানবসমাজ। নিজেরই হাতে-গড়া আইনের বাঁধনে মানুষ বাঁধা পড়ল আষ্টেপৃষ্ঠে। এমনি করেই আদিম মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়াল।

এই সভ্যতার সূচনা থেকেই বহু প্রাচীন পুঁথিপত্রে উন্মাদরোগের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক এবং ইজিপসীয়ান গ্রন্থ সমূহে, এমন কি ওল্ড্ টেস্টামেণ্টেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু উন্মাদরোগের কারণ যে মন এ সিদ্ধান্ত এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা প্রণালীর উদ্ভাবন আধুনিক কালের। এই ব্যাধির ব্যাখ্যা ও অগ্রগতির পিছনে রয়েছে বহু মনীষীর অমর চিন্তাধারার দান।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মূর্চ্ছারোগ ও বিষাদবায়ু এই দুই প্রকার ব্যাধির উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। সেই সময়কার কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসক তাঁদের মারাত্মক চিকিৎসায় এই রোগ নিরাময়ের সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের চিকিৎসার প্রধান ঔষধ ছিল রোগীকে চাবুক মারা, লোহার শেকলে বেঁধে রাখা এবং তদুপরি উপবাস। কিন্তু রোগীদের প্রকৃত পক্ষে রোগ নিরাময় হ'ত খুবই কম। চিকিৎসার নিষ্ঠুরতা এর প্রচারের প্রতিবন্ধক হ'ল।

এই সময়কার সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটিস মূর্চ্ছারোগকে অলৌকিক কিছু বলে মানতে রাজী হলেন না। তিনি এবং প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পিথাগোরাস তাঁদের লেখায় কোমলতা ও সহানুভূতি-পুর্ণ চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, 'সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার।' এই সমস্ত উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসাকল্পে বলকারক খাদ্য, খেলাধূলা, গানবাজনা, মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ, স্নান ইত্যাদির বিধান এঁরা এবং সমসাময়িক লেখকেরা অনুমোদন ও প্রচলনের চেষ্টা করেন।

এর ফলে উন্মাদরোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে (এর মানসিক কারণ সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত কেউ সজাগ হন নি) মানবিক ধারা বইল মাত্র। কিন্তু এই উন্মাদরোগের কারণ অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি তখনও বহু বহু দূরে।

* মনোবিদ্যার উপাধ্যায়, গোখলে মেমোরিয়াল কলেজ, কলিকাতা

এর পর পরিবর্তন এল অন্যদিক হ'তে। গ্রীক এবং রোমান চিকিৎসকেরা লক্ষ করলেন, এই রোগীদের চিকিৎসায় চিকিৎসকদের কৌশল, বিচারবুদ্ধি এবং সহানুভূতি সব থেকে বেশী কার্যকর হয়। ফলে চিকিৎসকেরা সচেতন হয়ে উঠলেন এই সব বিষয়ে। এরই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ঔষধের প্রয়োগ এবং প্রথম রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হ'ল এই সব রোগের ক্ষেত্রে।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পর উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা সাধারণতঃ ধর্মযাজক, পুরোহিতরাই করতেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল উন্মাদরোগ শয়তান বা ডাইনীর মন্ত্রশক্তির ফল। রোগীদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান তাদের চিকিৎসা হ'ত পবিত্র জল, গাছগাছড়া, সুগন্ধি ধূপ ইত্যাদিতে। অধিকাংশ রোগীদের চিকিৎসাতে অর্থাৎ ডাইনীর মন্ত্র কাটাতে চাবুকমারা, শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার চলল। কিছুকাল পর পুরোহিতদের চিকিৎসাপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। তাঁরা রোগীদের রক্তমোক্ষণ ছাড়া রক্তসঞ্চালন (transfusion) ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন। সর্বদা মানুষের রক্তই ব্যবহার করা হ'ত তা নয়; পশুর রক্ত ব্যবহার করতেও তাঁরা ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। আর তার ফলও হ'ত মারাত্মক। এই সময় ইংলণ্ডে যে-ব্যক্তি উন্মাদ বলে বিবেচিত হ'ত তার বিষয়সম্পত্তি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সব মানসিক রোগাক্রান্তদের বেঁধে রাখার রেওয়াজ চালু ছিল। স্ত্রী এবং পুরুষ রোগীদের পৃথক পর্যন্ত রাখা হ'ত না।

মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল লণ্ডনে ১৪০৩ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। তখনকার বেথ্‌লহেম্‌ হাসপাতালকে 'পাগলা গারদ' বলাই ভাল। সত্যি কথা বলতে গেলে এই নামেই হাসপাতালটি বেশী পরিচিত ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত বিশেষ কমিশনের তদন্তের পর এই হাসপাতালের কিছু কিছু পরিবর্তন হ'ল। ১৮৪৫ সালে 'লুনাসি কমিশন' গঠিত হয়। ক্রমশ এই কমিশনই ১৯১৩ সাল হতে বোর্ড অফ্‌ কন্ট্রোল রূপে ইংলণ্ডে কাজ পরিচালনা করছেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দেই বলা যেতে পারে প্রথম মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সূচনা দেখা দেয়। এই সময় ফ্রান্সে চিকিৎসাবিদ্‌ (Pinel) রেভোলিউশ্যনারী কমিউনের হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই হাসপাতালে বছরের-পর-বছর বেঁধে-রাখা রোগীদের মুক্তি দিলেন তাদের বন্ধনদশা হতে। তা ছাড়া এদের কাজ করবার জন্য ছোট কারখানা, অবসর বিনোদনের জন্য নানা সাজসরঞ্জাম এবং খোলা হাওয়ায় বেড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বছরের-পর-বছর বাঁধা থাকায় এবং নানারকম শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে বহু রোগী দুর্দান্ত হয়ে পড়েছিল। এই মুক্তি পুনরোদ্ধার করল তাদের শান্ত স্বভাব; সুফল দেখা দিল এই সব ব্যবস্থার। কিছুকাল পরেই পিনেল প্যারিসে নিজের কাজে ফিরে গেলেন। প্যারিসে তাঁর সহযোগী হলেন এসকুইরল (Esquirol) নামে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য। এসকুইরলকেই এই নবচিন্তা ধারার প্রচারক বলা চলে। তিনি এই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক নতুন হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং মানসিক রোগের বিষয়ে প্রথম লেকচারার হন। এঁরই ছাত্র স্যার আলেকজাণ্ডার মরিসন ১৮৪৩ সালে এডিনবরায় এবং পরে লণ্ডনে মানসিক রোগ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। স্যার মরিসনই ব্রিটেনে মনোরোগ বিদ্যার প্রথম শিক্ষক।

১৮৪৫ সালে ব্রিটেনের হাসপাতালগুলিতে কিছু পরিবর্তন এবং নানাপ্রকার উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু অনেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রাচীন প্রথা ছাড়তে রাজী হলেন না। এই সময় আমেরিকান সমাজসেবিকা ডোরোথিয়া ডিক্‌স্‌ স্কটল্যাণ্ডে সমাজ-

উন্নয়ন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এঁর একক প্রচেষ্টায় বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে একটি রাজকীয় তদন্ত কমিশন ব্রিটেনে নিযুক্ত হ'ল ১৮৫৫ সালে। এই কমিশনের প্রস্তাবমত মানসিক হাসপাতাল সমূহে প্রভূত উন্নতি দেখা দিল।

ইতিমধ্যে মানসিক রোগের ইতিবৃত্ত, কারণ এবং শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকজন মনীষী সচেতন হয়ে উঠছিলেন। গ্রীক চিকিৎসকদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত রোগের শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর কিছুই এ পর্যন্ত জানা ছিল না। উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার শ্রেণী বিভাগকারী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিনিয়াস উন্মাদ রোগেরও প্রথম শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁর রচিত রোগের শ্রেণীবিভাগ হ'ল আদর্শবাদী (ideals), কল্পনাবাদী (imaginarii) এবং বিষাদবাদী (patheteu)। এর পরবর্তী শ্রেণীবিভাগ হ'ল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এই শ্রেণীবিভাগও মাত্র তিন প্রকার—নৈতিক, বুদ্ধিগত এবং বংশানুক্রম উন্মাদ। এই সঙ্গেই কয়েকপ্রকার শারীরিক কারণে উন্মাদ রোগ দেখা যেতে পারে বলে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করলেন ; তাঁরা সাধারণ অসুস্থতা, বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতা এবং সমবেদনামূলক অসুস্থতাও উন্মাদ রোগের কারণ হ'তে পারে বলে ঘোষণা করলেন।

ঠিক এর পরের উন্মাদরোগের শ্রেণীবিভাগ যেটি হ'ল তাতে দেখা যায় যে, শ্রেণী-বিভাগকারী বৈজ্ঞানিকেরা এই সময় শারীরিক রোগের অথবা তার প্রবণতার সঙ্গে সরাসরি উন্মাদরোগের কারণকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। উন্মাদরোগের নামকরণে বহু শারীরিক ব্যাধি যেমন, রক্তশূন্যতা, বাত, যক্ষ্মা, বহুমূত্র ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নামের যথেচ্ছ ব্যবহার এই সময় দেখা যায়। এ পর্যন্ত যে সব শ্রেণী-বিভাগের আলোচনা করা হ'ল তার প্রধান ত্রুটি হ'চ্ছে উন্মাদরোগকে মানসিক রোগ বলে গ্রাহ্য না করা।

১৮৫৪ সালে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় উন্মাদরোগের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই বছরেই প্রথম ম্যানিয়া বা উন্মত্ততা এবং ডিপ্রেসন অর্থাৎ বিষণ্ণতা একই রোগের দুইটি লক্ষণ বলে বর্ণিত হ'ল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্মাদরোগের ব্যাখ্যা হ'ল এই প্রথম। একই রোগী এক সময় চরম উন্মাদনা, আবার অন্য সময় অপরিসীম বিষণ্ণতায় ডুবে যেতে পারেন। ফরাসী চিকিৎসকগণ এর নাম দিলেন Folic Circulaire।

১৮৯৬ সালে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান মনোচিকিৎসক ক্রেপলীন এই ব্যাধিকে খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive) বলে আখ্যা দিলেন। এই সঙ্গেই অবসান হ'ল অন্ধকার যুগের। ইতিমধ্যে ১৮৩৭ সালে লণ্ডন কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ ইলিয়টসন সংবেশন দ্বারা চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এই চিকিৎসা-পদ্ধতি অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হয় ; ফলে ডাঃ ইলিয়টসন পদত্যাগ করেন।

এই সংবেশন বিদ্যার দ্বারা রোগ নিরাময়ের ইতিহাসে মেস্‌মারের কার্যাবলী স্মরণীয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এণ্টন মেস্‌মার তাঁর জীবনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রহস্যালোক রচনা করে পরোলোক গমন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত রোগ উপশমের প্রণালী হচ্ছে মেস্‌মেরিজম্। তিনি এই মেস্‌মেরিজম্-এর অমোঘ ক্ষমতায় নাকি সকল প্রকার রোগের উপশম করতে পারতেন। এক সময় মেস্‌মেরিজমের প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধান কালেই উপস্থিত হ'ল আসল সমস্যা। বিশেষ অনুসন্ধান পরিষদকে মেস্‌মার বললেন এই

রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায়টি হ'চ্ছে চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন একটি তরলবস্তু (magnetic fluid)। তিনি একটি পাত্রে মেস্‌মেরিজমের দ্বারা চুম্বক শক্তি সংগ্রহ করে রোগী বা যে কোনও ব্যক্তিকে ঐ পাত্রটি স্পর্শ করালেই তাকে তাঁর চিকিৎসার আয়ত্বাধীন করে ফেলতে পারতেন। মেস্‌মার, ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সমর্থন পেলেন না। শেষপর্যন্ত মেস্‌মেরিজম্ একটা কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হ'ল। সম্ভ্রান্ত কোনও ব্যক্তি এই মেস্‌মেরিজম্-এর নাম পর্যন্ত করতেন না।

আগেই বলা হয়েছে এই সংবেশন আবার চালু করবার চেষ্টা করে জন ইলিয়টসন ব্যর্থকাম হলেন। এর পর ম্যানচেষ্টারের চিকিৎসক জেমস্ ব্রেইড-এর প্রচেষ্টায় সংবেশন বিদ্যা কিছুটা সরকারী সমর্থন পেল। ডাঃ ব্রেইড দেখলেন যে উজ্জ্বল কোনও বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে রোগীকে তাকিয়ে থাকতে বলে ধীরে ধীরে তার চোখের পেশীসমূহকে ক্লান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারাই হচ্ছে সম্মোহন। এই মতবাদ সবাই সাগ্রহে গ্রহণ করলেন, কারণ এই তথ্য পূর্ব-বর্ণিত 'চৌম্বকশক্তি' ধারণার থেকে অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। এই নতুন প্রক্রিয়াটি জনপ্রিয় হ'ল এবং বিষয়টি ফ্রান্সে প্যারিসের শার্কো এবং ন্যানসির বেরন্‌হাইম্ গ্রহণ করলেন।

শার্কো সম্মোহন অবস্থার সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। তাঁর মতে এই দু'টি অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। এদিকে বেরেন্‌হাইমের মতে অভিভাবনের (suggestion) ফলেই সংবেশিত অবস্থার উদ্ভব হয় ; আর তা ছাড়া সাধারণ লোককেও সম্মোহন করা সম্ভব বলে জানালেন।

এখন প্রশ্ন উঠল হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি কোথা হ'তে? শার্কো প্রসঙ্গক্রমে ক্ষয়িষ্ণু বংশানুক্রম ধারার উল্লেখ করলেন। কারণ তাঁর রোগীদের ভিতর বহু রোগীরই ছিল ক্রটিপূর্ণ ইতিহাস। কিন্তু শার্কোর শিষ্য জ্যানে এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি লক্ষ করেছিলেন এই সব রোগীদেরই বিষঙ্গ (dissociation) রয়েছে। রোগীর বহিঃপ্রকাশ যা হ'ক না কেন, মূলতঃ সব রোগেই রোগীর মনের একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশ সমূহের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় বলেই এই সব রোগ দেখা দেয়। ফলে পক্ষাঘাত, অন্ধতা, অস্বভাবী ব্যবহার অথবা যুগ্মব্যাক্তিত্ব দেখা দেয়।

বিষয়টা কিছু বোধগম্য হ'ল বটে কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠল—সবাই-এর এ রকম হয় না কেন? জ্যানে এই প্রসঙ্গে জানালেন যে, এই সব অস্বভাবী ব্যক্তিদের মানসতায় এককীকরণের ক্ষমতার অভাব থাকে ; ফলে সজ্ঞান মানসতায় ভঙ্গুরতা দেখা দেয়। মনের একাংশ তাই অপর অংশের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে। এ যেন ঠিক একটা খোসা ছড়ানো কমলা লেবুর মত—এর কোয়াগুলিকে আলাদা আলাদা করে ছাড়িয়ে ফের একত্র করে রাখা। অল্প আঘাতেই এরা বিছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, আটকে রাখার মত কোনও বস্তুই এদের ভিতর নেই। তাই হিষ্টিরিয়াগ্রস্তদের এমন যথেষ্ট ব্যাক্তিত্ব নেই যার দ্বারা এই মনকে এক সঙ্গে গ্রথিত রাখতে পারে। কিন্তু এই তথ্য কেবল তথ্য হিসাবেই গ্রহণ করা চলে। এতে না আছে নিরাময়ের আশ্বাস, না আছে অন্য কোনও ভরসা।

এই সময়ই শার্কোর অপর এক শিষ্য এই উদ্বায়ু ব্যাধির কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। ইনি হলেন মনঃসমীক্ষণের প্রবর্তনকারী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। ফ্রয়েড নিজে চিকিৎসাবিদ্ ছিলেন এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ, বৃদ্ধি ও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। তিনি প্রায়ই শার্কোর চিকিৎসাগারে হিষ্টিরিয়া রোগীদের দেখতেন। ক্রমে তিনি এই রোগ সম্বন্ধে কুতূহলী হয়ে উঠলেন। তিনি উদ্বায়ুর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, এই ব্যাধি হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে রোগীর সম্মুখীন হওয়ার সাহসের অভাব।

তিনি এই তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরই সহকর্মী ক্রুয়ারের কাছ থেকে। ক্রুয়ার অনুসন্ধান করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে হিষ্টিরিয়ার কারণ হচ্ছে গোপন এবং কষ্টকর স্মৃতি; যেগুলি বিষঙ্গ হেতু রোগীর মন থেকে মুছে গেছে। ক্রুয়ার সংবেশন দ্বারা এই পীড়াদায়ক গোপন স্মৃতিগুলিকে উদ্ধার করে একটি রোগীর বেলায় দেখলেন যে উদ্বায়ুর লক্ষণগুলি দূরে হয়ে গেছে।

ক্রুয়ারের তথ্য হ'তে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীরা অবদমিত স্মৃতির তাড়নায় ভোগেন। স্মৃতিগুলি নির্জ্ঞানে (unconcious) অবদমিত হয়েছে যেহেতু সেগুলি পীড়াদায়ক; তা ছাড়া এই অবদমিত স্মৃতিগুলি নির্জ্ঞানস্থ হওয়া সত্ত্বেও মানসিক রোগলক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই প্রকল্প হতেই শুরু হ'ল যুগান্তকারী মনঃসমীক্ষণের সকল তথ্যের আবিষ্কার। শুধু যে মনোবিদ্যাই ফ্রয়েডের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হ'ল তা নয়; নৃতত্ব, লোকসাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত হ'ল তাঁর বিভিন্ন মতবাদ। ফ্রয়েডকে ঘিরে শুধু একটিমাত্র মতবাদ মনোবিদ্যায় প্রচলিত হ'ল ভাবলে ভুল করা হবে; তাঁর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় নতুন নতুন আরও মতবাদের পথ উন্মুক্ত হ'ল। এই বিভিন্ন মতবাদের পুরোধা হিসাবে উল্লেখযোগ্য য়ুং, এড্‌লার প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ।

আজ আমরা ভাল ভাবেই জানি ফ্রয়েডই হচ্ছেন মনোবিদ্যা জগতের একক পুরুষ যাঁর চিন্তাধারা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গৃহীত হয়েছে। আর তাঁরই আবিষ্কৃত পদ্ধতি আজ মানসিক রোগের চিকিৎসার পথ উদ্ভাসিত করে তুলেছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোক সম্পাতে।

শিশু-শিক্ষা

কনক মজুমদার, এম. এসসি.

শিশু-শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে লেখাপড়া শেখানোর কথাই বোঝায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত, ও গভীর। শিশু জন্ম থেকেই শিখতে আরম্ভ করে। শিশু কি শিখছে, কার কাছে শিখছে এবং কীভাবে শিখছে—এই রকম বহু প্রশ্ন এতে এসে পড়ে। শিশু-শিক্ষা ব্যাপারে এখন সর্বত্র একটা ভাবনা, একটা চিন্তা দেখা যায়। নিজের সন্তানকে কীভাবে শিক্ষা দেবেন, কি করে মানুষ করে তুলবেন, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বাবা-মায়েরা বিশেষ ভাবনায় পড়ে যান ; অনেকে বেশ উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েন এ ব্যাপারে। শিশু-শিক্ষার দু একটা মূল বিষয় নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ যাকে আমরা শেখাব তাকে আমাদের জানতে হবে। শিশু-মনকে না-জেনে, না-বুঝে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে শিক্ষা অধিকাংশ সময়ই অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। তখন দোষারোপ গিয়ে পড়ে শিশুর উপর।

শিশু-মনের স্বাভাবিক বিকাশের একটা ধারা আছে। সেই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা কাজে অগ্রসর হতে হবে। হাঁটবার জন্যে মাংসপেশীর যে বিকাশ ও সংযোজনা দরকার, তা না হলে যেমন হাঁটতে শেখাবার চেষ্টা করলে শিশুর শারীরিক বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি লেখাপড়া শেখাবার জন্যেও কিছুটা মানসিক, বিশেষতঃ বুদ্ধির বিকাশ দরকার। সেই মানসিক বিকাশ যথোচিত হবার পূর্বেই যদি আমরা লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করি তবে শিশু তোতাপাখীর মত কিছু শিখতে পারে বটে, কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তু সে ভাল করে বুঝতে পারে না। অপরিণত অবস্থায় তার উপর লেখাপড়ার ভার চাপালে লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ না হয়ে তার প্রতি বিরাগ বিতৃষ্ণা জন্মাবে। যেটা হামেশাই ঘটছে। গবেষণা করে জানা গেছে যে, ছ-বছর বয়সের আগে একটি সাধারণ শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে সুফল পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে হাতেখড়ি দিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করার প্রথা আছে। সেই হাতেখড়ির বয়স কমপক্ষে হওয়া উচিত পূর্ণ ৫ বছর, অর্থাৎ ৬ বছরের প্রারম্ভে। আজকাল অবশ্য শিশুরা দু-বছর কি আড়াই বছর বয়স থেকেই নার্সারি, কে. জি. প্রভৃতি স্কুলে যেতে আরম্ভ করে। ঐ সব স্কুলে ভরতি করার দিকে এখনকার বাবা মায়েদের খুব একটা ঝোঁক দেখা যায়। যারা কোনও কারণে শিশুকে ঐ সব স্কুলে ভরতি করতে পারেন না, তাদের উদ্বেগের সীমা থাকে না। কিন্তু শিশুরা সেখানে ঐ বয়সে লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছে মনে করলে ভুল করা হবে। বাবা মায়েদের আরও একটা ধারণা আছে যে, যত ছোট বয়সে শিশুদের পড়া আরম্ভ করা যায় ততই ভাল ; এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অতি শিশুকালে শিশুকে স্কুলে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।

শিক্ষা বলতে কেবল লেখাপড়া শেখানোই বোঝায় না। একটি ছোট শিশু আমাদের সমাজ, সভ্যতার খবর রাখে না। তার কাছে নিজের সুখ, নিজের আনন্দই বড়। তাই অনেকাংশে শিশু আত্ম-

মনোবিৎ হিন্দী হাই স্কুল, কলিকাতা, এবং লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের মনোরোগ সমাজকর্মী ও সহ-অধিকর্ত্রী।

কেন্দ্রিক অসামাজিক জীব। সেই শিশুকেই একদিন বড় করে তোলা হয় সভ্যসমাজের একটি উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে। সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় গৃহে ও নার্সারি স্কুলে। সেখানে সে নিয়ম শেখে, শৃঙ্খলা শেখে, নেতৃত্ব করতে শেখে, আবার নেতৃত্ব মানতেও শেখে।

সব রকম শিক্ষাদানের সময়ই মনে রাখা দরকার যে শিশু মনের একটা স্বধর্ম আছে। বিভিন্নস্তরে বিভিন্নভাবে সে-ধর্ম প্রকাশ পায়। একটি তিন বছরের স্বভাবী শিশুর মধ্যে অনেকখানি রোষ ও বিদ্রোহ ভাব দেখা যায়। তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। বয়সের সঙ্গে সেই রোষ ও বিদ্রোহভাব রূপান্তরিত হয়ে মনকে শক্তি ও বল জোগায়। কিন্তু জোর করে ভয় দেখিয়ে শিশু-মনের বিদ্রোহভাবকে যদি দমন করা হয়, তা হলে সবল অস্মিতা নিয়ে ঐ শিশুর পক্ষে বড় হয়ে ওঠা কঠিন হয়। তেমনি শিশুজীবনের ধর্ম হচ্ছে, 'নেওয়া বেশী, দেওয়া কম'। কিছু কিছু দিতে শিশুকে উৎসাহিত করা ভাল। কিন্তু বেশী নয়। বেশী দিতে বললে শিশু নিজেকে বিপন্ন ও অসহায় মনে করে। শিশুর জীবনে পাওয়ার প্রয়োজনই বেশী। শিশু যখন বড় হবে, সময় হবে, তখন সেও দেবে।

শিশু যখন মন দিয়ে কোনও কাজ করতে থাকে, তখন বার বার ডেকে তার মনযোগ ভেঙ্গে দিয়ে অন্য কাজের ফরমাশ করা ঠিক নয়। শিশুকে কখনও জোর জবরদস্তি করতে নেই। শিশু-মনে বিরক্তি ও অপছন্দ এলে তাকে কিছু শেখানো যায় না। শিশু-মনকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। বৈজ্ঞানিক যেমন প্রাকৃতিক জগতের স্বরূপ বুঝে নিয়ে তাকে বশে আনে ও কাজে লাগায়, শিশুর বেলাতেও ঠিক তেমনি। শিশু-মন বুঝে বুঝে তাকে পরিচালনা করতে হয়। শিশুর চঞ্চলতা কাজে লাগিয়ে তাকে পরিশ্রমী হতে শেখানো যায়। তার কুতূহলী মনে অজস্র প্রশ্ন জাগে; ধৈর্য সহকারে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভেতর দিয়ে শিশুকে অনেক বিষয় সহজে শেখানো যায়—পরে যে সব বিষয় পাঠ্যপুস্তকে তাকে শিখতে হয়।

শিশুকে উপদেশ দিয়ে বেশী শেখানো যায় না। সে শেখে, দেখে দেখে। শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব প্রখর। বড়দের মনোভাব সে নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে। তাই শিশুর সামনে বড়দের উচিত নিজেদের ব্যবহার সংযত করা। শিশুর নিকট কখনও কোনও কারণে মিথ্যা বলা উচিত নয়। শিশু আবেগপ্রবণ। সে আবেগে বিচলিত হলেও তার শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশু যাকে ভালবাসে তার মত হবার চেষ্টা করে। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাবা-মাকে অনুসরণ করে। তার প্রধান আশ্রয় বাবা-মায়ের ভালবাসা। সেখানে শিশুর সম্পূর্ণ আস্থা বজায় থাকা দরকার।

একটি ৯।১০ বছরের শিশুর সমস্যামূলক ব্যবহারের জন্য অভিযোগ এল। পড়াশুনাতেও সে ভাল করতে পারছিল না। শিশুটিকে ডেকে কথা বলাতেই বোঝা গেল যে সে, অত্যন্ত অবহেলা পাচ্ছে এই মনোভাবে কষ্ট পাচ্ছে। কথা বলবার সময় তার চোখ ছলছল করে উঠল। পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল। সে ৮ বছর পর্যন্ত বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল। যখন সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত তখন তার একটি বোন জন্মায়। সেই বছর শিশুটি প্রথমবার পরীক্ষায় ফেল করে ও ক্লাসে উঠতে পারে নি। এর আগে পর্যন্ত তার পড়াশুনার ফল ভালই ছিল। সে আর এক বছর ঐ ক্লাসে থেকে, দ্বিতীয় বছরে প্রমোশন পেল। একবছর পিছিয়ে গেল। তবু আগের মতন আর পড়াশুনা ভাল হ'ল না। উপরন্তু ব্যবহারের গোলমাল দেখা দিল। বাবা মা সাধারণভাবে ছেলের প্রতি দৃষ্টি দিতেন; মাকে অবশ্য ছোট শিশুটির প্রতি বেশী দৃষ্টি দিতে হ'ত। বড়টির মনের প্রতিক্রিয়া

বাবা মা বুঝতেই পারেন নি। শিশুটি বোনকে দেখে নিজেকে স্থানচ্যুত মনে করে বিপন্ন ও অসহায় বোধ করেছিল। তাই পড়াশুনার ফল খারাপ হ'ল। ক্লাসে উঠতে না পারায় সে আরও দমে গেল। তখন তার ব্যবহারেও অস্থিরতা প্রকাশ পেতে লাগল। সুখের বিষয়, বাবা মাকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল তখন তারাও চেষ্টা করলেন শিশুটিকে তার স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। ধীরে ধীরে শিশুটি সহজ হয়ে আসতে লাগল। এতেই বোঝা যায় যে আবেগের সঙ্গে পড়াশুনার ফলাফল কি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পিতামাতার কখনও অত্যধিক আদর, আবার কখনও অত্যধিক শাসন শিশুকে বিভ্রান্ত করে। শিশুকে যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁদের সঙ্গে শিশুর একটা অন্তরঙ্গতা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠা দরকার। যে শিক্ষককে শিশু ভয় পায় তার কাছে সে শিখতে পারে না।

শিশুর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় মায়ের কাছে। মায়ের সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয়। মায়ের মাধ্যমেই শিশু জগৎকে চিনতে শেখে। মায়ের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞান দ্বারাই শিশু পরিচালিত হয়। শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে, তখন বার বার সে পড়ে যায়; কোনও শক্ত জিনিসের উপর পড়ে গিয়ে হয়তো খুব ব্যথাও পায়। অনেক সময় দেখা যায় মা সেই শক্ত জিনিসটাকে চড়-চাপড় মেরে দিয়ে বলেন—"আর কেঁদ না, এই তো ওটাকে মেরে দিয়েছি, ওটা দুষ্টু, তুমি কেঁদ না" (অর্থাৎ ঐ জিনিসটা দুষ্টু বলেই যেন শিশুটি ব্যথা পেল)। এতে শিশুর মনে এই ধারণা জন্মায় যে সে, যে-ব্যথা বা কষ্ট পেল তারজন্য ঐ জিনিসটাই দায়ী। শক্ত জিনিসের উপর পড়ে গেলে ব্যথা লাগবেই, সেটা একটা বস্তুধর্ম বশতঃই লাগছে, সেজন্যে কেউই দায়ী নয়—এই শিক্ষা শিশুকে দেওয়া দরকার। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, জলে হাত দিলে ভিজে যাবে—তাতে কষ্ট হলেও তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। কষ্টকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখানো দরকার। অপরকে দায়ী করে কষ্টের লাঘব করানো দুর্বল মনের পরিচয়। শিশুকে অপরের প্রয়োজন বুঝতেও শিখতে হবে। নিজের সুখদুঃখবোধ অপর একটি শিশুর পক্ষেও সমান সত্য; এই দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর মধ্যে এনে দিতে হবে। একটি শিশু অপর একটি শিশুর খেলনা যখন কেড়ে নেয়, শিশুটির মনঃকষ্ট সম্বন্ধে তাকে সংজ্ঞাত করে দিতে হয়। তাতে সে অপরের প্রয়োজন বুঝতে শিখবে, সহযোগিতা করতে শিখবে, ঐকাত্ম্যবোধ অনুভব করতে শিখবে। যে শিশুর যত সহজে একাত্মতাবোধ হয়, সে তত সহজে জীবনের সব রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। বাস্তব জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখা জীবনের একটা বড় শিক্ষা। সেই শিক্ষার প্রথম সোপান তৈরি হয় অতি শিশুকালে এবং বাবা মায়ের কাছে। পরবর্তী জীবনের শিক্ষার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে শিশু-জীবনের এই প্রস্তুতির উপর।

ক্লান্তি

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এসসি. *

আমরা প্রত্যেকেই ক্লান্ত হই। বেশী শারীরিক পরিশ্রম করিলে ক্লান্তি বোধ করি ইহা আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি। এই বর্ষার দিনে ফুটবল খেলার সময় আসিয়াছে; খেলার মাঠে খেলোয়াড়গণ সারা মাঠ দৌড়িয়া ক্লান্ত হয়। খেলার মধ্যে যেটুকু বিরাম থাকে সে-সময় তাহারা শরীর এলাইয়া বসিয়া পড়ে, কেহ বা মাঠেই শুইয়া পড়ে। খেলার শেষের দিকে দেখা যায় তাহাদের দৌড়িবার শক্তি কমিয়াছে, খেলার বেগও তাই মন্দা হইয়াছে। দৌড়ের প্রতিযোগিতায়, দীর্ঘ পথ চলায়, পর্বতারোহণ ইত্যাদি নানান কায়িক পরিশ্রমে আমরা ক্লান্তি বোধ করি। এমনও হয় যখন মনে হইতে থাকে আর চলা সম্ভব নয়। অধিক পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হয়। এই অবস্থায় আমাদের মাংসপেশীগুলি অধিক মাত্রায় কার্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; ফলে আমরা আর যেন কাজ করিতে পারি না, দুর্বলতা বা ক্লান্তি বোধ করিতে থাকি।

এইরূপ একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। তখন গারোপাহাড়ে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া পায়ে-হাঁটা পাহাড়ের চড়াই-উতরাইয়ের পথে কিছুদিন প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কয়েকজন পার্বত্য গারো তাঁবু, আহার্য ইত্যাদি বহন করিয়া চলিয়াছিল। শীতের প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও সেদিন অপরাহ্নে যেন আর কিছুতেই চলা যাইতেছিল না। আরও কিছুদূর না যাইলে যে রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইবে না, সন্ধ্যা হইলে পাহাড়ের জঙ্গলে বিপদ হইতে পারে ইত্যাদি নানান কথা সঙ্গীদের বারে বারে বলিয়া পথ চলিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। কখনও বা দুই একটা হাসির কথা বলিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ধনের চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু উঁচু খাড়া পাহাড় উঠিতে উঠিতে তাহারা এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, এক স্থানে সকলেই পিঠের বোঝা নামাইয়া তাহাতেই হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। সেই শীতেও তাহাদের খালি গায়ে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল। সকলেই তাহাদের স্বাভাবিক নিয়মে বলিয়া বসিল, 'তাহারা একান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, আর তাহারা সেদিন কিছুতেই চলিতে পারিবে না, মরিলেও না'। জোর করিলে ফল হইবে না বুঝিয়া আপত্তি না করিয়া আমিও ক্লান্ত হইয়া তাহাদের মতই পথে বসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে ঘন জঙ্গল—সামান্যমাত্র পায়ে-চলার পথ সে-স্থান হইতে পাহাড়ের গা বাহিয়া খাড়াভাবে কিছু নীচে নামিয়া গিয়া আবার উঠিয়া গিয়াছে। আমি প্রায় সকলের পিছনে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ নিকটেই পাশের দিক হইতে গাছ ভাঙ্গার শব্দ শুনা গেল। অনেক সময় গাছের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তবু সচকিত হইয়া সকলেই সেই শব্দের দিকে কান পাতিয়া রহিল। বসিবার সময় হইতে তখনও বোধহয় দুই মিনিট সময়ও কাটে নাই। হঠাৎ সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিল সে উঠিয়া অন্যদের উপর দিয়া লাফাইয়া ডিঙ্গাইয়া প্রাণপণে যেদিক হইতে আমরা আসিয়াছিলাম আবার সেইদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছু বুঝিবার পূর্বেই দেখি অন্য লোকগুলিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া অতি দ্রুত

---

* মনঃসমীক্ষক। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতি। লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের অধিকর্তা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

দৌড়িয়া কোথায় জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল। কি ঘটিয়াছে কিছু না বুঝিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। নজরে পড়িল অনতিদূরে প্রকাণ্ড এক দাঁতওয়ালা বন্যহাতী পাশের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমাদের পথ ধরিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে। হাতে ভারি রাইফেল থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছুদূর পিছনে হটিয়া আসিলাম। মালপত্র সব পড়িয়া রহিল। হাতীটা কিছুদূর আসিয়াই আবার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। বিপদ কাটিয়া গেলে লোকজনদের ডাকাডাকি করিয়া একত্র করিলাম। তখন তাহারা ঝট্‌পট্ নিজ নিজ বোঝা পিঠে তুলিয়া প্রায় দৌড়িয়াই সে-স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়া চলিতে শুরু করিল।

তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল ইহা সত্য। তাহাদের চলিবার গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়াছিল ইহাও সত্য। কয়েক পা চলিয়া বিশ্রাম লইয়া আবার কয়েক পা চলিতেছিল। এত ক্লান্ত দেহেও যখন হাতীর সাড়া পাইল তখন তাহাদের সেই অবসন্ন দেহে শক্তি আসিল কোথা হইতে? যে-মানুষ মরিয়া গেলেও আর এক পা নড়িবে না বলিতেছিল সে-ই প্রকৃত বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত দেখিয়া দৌড়িয়া পালাইবার শক্তি কোথা হইতে পাইল? অত্যন্ত দুর্বল চলিবার-শক্তি-রহিত টাইফয়েডের রোগীকে হঠাৎ ভূমিকম্পের নাড়া খাইয়া বিছানা ছাড়িয়া প্রায় দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছি। এই রকম বিপদের সময় বা গুরু প্রয়োজনের সময় অবসন্ন অতি ক্লান্ত আমাদের দেহে শক্তি কোথা হইতে আসে? ক্লান্তি লোপ পায় কোন যাদুমন্ত্রে! শারীরবিদ্ বলেন আমাদের পেশীর মধ্যে কিছু শক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় গোপনে সঞ্চিত থাকে; বিপদের সময় সেই গোপন শক্তিই ক্লান্ত দেহে বল আনে। প্রথম অবস্থায় যে-ক্লান্তিবোধ হয় বিপদের মুখে সে-ক্লান্তি আর থাকে না। যে-কথা বলিতে চাহিতেছিলাম লেখার ফাঁকে তাহা বলা হইয়া গেল। অর্থাৎ যে-অবস্থাই শরীরের হউক না কেন ক্লান্তি একটা মানসিক বোধ; শারীরিক অবস্থার সহিত ক্লান্তির সম্বন্ধ কিছু থাকিলেও, বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ এক মানসিক অবস্থার জন্যই কান্তিবোধ হইয়া থাকে। শরীরের শক্তি থাকিতেও নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া বলবান লোক নিজের শক্তির প্রকাশ করিতে পারে না এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। শারীরিক ক্লান্তির ক্ষেত্রেও কিছু পরিমাণে মানসিক ক্লান্তির প্রভাব না থাকিলে, আমরা তেমন ক্লান্তবোধ করি না। আমাদের ক্লান্তিবোধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক কারণের জন্য অনুভূত হয়।

মানসিক ক্লান্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব। সকলেই হয়তো দেখিয়াছেন একঘেয়ে কাজ দীর্ঘ সময় ধরিয়া করিলে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কায়িক পরিশ্রমে কাজ বন্ধ না হইলেও সে-অবস্থায় কাজের গতি হ্রাস পায়, কাজে ভুল হইতে থাকে, 'আর যেন পারি না'—এইরকম একটা বোধ মনে জাগে। সেই সময় একটু বিশ্রাম করিয়া অথবা নিজের খুশিমত অন্য কোনও কাজ কিছুক্ষণ করিয়া পূর্বের কাজে ফিরিয়া আসিলে আবার তাহা করা সহজ মনে হয়। মন বাঁকিয়া বসিলে কাজ করা কঠিন হয়। প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সম্বন্ধেও অনেকের অতি অল্পতেই ক্লান্তি আসে। এইরূপ ক্লান্তি যে মানসিক অনিচ্ছা প্রসূত তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কয়েক প্রকার মানসিক রোগে এই ক্লান্তির লক্ষণ খুবই প্রবল রূপে দেখা দেয়। একটি রোগিণীর কথা বলি। বয়স ২৮।২৯ মাত্র, স্বাস্থ্য ভাল; একমাস পূর্বেও অক্লান্তকর্মী, হাসিখুশি আনন্দমুখর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হঠাৎ বিশেষ মানসিক কারণে তাহার আনন্দ লোপ পায়। কাজে উৎসাহ কমিতে কমিতে অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে দিবারাত্র প্রায় সকল সময়ই

বিছানায় বা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় সময় কাটাইতে থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এক কথাই বলিত যে সে অতি ক্লান্ত, এ ক্লান্তি সে কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। বলিত, জাগিয়া থাকিতেও কষ্ট হয়, ঘুমাইয়া থাকিতে পারিলেই ভাল হয়—তবু একটু ক্লান্তিবোধ হইতে রক্ষা পায়। নানাপ্রকারের শারীরিক চিকিৎসা করাইয়া বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় নাই। সাময়িক একটু ভালবোধ করিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এই প্রকার রোগী মনে করে যে, সামান্য পরিশ্রম করিলেই ক্লান্তিবোধ হইবে ও তাহাতে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইবে এবং সেই ভয়ে কখনও কোনও পরিশ্রমের কাজ সে করিতে পারে না। এমন কি কাজে মন না বসিলে যে-ক্লান্তি অনুভব করে তাহাতেও তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করে। শরীরের গ্রন্থীগুলি শিথিল হইয়া যাইবে, শরীরে আর শক্তি থাকিবে না ইত্যাদি নানারকম ধারণা তাহার ছিল। কিছুক্ষণ চলিলেই সে ক্লান্ত হইত। বাড়ীর উপরতলা হইতে নীচের তলায় নামিয়া আসিলেই ক্লান্তিবোধ করিত। অধিকাংশ সময়ই শুইয়া কাটাইত। তবু তাহার ক্লান্তি দূর হইত না।

এই মানসিক ক্লান্তিই জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ক্লান্ত করে। শরীরের ক্লান্তি পরিশ্রমের পরে উপযুক্ত বিশ্রামে দূর হয়, কিন্তু মানসিক ক্লান্তি বিশ্রামের পরে দূর নাও হইতে পারে। তাহা দূর করিতে হইলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার হয়। যে-মানসিক ক্লান্তির কথা বলিয়াছি সে-সম্বন্ধে মনোবিদ্যার প্রয়োগশালায় (laboratory) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভাল-অঙ্ক-জানা কোনও লোককে যদি অতি সাধারণ দুই সংখ্যার যোগ অঙ্কও অনেকগুলি ক্রমাগত দ্রুত করিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তবে কিছুক্ষণ পরে সেই সাধারণ যোগ অঙ্ক করিতেও তাহার ক্রমে সময় বেশী দরকার হয় এবং আরও বেশীক্ষণ ঐভাবে অঙ্ক করিতে থাকিলে অঙ্ক ভুল হইতে থাকে ও মানসিক ক্লান্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ক্লান্তি শব্দে অবসাদও বুঝায়। এইপ্রকার যে-অবসাদ দেখা দেয়, মানসিক বিশ্রাম দিলে সে-অবসাদ দূর হইয়া আবার মন সহজ ক্রিয়াশক্তি ফিরিয়া পায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে কোনও বিশেষ কাজ হইতে বিরত হইয়া কেবল চুপ করিয়া শুইয়া বসিয়া থাকিলেই মানসিক বিশ্রাম লাভ হয় না। নিজের আগ্রহের বা মনমত অন্য কোনও কাজে মন দিলেই অবসাদ দূর হইয়া যায়। অঙ্ক করিতে যখন ক্লান্তি আসে তখন আগ্রহ থাকিলে কোনও গল্পের বই বা কবিতা পড়িয়া, বাগানে ঘুরিয়া, এমন কি কোনও টুকটাক হাতের কাজ (handicraft) করিলেও মানসিক অবসাদ দূর হইয়া যায়। মন একদিকে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলে যে আর কোনওদিকেই তার চলিবার ক্ষমতা থাকে না এমন নহে। মানসিক ক্লান্তির চরম অবস্থায় অথবা বিশেষ মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অবশ্য উপরোক্ত উক্তি সত্য নাও হইতে পারে। অপরদিকে শরীর পরিশ্রান্ত হইলে মন ক্লান্ত নাও হইতে পারে, এবং শরীর আদৌ পরিশ্রান্ত না হইলেও মানসিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কলিকাতায় যে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল সেই সময় দেখিয়াছি দীর্ঘদিনের ব্যায়ামানুশীলনকারী যুবক অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আবার দুর্বল, শীর্ণকায় ব্যক্তি উৎসাহে উত্তেজনায় দলের সকলের অগ্রে দাঁড়াইয়া প্রবল বিরুদ্ধদলের সম্মুখে দীর্ঘ সময় অক্লান্ত বেগে লড়িয়া চলিয়াছে। ক্লান্তিবোধের এই মানসিক দিকের কথা মনে রাখা দরকার।

ক্লান্তি বা অবসাদ অন্যান্য নানান বোধের মতই একটা বিশেষ মানসিক-বোধ। এই অবসাদ-বোধ কেন হয় সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। দুই একটা উদাহরণ দিলে

বুঝিতে সুবিধা হইবে। মনে করা যাউক ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইয়াছে। তাহার মনে দুঃখ-কষ্ট বোধ হইতে পারে, লজ্জাবোধ হইতে পারে, আবার অবসাদ বোধও দেখা দিতে পারে। তেমনই ক প্রণয়াসক্ত হইয়া যদি ব্যর্থকাম হয়, তখনও তাহার ক্রোধ, ঈর্ষা, অনুতাপ বা অবসাদ দেখা দিতে পারে। ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যর্থতা হেতু, এমন কি নিজের আদর্শলাভের ব্যর্থতা হইতেও, এই মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্লান্তির মূলে কোনও কামনাবাসনার ব্যর্থতা নিহিত থাকে। আরও এক রকমের অবসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন রোগী দেখিয়াছি যে নিজের শৈশবের ঘুমন্ত অবস্থাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। স্বাভাবিক শিশুর মত ক্রমে বহির্জগতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উৎসাহিত হয় না। দুই শ্রেণীর রোগীর মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। এক রকমের জড়বুদ্ধির মধ্যেও এই ক্লান্তি বা মানসিক অবসাদ লক্ষণস্বরূপ দেখা দেয়। বাহিরের বস্তুজগতের সহিত সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত মানসিক পুষ্টি বা শক্তি থাকে না বলিয়াই ইহারা এক প্রকার মানসিক আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে বাস করে। ইহাদের মন সর্বদাই যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে, মনে হয়। অপর এক শ্রেণীর রোগীর মধ্যে এই ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দেয় বাহিরের বস্তুজগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া নানাপ্রকার ভুল বুঝিবার ফলে ; ইহাদের মন যেন শম্বুকের মত গুটাইয়া গিয়া স্তিমিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ মানসিক অগ্রগতির কোনও অবস্থায় শিশু যদি বাহিরের কোনও বাধাকে অতি প্রবল বা ভীতিকর মনে করে এবং ভিন্ন পথে নিজের অগ্রগতির পথ করিতে সচেষ্ট না হইয়া বা চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া তাহার মন সঙ্কুচিত হয় তবে সে পুর্বের স্তিমিত অবস্থানের পর্যায়ে ফিরিয়া যাইতে পারে। বয়স্থ ব্যক্তির জীবনেও বিশেষ ব্যর্থতার ফলে মন যখন ভিন্ন পথে বা পুনঃ চেষ্টায় নিজেকে সার্থক করিতে না পারে, তখন তাহার মন শৈশবের এক প্রাথমিক অবস্থায় আবার গড়াইয়া পড়ে।

এই অবসাদ যে-কোনও বিষয়ে ব্যর্থ হইলেই যে মনে ছড়াইয়া পড়ে এমন নহে। যে কামনা-বাসনা অতি প্রবল, যাহা লাভের জন্য আমার মনের অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত হয়, অর্থাৎ যখন ব্যক্তির স্বকাম (narcissism) প্রার্থিত পাত্র বা অবস্থার (object) সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়া নিজকে প্রায় শূন্য করিয়া বিশেষ পাত্রে আসক্ত হইয়া পড়ে, তখন কোনও কারণে সেই পাত্র বা অবস্থা লাভে ব্যর্থকাম হইলে ব্যক্তির স্বকামের মূলধন কম থাকায় মানসিক অবসাদ তীব্র রূপে দেখা দেয়। বিশেষ কোনও লাভ হইতে বঞ্চিত হইলে, নিজের মূল্যই অতি মাত্রায় হ্রাস পাইয়া অবসাদ দেখা দেয়।

পূর্বে প্রকাশিত "স্বকাম" ও "শক্তি" প্রবন্ধে এই বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। একদিক হইতে দেখিলে শিশু চঞ্চল, আশাবাদী, তাহার মন নানান বিষয়ে ছুটাছুটি করে। কিন্তু তাহারও পূর্বাবস্থায় শিশুর মন ঝিমাইয়া ঘুমাইয়া থাকে। অবসাদগ্রস্ত মন শিশুর এই প্রাথমিক স্তরে ডুবিয়া যাইতে চায় বলা চলে। যাহার বাস্তবজ্ঞান ঠিকমত হয়, তাহার মনে ব্যর্থতায় দুঃখ হইতে পারে কিন্তু এই ধরনের অবসাদ আসিবে না। প্রিয়জনের মৃত্যুতেও দুঃখের প্রাবল্যে ক্ষণকালের জন্য মানসিক ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু যে-মন পুর্ববর্ণিত শিশুর ঐ বিশেষ অবস্থা হইতে উন্নিত হইয়া বাস্তব অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হইতে পারে, সে-মন দুঃখে অধিক অভিভূত হয় না। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃখকষ্টবোধ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেইজন্য বিশেষ অবসাদ-বোধ হওয়া স্বাভাবিক বলা চলে না। সাধারণ মানুষের মনের গঠন খুব ঋজু নহে ; মানসিক পরিপক্কতাও সকলদিকে আশানুরূপ হয় না। ফলে অবস্থা বিশেষে অধিকাংশ মানুষই দুঃখে কষ্টে কমবেশী অভিভূত হইয়া পড়ে এবং সাময়িক হইলেও মানসিক ক্লান্তি বোধ করে।

বাস্তব জ্ঞানের সাথে আঘাত সহ্য করিবার মানসিক শক্তিও থাকা প্রয়োজন। শিশুর বয়স বাড়িবার সাথে সাথে সে বুঝিতে পারে যে চাহিলেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এমন কি অধিকাংশ চাহিদাই পুরণ হইতে পারে না। বাস্তবের এই প্রকট নিষ্ঠুর সত্য যদি শিশুর মনে স্থিরভিত্তি স্থাপন করিতে না পারে, তবে তাহার জীবনের মানসিক শক্তির মূলেই গলদ থাকিয়া যায় এবং ইহার প্রভাবে পরবর্তী জীবনেও তাহার চরিত্রের কোনও কোনও দিকে দুর্বলতা থাকিয়া যায়। গৃহনির্মাণের প্রাথমিক স্তরে যদি উপযুক্ত বুনিয়াদ নির্মাণ না করা হয়, তবে ভবিষ্যতের কোনও আঘাতে বুনিয়াদের যে-স্থান দুর্বল থাকে সেই স্থানের উপরের গাঁথুনিতে ফাটল ধরে বা সেই অংশ মাটিতে দাবিয়া যায়। মনের গঠনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ভবিষ্যতের দৃঢ়চিত্ত মানুষ (যে বিভিন্ন প্রকার আঘাত সহ্য করিতে পারে) গড়িতে হইলে, প্রাথমিক অবস্থা হইতেই শিশুকে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ব্যর্থতা ও আঘাত সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বহু ব্যর্থতা প্রতি মানুষের জীবনে অনিবার্য। ব্যর্থতায় দুঃখ বা সেই আঘাতে যাহাতে আমাদিগকে একেবারে শূন্য-মূল্য করিতে না পারে, সেদিকে শিশুর জীবনের প্রথম হইতেই তাহাকে যথাসম্ভব বাস্তব সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সুযোগ পিতামাতার দেওয়া উচিত। অতিস্নেহের বশে আমরা শিশুকে বাস্তব হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কোনও জীবনকেই আঘাত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। সহনশীলতা মানুষের জীবনের বড় শিক্ষা।

বাস্তবকে নিজের শৈশবাবস্থার মিথ্যা বা ভুল বুঝিবার জালাবরণ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সত্যরূপ চিনিতে ও জানিতে পারিলে জীবনের যে-অবসাদের কথা বলিতেছিলাম তাহা হইতে মানুষের মুক্তি পাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনই অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-বিপদের অতি পীড়াবোধ হইতে এবং সুখের অতি-বিগলন হইতে রক্ষা পাইয়া মানুষের পক্ষে মোটামুটি এক স্থির আনন্দের মধ্যে জীবন কাটানোও সম্ভব হইবে।

একটি দিনপঞ্জী

উদয়চাঁদ পাঠক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭

কালকের ডাকে জয়নাথের চিঠি পেয়েছি। অনেক দিন পরে এল তার চিঠি। লিখেছে যখন মানসিক দ্বন্দ্বে ওর মন শান্তি হারায়। বিক্ষুব্ধ মন বল্‌গাহীন যদৃচ্ছ দৌড় লাগাতে চায় কিন্তু পথ পায় না; চারদিক যখন ঘিরে ধরে, চেপে ধরে, তখন তার আমার কথা মনে পড়ে। আমার কাছে তার মনের অবস্থা লিখে শান্তি পেতে চেষ্টা করে। বিধাতা আমার ভাগ্যে এ কী লিখন লিখে দিলেন! যাদের সঙ্গে কোনও চেনাজানা নেই, সম্পর্ক নেই, এক সামান্য সূত্র ধরে তারাই হয়ে যায় একান্ত আপন। আর তাদের মনের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমার কাছে তারা বলে বা জানায়—প্রতিকার পাবার আশায় নয়, কারণ প্রতিকার আমি কী বা করতে পারি; কেবল আমায় বলে তারা নিজেদের মনের ভার হালকা করতে চায়। কত কথা শুনলাম; কত লোকের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতার বিচিত্র কত কথা। ভাবি ওরা আমাকেই বা সে সব কথা বলতে আসে কেন? আমিই বা শুনি কেন? হয়তো নিজের অন্তরের কোনও গোপন তারে যে-সুর গোপনে তন্দ্রার ঘোরে অনির্দেশে ঘুরে বেড়ায়, ওদের কথায় ভাষা পেয়ে মুক্তি পায় আমার সে-বোবা দুঃখ-বেদনার সুরগুলি। হয়তো তাই, হয়তো নিজের ব্যর্থতার স্বরূপ মানুষ বুঝতে পারে দশের ব্যর্থতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে। এও এক রকমের পাওয়া; না-পাওয়াকে পাওয়া। নিজের যে-অন্ধতাকে নিজে দেখতে পাই না তা অন্যের সহায়তায় দেখে নি। হ'ক তা দুঃখের, থাক তাতে ক্লেশ বা পীড়া, তবু তা লাভের। আমাকে আমি বুঝতে পারি; নিজের যে-সব কামনা-বাসনা অন্ধকারে লুকিয়ে বাসা বেঁধে আছে তাদের খানিক পরিচয় যেন পাই। হয়তো তাদের সুরের ঝঙ্কার আমার মনের সুরে তারা শুনতে পায়, তাই তারা তাদের কথা আমায় বলে, ব'লে একটু স্বস্তি বোধ করে। ওদের অশান্ত হৃদয় যদি শান্তি পায় ভাল, আমি তাতে আপত্তি করি না। কিন্তু কেমন যেন একটা অস্পষ্ট বেদনা-বোধ মনে থেকে যায়।

চিঠি পাবার পর কাল রাতে অনেক কথা মনে হয়েছে। অস্পষ্টভাবে অনেক কথাই ভেবেছি। মানুষের জীবনটাই অপূর্ব এক বিস্ময়। কেবল তার পাতা উল্টে গেলেও কত কি দেখতে পাওয়া যায়, কত ইঙ্গিত আপনা থেকে এসে ধরা দেয়, কত ছবি, কত সুর, কত অনুভূতি। কত ঐশ্বর্যপূর্ণ আমাদের এ জীবন! ছোট গণ্ডিতে বেঁধে দেখতে গেলে কখনও দেখি হাসি আবার কখনও দেখি কান্না ছেয়ে আছে তার আকাশ। সবটাকে মিলিয়ে বড় করে বড় রূপটাকে দেখতে পারলে, সে-হাসিকান্না শিল্পীর রচিত চারুকলার এক বিচিত্র রূপায়ণ ব'লে মনে হয়। মন আপনা হতে শান্ত হয়ে যায়, বলে "জয় তব বিচিত্র আনন্দ ... ... জয় প্রেমমধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা"। কার উদ্দেশ্যে এ

জয়গান তা তো জানি না। মন বলে এই ভাল, এই সত্য, এতেই আছে জয়। আসল কথা হিসেবী মনটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে ছন্নছাড়া খেয়ালী মনটা কিসের আবেশে মেতে ওঠে যেন। একে মিথ্যে বলব কী করে? জানি এতে আঘাত আছে। স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। কিন্তু মন যে সদাই বাস্তবের কঠিন শীতলতায় স্বপ্নের উষ্ণ মধুর প্রলেপ মাখিয়ে চলেছে।

জয়নাথ লিখেছে তার বিবাহিত জীবনের কথা। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নিয়েই যত গোল বাধে। স্ত্রী সুন্দরী, যুবতী। উভয়ের জীবনই চলেছে স্রোতের বেগে; জগৎটা মনে হয় রামধনু রঙে রাঙানো, আনন্দের, রসের পরিবেশনে ভরা। পাহাড়ী নদী এখানে ওখানে বাঁক ঘুরে তোড়ে চলে, তবু বাঁকের পাশে জাগে বালুচর। হয়তো বা তারও একটা বিশেষ সুর কারও কারও কানে ধরা দেয়। কেউবা তার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। প্রয়োজন আছে সবেরই; সেটা দেখতে জানতে পারা চাই। জয়নাথ বলে সে জানে সে-কথা, কিন্তু মনটাকে মানাতে পারে না। কী বুঝবে, কী করবে, যেন ঠিক করতে পারেনা। স্ত্রী রীতা লেখাপড়া জানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পাশ-করা মেয়ে। বিয়ের পর ঘরকন্নার কাজে যোগ দিয়েছে, কোনও আপত্তি জানায় নি। সংসার যে তার নিজেরই। সে না দেখলে, দেখবে কে? স্বামী তার ভালবাসার আপন জন; তার সুখদুঃখ সে-ই তো দেখবে, এ তো তারই জীবনের আনন্দ। জয়নাথ তাতে খুশী হয়। মুগ্ধ আবেশে কয়েকব ছর কেটেছে। পরিবারে লোকবৃদ্ধি হয়েছে—এক ছেলে এক মেয়ে। আনন্দমুখর, হাসির-কলরোলে-ভরা দিনগুলি যাচ্ছিল ভাল। কিন্তু—বাঁকের কোনে দেখা দিল বালুচর। রীতার পূর্বদিনের সহপাঠী রমেন কাজের সূত্রে বাসা নিল একই পাড়ায়। দেখা হ'ল রীতার সঙ্গে। পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠতে দেরি হয় নি। সহজ মেলামেশা যাতায়াত দুদিনেই শুরু হয়ে গেল। জয়নাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে রমেনকে, রীতা নিজেই আগ্রহ করে। ভালই চলছিল দিন। বছর না ঘুরতে রমেন পড়ল কঠিন পীড়ায়। ডাক্তার শঙ্কিত হলেন। তার বাড়ীতে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। রোগ বেড়ে তাঁর সাধ্যের বাইরে গেল। রীতা প্রথম থেকেই শুশ্রূষার কাজে যোগ দিয়েছিল। এখন প্রায় দিনরাত তার কাটতে লাগল রমেনের দেখাশোনা ওষুধপথ্য ইত্যাদির কাজে। নিজের বাড়ীর কাজের সময় পায় না; সে-ভার পড়ল বাড়ীর ঠাকুর চাকরের উপর। ছেলেমেয়েদের অযত্ন হতে আরম্ভ হ'ল। জয়নাথ রোজ আসে, রমেনের খোঁজখবর নিয়ে যায়। ক্রমে কেমন মনে হতে লাগল রীতা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের ঝুঁকে পড়েছে। দেখলে মনে হয় সে যেন এই বাড়ীরই লোক। জয়নাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যেন সামাজিক ভদ্রতা মাত্র। অল্প অল্প খোঁচা লেগে লেগে ক্রমে একটু ক্ষত দেখা দিল। একদিন রমেনের বাড়ীতেই পাশের ঘরে রীতাকে ডেকে জয়নাথ তাকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিল। তাতে রীতা বিস্মিত হয়ে বলেছিল, রমেনের এই কঠিন অসুখে তাকে ছেড়ে যাবে কি করে! জয়নাথ বেফাঁসভাবে বলেছিল, তুমি রমেনকে ভালবাস! রীতা অতি সহজ সুরেই বলেছিল রমেনকে সে ভালবাসে। জয়নাথের কোথায় যেন আঘাত বাধে; সে বলেছিল তার মানে এই নয় কি যে রীতা রমেনকেই ভালবাসে, তাকে নয়। রীতা জয়নাথের মুখের দিকে সোজা হয়ে তেমনি স্পষ্ট করে উত্তর দিয়েছিল ও কথা ঠিক নয়। জয়নাথকে সে ভালবাসে। জয়নাথ কি বুঝেছিল জানা নেই; কিন্তু দু চার দিন না যেতেই আবার এক সময় রীতাকে বলেছিল সে যে-ভালবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে তাতে কেবল জয়নাথ নিজে নয়, আরও কত সৌভাগ্যবান-দুর্ভাগা যে কোথায় ভেসে যাবে তার খবর কেউ জানতেও পারবে না। রীতা একটু হেসে সব বিদ্রূপটুকু হজম করে উত্তর দিয়েছিল, "আর যে ভেসে যায়

যাক, কিন্তু তুমি যে ভেসে যাবে না তা তুমি নিশ্চিত জেন"। হ'ল না, এ আশ্বাসেও মন ভ'রল না। রীতা রমেনের শয্যা পার্শ্বেই প্রায় দিনরাত কাটিয়ে দেয়। রোগী ভালর দিকে চলেছে—রীতা যত খুশী হচ্ছে তত বেশী করে তার সেবাযত্ন করে যাচ্ছে। একদিন জয়নাথ বলেছিল অন্য সব না হয় যেমন করে হ'ক চলুক কিন্তু বাইরে দশজনের সমাজ আছে; তাদের মতামত মন্তব্যের দিকেও তো দেখার দরকার আছে। রীতা বলেছিল মানুষের জীবনের চেয়ে মানুষের মতামতকে বেশী মূল্য দিতে সে রাজী নয়। তার জন্য যদি দুঃখ আসে আসুক, সে সব সইবে। ভালবাসার মানুষ বেদনায় যন্ত্রণায় পীড়িত হবে আর সমাজের কটু মন্তব্য শুনে তা চুপ করে বসে দেখে যেতে হবে এটা মানুষের জীবনের ধর্ম বলে সে মনে করে না। সমাজ যদি শাস্তি দেয় তা মাথা পেতে নেবে। কেবল বলেছিল "তুমি ভুল বুঝ না। রমেনকে আমি ভালবাসি, তার জন্য দুঃখ পাই। তাকে বাঁচাতে চাই; আর যে যা বলে বলুক, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হ'য়ো না। তোমার উপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই। তুমি আমায় বিশ্বাস কর।"

জয়নাথ সয়ে চলেছে। মনে সন্দেহের দোলা লাগে নি তা নয়। সময় সময় মন বেঁকে দাঁড়াতে চেয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ সম্বন্ধের ভিত্তি কি? রীতা বলে সে জয়নাথকে ভালবাসে; আবার সহজ ভাবেই প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে রমেনকে ভালবাসে বলে—তার জন্য শরীর পাত করে, নিজের সংসার অবহেলা করে, সমাজ অগ্রাহ্য করে রমেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিসে তা সম্ভব? চিঠিতে সেই প্রশ্নই সে আমাকে করেছে।

একজন কি একাধিককে ভালবাসতে পারে? তবে জীবনের, মনের ভিত্তি কি? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করেছে। উত্তর নিজে খুঁজে না পেয়ে আমাকে লিখেছে। লিখেছে তার বিশ্বাস আমি তাকে সদুত্তর দিতে পারব। কেন সে এ বিশ্বাস করে জানি না। সমস্যার সমাধান মানুষ কতটুকু করতে পারে? আজ যা ধামাচাপা দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে চালাতে চায়, কাল তা অন্যরূপে দেখা দেয়। আমরা কি সমস্যার সমাধান সত্যি চাই? উপস্থিত অসুবিধা বিপদ যা দেখা দেয় সহজে কোনও মতে তখনকার মত এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে দিতে পারলেই যেন হ'ল। নিদেনপক্ষে যাকে বলে ধামাচাপা দেওয়া, তাই করে আমরা চলি। হয়তো এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। সমস্যার সুমীমাংসা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না। সব মীমাংসাই তো সাময়িক আর আপেক্ষিক। শেষ কথা কিছু আছে কি? যে-কথা এখনকার শেষ কথা হ'ল, পরে অন্য পরিবেশের মধ্যে পড়ে তার অর্থ যায় বদলে। তখন আবার নতুন এক সমস্যা দেখা দেয় যার কিছুটা ঐ আগের সমস্যার সমাধানের সঙ্গে থাকে জড়িত। এই তো চলেছে। সুতরাং শেষ কথা কে বলবে? কবির কথা মনে পড়ছে—"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?" শেষ নেই বলে চুপ করে বসে থাকাও তো চলবে না; সমস্যা চারদিকে জড়িয়ে ধরবে, আর তার সাময়িক মীমাংসাও কিছু করা হবে না তা তো হতে পারে না। এতে জীবন তার গতি হারিয়ে অচল হয়ে পড়বে। স্রোত হারালে নদী যায় মরে। যাই হ'ক আর যেমন হ'ক, একটা কিছু সমাধান চাই। দেখতে হবে সমাধান করবার আগে প্রকৃত অবস্থা আর জীবনের মূল্য যেন ঠিকমত দেওয়া হয়। বস্তু আর জীবন কোনওটাই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। মূল্য দিলেই মূল্যবান হওয়া যায়। অপরকে মূল্য না দিতে পারলে নিজেকেই তা উল্টে এসে মারে। নিজের মূল্য এমনি করেই আমরা হারাই। শত্রুবধের আয়োজনের মধ্যেই লুকানো থাকে আত্মবধের বীজ। সময়ে তা নিজেকেই এসে মারে। আমাদের স্বার্থবুদ্ধি রাজা হলে তখন

আমরা নিজেকে করি প্রধান, অন্য আর সব গৌণ হয়ে পড়ে; কিন্তু পরকে বিচার করতে গিয়ে সে-সূত্রটা হারিয়ে ফেলি বলেই লুকিয়ে এসে মার নিজেকেই মারে। প্রকৃত দেখায় নিজেকে বিচার না ক'রে পরকে বিচার করা যায় না। ভুল করি সেইখানেই।

মনে হচ্ছে জয়নাথের এ প্রশ্নের জটিলতা ভেদ করতে না পারার কারণও সেইখানেই। জয়নাথ দোহাই দিয়েছে পরিবারের সমাজের নামে; কিন্তু মূলতঃ সে রীতাকে পেতে চেয়েছে তার মন মত করে। ভুলেছে রীতার একটা ভিন্ন সত্তা আছে, তারও একটা পৃথক দাবি আছে। নিজেরটুকুকে বড় করলে সহবাস চলে না। হয়তো রীতাও কিছু ভুল করেছে সেইখানেই। তবু সে বারে বারে বোঝাতে চেয়েছে জয়নাথকে সে ভালবাসে। সে ভালবাসা তার মিথ্যা নয়, তাতে তার আন্তরিকতার অভাব নেই। রমেনকেও যে সে ভালবাসে সে-কথাও সে স্পষ্ট করেই বলেছে। ভালবাসার পাত্রকে বস্তুর মত ক'রে একান্ত আমার দখলের সম্পত্তি করবার এই আত্মদুর্বলতার ফলেই বাধে বিরোধ। অপরকে না-বোঝার মূলে থাকে নিজেকে না-বোঝার দীনতা।

জয়নাথ হয়তো চায় একান্তভাবে রীতাকে নিজের দখলের সম্পত্তি করে রাখতে। ভুল! তাতে জয়নাথ যেমন কৃপণতায় দীন হয়ে যাবে, রীতাও তেমনি নিজের জীবনের স্রোত হারিয়ে, প্রাণহীন রসহীন রিক্ততার অতি আড়ম্বরে ভরে উঠবে। না হয় দেখা দেবে তার মরুময় সার-শূন্যতা। জয়নাথ কি রীতার বস্তুপিণ্ড পেয়ে সুখী হতে পারবে? "ভালবাস, চেও না তাহারে", এমন কথা বিশেষ অবস্থায় কবিই বলতে পারেন; কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, যাকে ভালবাসি তাকে চাই—দেহে মনে তাকে চাই। সে-চাওয়া যেমনই হ'ক, দখল করতে চাইলেই ভাঙন ধরবে। মানুষ তা বুঝতে না পেরে একের পর এক যত বেড়ি পরাতে থাকে তত তার ভালবাসার পাত্রকে ক্রমে হত্যা করে, হারায়। নিজে যা হারায়, জানতেই পারে না নিজের অভাবের জন্যই তাকে হারায়; পাবার ভ্রান্ত আয়োজনে সে হারানোর পথটাই প্রসস্ত করে তোলে। রীতা হৃদয়ের আবেগে তার ভালবাসার পাত্রকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, তার কষ্ট দূর করতে চেয়েছে। ভালবাসার টানেই সে তা করেছে। যদি তা না করত তবেই তাকে স্বার্থলোভী, আত্মভ্রষ্টা বলা চলত। সে যা করেছে তাতে দোষ দিতে পারি না। সমাজ হয়তো মুখ চেপে হাসবে। কী এসে যায় তাতে। রীতা প্রাণের আবেগে সে-বাধা অনায়াসে উপেক্ষা করে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। তাকে বলব সত্যধর্মী। কিছুদিন আগে একজনের সঙ্গে এই ধরনের কথা বলেছিলাম। শুনে সে আমায় বলেছিল, সমাজে অনাচারের প্রশ্রয় আমি দিচ্ছি। মানুষ জীবনের স্রোত সুন্দরভাবে প্রবাহিত করবার জন্যেই জীবনের গতির পথে নিয়ম তৈরি করে। কিন্তু সে-নিয়মের নিগড় যদি জীবনকেই পঙ্গু করে দেয় সমাজরক্ষার দোহাই দিয়ে, তাতে কি সমাজ বাঁচে? জীবনকে মেরে জীবনের জয়গান, এমন দানবিক বিকৃতি যদি মানুষকে পেয়ে বসে তবে আর যাই হ'ক তাতে মানুষের জীবনধর্মের সত্য পরিচয় থাকবে না। আমার মন বলছে রীতা, তুমি সত্যধর্মী। তোমার অন্তরের শক্তিতে তুমি হবে জয়ী। সমাজ যদি তোমার জয়ন্তী না গায় তাতে তারই হবে অগৌরব; তোমার সত্য অমর হয়েই থাকবে। সবলের যা ধর্ম, দুর্বলের পক্ষে তাই হতে পারে অপমৃত্যুর উপায়। ধর্ম মানুষের এক নয়। নিজের ধর্ম নিজেকেই নিজের জীবন থেকে পেয়ে পালন করতে হবে। আর সব ধর্মই হবে পর-ধর্ম; তাতে হবে বিনাশ। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, শাস্ত্রকার এই কথাই বলে গেছেন। স্বধর্ম মানুষের নিজের ধর্ম, সমাজের পরিবর্তনশীল দিনযাপনের ধর্মটুকুই নয়।

এ ধর্ম আরও অনেক গভীর। রীতা তার অন্তরে অন্তরে যে-শক্তি যে-প্রেরণার আবেগ অনুভব করেছে, কোন মন্ত্র জপ করে সে তা পাবে?

রীতা যদি জয়নাথ আর রমেন দুজনকেই ভালবেসে থাকে তাতে দোষ দেবার কী আছে? স্বামীর প্রতি ভালবাসা থাকলে কি আর কারও প্রতি ভালবাসা থাকতে পারে না? বিবাহের মালা কি গলার ফাঁস! আমি স্ত্রীর কাছে লোভীর মত আরও আরও চাইতে পারি; কিন্তু সে-চাওয়া তো আমারই দীনতার পরিচায়ক। নিজেকে কেন দেখতে পারব না? আমার ক্ষুদ্রতা, দীনতা, অভাব কেন নিজে জেনে বুঝে নিজেকে ঠিক মত গড়ে তুলব না? নিজের অভাবের বিকার দিয়ে সমাজকে দূষিত করবার কোনও অধিকার কি আমার আছে? নিজের ক্লেদ ছড়িয়ে সমাজকে করব ক্লিন্ন; আর বোবা সমাজ যুগ যুগ ধরে তাই সইবে—কোনও প্রতিবাদ তার করবে না, করতে পারবে না। একেই বলব নীতি? রীতা যদি এ নীতির পূজা না করে থাকে, যদি নিজের ধর্ম খুঁজে নিজের নিষ্ঠার নীতি মেনে তার জীবন চালিয়ে থাকে তবে সে সার্থক হয়েছে; জরাগ্রস্ত সমাজ তার মৃতকল্প ক্ষীণ স্বরে যতই না প্রতিবাদের চীৎকার করুক। রীতা জয়নাথকে বলেছিল মা সন্তানকে ভালবাসে বলে কি স্বামীকে ভালবাসে না? সন্তানের ভালবাসায় কি মায়ের গভীরতা বা তীব্রতা থাকে না? স্বামী কি তখন পর হয়ে যায়? দুয়ের ভালবাসার তীব্রতা গভীরতা দুই-ই থাকতে পারে। রীতা ঠিকই বলেছে; একটু উপকরণের প্রভেদ আছে কিন্তু ভালবাসা একই। নারী পুরুষকে যে-প্রেমালিঙ্গন করে আর নিজ সন্তানকে যে-আলিঙ্গন করে, তার মধ্যে গভীর মনের ভোগ-বৃত্তির সমতা আছে। থাকুক; তবু আমরা কোনও ভাব চেপে, কোনও ভাব বাড়িয়ে, দুই অনুভূতিকে পৃথক করে তুলি। ভোগও তাই দুরকমের মনে হয়। সমাজও তাই সন্তানকে প্রকাশ্যে আদর করলে তাতে নীতির দোহাই দিয়ে বন্ধ করতে শাসনের তর্জনগর্জন করে না। অনেক অসামাজিক কাজও একটু চোখের আড়ালে রাখলে সমাজ চোখ ঘুরিয়ে রাখে। আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের এ শঠতা শেখায় তখনই যখন অন্যায়ভাবে তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়। উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভালবাসা বলা চলে না। দুর্বলতার বিকারে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়, আর ভালবাসার শক্তিতে মানুষ আত্মধর্ম নীতি পালন করে।

রীতার পরিচয় চিঠিতে যা পেয়েছি তা থেকে তাকে অসুস্থ বা উচ্ছৃঙ্খল বলবার কিছু পাই নি। তাকে সমাজের বিকৃত সঙ্কীর্ণ নীতি ব্যাখ্যায় ব্যভিচারী বলবে কিনা জানি না। কী সে করেছে যা দোষণীয় বলা চলে? রোগীর সেবা করেছে—এই তার পাপ? স্বামী ভিন্ন বন্ধুকে সে ভালবাসে এই তার পাপ? লোভীর কথা, কেবল মাত্র দৈহিক সুখান্বেষী কামুকের কথা বলছি না। তাদের সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই, কারণ তারা মানসিক রোগগ্রস্ত। তাদের বাদ দিয়ে যাঁরা সুস্থ সমাজের উচ্চ আসনে বসে সমাজের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণকে জীবনের বড় ধর্ম বলে বড়াই করে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজেদের সতীত্ব বা সততা জাহির করেন, নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁদের কাছে একটা বিনীত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। বাহারি সাজপোষাক করে বাইরে বিশেষ ভঙ্গী নিয়ে চলার গোপন কথাটি অপরের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা নয় কি? কোন্ নারী বা পুরুষ এমন আছে যে কল্পনায় বা স্বপ্নে নীতির গণ্ডির বাইরে অপর একজনের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে নি বা ভোগ্য বলে মনে করে নি? নিজের সাজসজ্জার আড়ালে কি আমাদের ভোগ-লিপ্সাই কাজ করে না? বিশেষ করে নারীর আবরণ আভরণ আচ্ছাদনের ভঙ্গী কি পুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার

ইন্দ্রজাল নয়? আর সে-আকর্ষণেরও মূলকথা কি দেহজ ভোগ নয়? কোথায় তবে সীমারেখা টানব? দেহের আকর্ষণ ও দেহভোগের স্পৃহা, আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে আমাদের মজ্জায় মিশে আছে। তাকে অস্বীকার করে সাধু সাজবার মিথ্যা ভণ্ডামী কেন? যা স্বভাব তা মানব না কেন? অবশ্য মানা মানেই এ নয় যে ব্যবহারে সব কামনাবাসনা যখন তখন যেমন তেমন ভাবে মিটিয়ে নিতে হবে। এইখানেই প্রকৃত নীতির জন্ম। সেখানে জীবনের সত্যনিষ্ঠা জাগে। ব্যভিচার থাকে না। ভালবাসায় নিষ্ঠা না থাকলে তাকে ভালবাসা বলা চলে না। নীতিপালন আর জীবন-নিষ্ঠা এক নয়। দুয়ের মধ্যে অসীম তফাত। রীতা রমেশকে গভীরভাবে ভালবাসে। নারীর পক্ষে অপরকে ভালবাসা যতখানি সম্ভব হয়তো ততখানিই ভালবাসে। তাই কি সে নীতিভ্রষ্টা? এর চেয়ে বড় মিথ্যা, জীবনের দিক থেকে আর কী হতে পারে? রীতা তার স্বামীকেও ভালবাসে, রমেশকেও ভালবাসে। সে তাই বলে; কাজেও সেই কথারই প্রমাণ দিয়েছে। ভালবাসায় দোষ কোথায়? দোষ দেব কাকে? অধিকারবোধ ও তার মনের দুর্বলতাহেতু রীতাকে দখলে রাখবার চেষ্টাই জয়নাথের জন্য বড় হয়ে উঠেছে। ভালবাসার চেয়ে, বিশ্বাসের চেয়ে, অধিকার-বোধ বড় হওয়ায় জয়নাথের মনে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সে নিজে দুর্বল, নিজের ভালবাসায় তার আস্থা নেই; হয়তো সে নিজেকেও ঠিক ভালবাসে না। ভালবাসা খুঁজে বেড়ায় অন্যের মধ্যে নিজের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াসে—নিশ্চিন্ততার জন্য। তাই যা চায় বুভুক্ষুর মত সবটুকু গিলে খেতে চায়। অপরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর তার নেই। মন তার মেলতে জানে না। শঙ্কায় বেঁধে রাখতে চায় ভালবাসার পাত্রকে। জয়নাথ কি অন্য কোনও নারীকে কখনও ভোগদৃষ্টিতে দেখে নি? কতটুকু ভোগ কে করবে তা নির্ভর করে তার মানসিক বিকৃতির উপর, অথবা সুস্থ মনের বেলায় তার জীবনের সত্যধর্মের শক্তির উপর। দুর্বল দু হাতে সব জিনিস আঁকড়ে ধরে জমিয়ে রেখে হারাবার শূন্যতার দুঃখ হতে বাঁচতে চায়। সবলের কাছে সঞ্চয় বাধা; উৎকণ্ঠা না থাকলে সহজ চলায় টান পড়ে না। জীবনের সত্যতা তাকে শক্তি দেয়। ক্ষুদ্র গণ্ডি তাকে বাঁধতে পারে না। নিজের দুর্বলতার বিপাক থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে না পারলে জয়নাথ তার জীবন থেকে রীতাকে হারাবে—বাইরে নাও হতে পারে, অন্তরে। তাদের সে-দূরত্ব আর কোনওদিন দূর হবে না। কাছের ধনকে গাঁটে বেঁধে আড়াল করলে আর তাকে নিজের করে পাওয়া যায় না। হারানোর সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টাতেই সময় বয়ে যায়; পাবার পূর্ণতা লাভ করবার সময় পাওয়া যায় না। তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া হয়তো যায় কিন্তু জীবনের সঙ্গে যোগ করতে পারা যায় না। এমন করে মহার্ঘ ধন হাতে পেয়ে হারানোর দুঃখ সে যে বড় বেশী করে হারানো; না-পাওয়ার চেয়ে সে-বেদনা যে সারাক্ষণ নিজেকে জীর্ণ করে। রীতা যদি শাসনের ভয়ে তার অন্তরের সম্পদ নষ্ট করে দেয়, তা হবে তার অপমৃত্যু। এ জীবন আবার কি সে পাবে? এত বড় ভুল তুমি ক'রো না রীতা! জয়নাথকে তুমি যদি বোঝাতে না পার তবে তোমাকে দোষ দেব না। সে-দোষ তার নিজের দুর্বলতার। তুমি নিজেকে বিধর্মী ক'রো না; জীবনের সত্যকে রেখে চল, পথ তোমার আপনি তুমি পাবে। বাধার বাঁধনে নিজেকে হত্যা ক'রো না। অধর্মকে, ক্ষুদ্রতাকে ধর্ম বলে মেনে নেবার মত এত বড় ভুল তুমি ক'রো না। রমেনের প্রতি ভালবাসা বাধার ভয়ে তুমি চেপে মেরো না। তাতে নিজেই তুমি মরবে। রক্তমাংসের মানুষ যদি বাঁশখড়ের বাঁধা পুতুল হয়ে ওঠে, তাকে শ্রদ্ধা

জানাব কিসের গুণে? রীতা, তোমাকে শ্রদ্ধা করি—তোমার ধর্মপালনের অন্তরের শক্তি দেখে। তুমি জীবন্ত, জয়নাথ দুর্বল মরণোন্মুখ। তাকে তোমার জীবনের রসে সজীব করে তোল; সে বাঁচুক। তার অন্তরের কৃপণতা তোমার হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে দূর করে দাও। রমেনের জীবনে তুমি যে সুধা দান করেছ, সে যেন তাতে ধন্য হতে পারে। তুমি কল্যাণীরূপে জেগে থাক। তোমার যাত্রা সফল হ'ক, জীবন সার্থক হ'ক। শুভ যেন তার স্বাভাবিক উদারতা নিয়ে তোমার জীবনে আবির্ভূত হয়। তোমার দীনতা দূর কর, ক্ষুদ্রতাকে তুমি স্বীকার ক'রো না। ব'লো না সংসারের শান্তির জন্য, পরিবারের শান্তির জন্য নিজেকে বলি দিলে তুমি। এ আত্মবলিদানে সংসার, পরিবার বা ব্যক্তির কারও কল্যাণ হয় না। অপমৃত্যু ঘটাতে সাহায্য তাদের ক'রো না তুমি। নিজে বাঁচ; তোমার জীবনের রসধারায় ওদের বাঁচাও। দুর্বলকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের মরণকে এগিয়ে এনো না। তাদের তুমি বাঁচাও, মরণের দিকে ঠেলে দিও না। ক্ষুদ্রতা, দীনতা, কৃপণতা জীবনের মৃত্যু; তোমার ভালবাসার শক্তিতে সে-দৈন্য সে-মালিন্য দূর করে তাদের তুমি বাঁচাও। বার বার এই কথাই বলছি। অন্তরের সত্য হ'ক!

উজ্জ্বলা সেন

দেবব্রত চক্রবর্তী, এম. বি., বি.এস. *

[নিজ নিজ চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও বিচারলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ জীবনে চলে। এক প্রকার মানসিক রোগী তাহার নিজের বিশেষ কোনও চিন্তাকে সুষ্ঠুরূপে বিচার না করিয়াই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সেই বিশ্বাসেই তাহার জীবনের মূল গতি প্রবাহিত হয়। অনেক সময় এই প্রকারের বিশ্বাস মনে স্থির থাকে না। সময় সময় কোনও বিশেষ প্রতিবেশের মধ্যে অপর এক বাসনা বা বিশ্বাসের সহিত সংঘাতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নির্জ্ঞান মনে অবদমিত বাসনার আংশিক ও স্বল্পমার্জিত প্রকাশের উদাহরণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত গল্পে লেখক এই প্রকার মানসিক অবস্থার সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।]

সামনের কটি দাঁত বাইরের দিকে পা ছুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোল গোল, ছোটো ছোটো দুটি চোখ। স্বাস্থ্য বলতে আঠা-দিয়ে-জোড়া কতকগুলো হাড়। বি.এ পাশ, চাকুরে—একশোবার; তাই বলে দাদারা এই মেয়ে খুঁজে বার করেছেন!

মেয়ে দেখতে এসেছে অলোক। সঙ্গে কজন বন্ধু। তারা অনেক আগেই চুপ করে গেছে। অলোকের কিছু বলা দরকার—না হলে অভদ্রতা করা হবে। দেখুন, আমাদের খোলাখুলি কথা বলা ভাল। "আমি রাজনীতি করি, বছরের অর্ধেক দিন বাইরে বাইরেই কাটে, আয়ের দিকটাও যৎসামান্য। বিয়ে-ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন।"

দাঁত ঢেকে হাসলে উজ্জ্বলা। মেয়ে দেখতে এসে পাত্রের নিজের গুণপনা আর বিয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে এমন আলোচনা কজন শুনেছে!

তবু উজ্জ্বলা অপ্রতিভ হবে না। ও ধরে ফেলেছে অলোক কী বলতে চায়। পছন্দ হচ্ছে না, তাই কাটিয়ে যাবার চেষ্টা। ওকে দেখে পছন্দ না-হওয়াটা নতুন নয়; কিন্তু মজা লাগছে অলোকের নতুন টেকনিক দেখে। "তাইতো, ভাবিয়ে তুললেন, এ কথাটা তো একেবারে মনে হয় নি। আচ্ছা ভেবে দেখি, পরে আপনাকে জানাব।"

অলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 'পরে জানাবার' ভারটা উজ্জ্বলা নিজেই নিয়েছে।

*　　*　　*　　*

স্কুল থেকে ফিরছে অলোক। মোড় থেকে বাঁক নিতেই উজ্জ্বলার সঙ্গে দেখা। খুব একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হ'ল না অলোকের।

"শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আমি জানি আমার বিয়ে হবে না, হতে পারে না। তবু বার বার অপমানের হাত থেকে আমাকে বাঁচান আপনি।"

অলোক ঘামছে। বিয়ে হ'তে পারে না এমন জ্ঞান আছে, তবু বাঁচাতে হবে—এ কী রকম

* লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক।

ন্যাকামি! সারাদিন খাটুনির পর অসহ্য মনে হ'ল অলোকের। "তা হ'লে আমাকে কী করতে হবে ব'লে দিন" ?

উজ্জ্বলা হাসল। মুখখানা আরও কুৎসিত দেখাল। "এমন কিছু নয়, মাঝে মাঝে আপনাকে ঠিকানা জানিয়ে দেব। আপনি সেই ঠিকানায় লিখবেন—উজ্জ্বলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, আপনারা অন্যখানে চেষ্টা করুন"।

"চমৎকার! মিস সেন। সুন্দর বন্দোবস্ত! ভগবান আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু আমি আপনাকে আরও বুদ্ধিমতী দেখতে চাই। আপনি নিজেও তো জানিয়ে দিতে পারেন, কিংবা বেনামীতে লিখতে পারেন।"

"তা পারি, কিন্তু ধরা পড়লে আমার ওপর অত্যাচার বাড়বে। আপনার নিজের নাম থাকবে না। এক একবার এক এক নামে দেবেন। কোনও ঠিকানা দেবার দরকার নেই। আপনার চিঠি ধরা পড়লে মুখ কালো ক'রে বলতে হবে—কোনও শয়তান আমাদের পেছনে লেগেছে।"

অলোক মাথা নাড়ল—"ঠিক আছে, চেষ্টা করব"।

* * * *

উজ্জ্বলা একটা ঠিকানা পাঠিয়েছে। অলোকের কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চয়ই অন্যায় এটা। উজ্জ্বলার বাবা চেষ্টা করছেন মেয়েটাকে পার করবার জন্যে, আর অলোক বাগড়া দেবে —না এ হ'তে পারে না। হঠাৎ সেই কুৎসিত মেয়েটা সামনে এল। দুর্বল হ'ল অলোক। চিঠি ডাকে দিয়ে এল।

এরপর আরও দুটো ঠিকানা পাঠিয়েছিল উজ্জ্বলা। আলোক ছিঁড়ে ফেলেছে। আর বিরক্ত করে নি মেয়েটি।

* * * *

অলোক গুপ্ত এখন মিঃ এ. গুপ্ত। বেয়ারা জানালে একটি মহিলা দেখা করতে চান।

একটু মোটা হয়েছে আগের চেয়ে, দেখতেও কম খারাপ লাগছে, বিয়ে হ'য়ে গেছে উজ্জ্বলার— একবারে অনেকগুলো নতুন জিনিস দেখলে অলোক। উজ্জ্বলার ভুরুটা একটু কুঁচকে উঠেই আবার ঠিক হ'য়ে গেল। "আপনিই মিঃ এ. গুপ্ত তা ভাবতে পারি নি। যাই হ'ক ষ্টেনোর চাকরিটা আমার দরকার; আপনার পক্ষে অসম্ভব না হলে আমার জন্যে একটু দেখবেন"।

আজ ভাল লাগছে উজ্জ্বলাকে। সেদিনের মতই এতটুকু কুণ্ঠা নেই; কত স্পষ্ট ক'রে বলে গেল নিজের প্রয়োজনটাকে।

একটা লোভ। একটা প্রশ্ন করবার লোভ সামলাতে পারলে না অলোক। "আপনার স্বামী কি করেন" ?

"ব্যবসা করেন, আয় ভালই। তবু আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না অলোকবাবু"।

এরপর আর বলার কিছু নেই।

"আচ্ছা দেখা যাক কি করতে পারি"। উজ্জ্বলা নমস্কার করে চলে গেল।

অলোক ইচ্ছে করলে ষ্টেনোর কাজটা পেয়ে যাবে উজ্জ্বলা; কিন্তু তা হয় না।

ওকে অন্য কোথাও জোগাড় করে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যায় মিঃ সুদকে একবার ফোন করে দেখা যাক।

*　　*　　*　　*

গৌরবাবু এসেছেন। উজ্জ্বলার স্বামী। সর্বাঙ্গে সংগতির ছাপ। আপনি উজ্জ্বলাকে চাকরির ব্যাপারে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু ও তো চাকরি করতে পারবে না।

"কী হ'ল ওঁর" ?

"চাকরির কোনও প্রয়োজন নেই, শুধু আমাকে ভোগাবে"।

"সে কি" ?

"মশাই, পড়াশুনো করি নি; টাকাপয়সা গুনতে গুনতে বয়েসের আওয়াজ শুনতে পেলাম। রূপের দিকে যথেষ্ট খামতি থাকলেও, শিক্ষিতা ব'লে বিয়ে ক'রে ফেললাম। এখন খোয়ার দেখুন! প্রথম প্রথম কিছু মনে করি নি। সুটকেস থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বার ক'রে পড়ত। তারপর দেখলাম একবার ক'রে কাগজ বেরুচ্ছে, একবার ঢুকছে। একদিন জিজ্ঞেস করলাম কী আছে ও-কাগজে যে এতবার পড়েও আশ মেটে না। আমাকে শুদ্ধ করে দিয়ে মেলে ধরলে কাগজটা। এই প্রথম মনে হ'ল ওর মাথা খারাপ হয়েছে; না হ'লে এতদিন বাদেও কেউ ও ধরনের কাগজ বার বার পড়ে, না স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি কাগজটা ছিঁড়ে ফেললাম; ও আমার হাত কামড়ে দিল। যাক আপদ তো দূর হ'ল। কিন্তু তা হবার নয়। কথাগুলো আর একটা কাগজে লিখে নিয়েছে; আর থেকে থেকে বার করে পড়ছে: 'অলোক গুপ্তের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, আপনারা অন্যখানে চেষ্টা করুন। দোহাই আপনাদের, এ সম্বন্ধে আমার বাড়ীতে কিছু জানাবেন না'। আমি রেগে বলেছিলাম, এখন থেকে তুমি এ বাড়ীতে থাকবে, খাবে, তার বেশী কিছু আশা ক'র না। তারপরই বোধহয় চাকরির খোঁজে আপনার কাছে এসেছিল"।

অলোক আশ্চর্য হ'ল। ভেবেছিল উজ্জ্বলার 'হ'তে-পারত' শ্বশুরকে লেখা ওর চিঠিখানাই উজ্জ্বলার হাতে এসেছে—আর সেটা দেখবার লোভেই ও বারবার পড়ত। প্রথম বারের পরের ঠিকানাগুলোও কি উজ্জ্বলাই নিজে এইভাবে লিখে পাঠাত? অলোক গুপ্ত ছাড়া কি নাম পেল না উজ্জ্বলা? না কি ওর নাম লিখে তৃপ্তি পেত ঐ মারখাওয়া মেয়েটা? নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল। পরের ঠিকানা-গুলোতেও এক একটা নামে ওরকম চিঠি দিলে কী এমন ক্ষতি হ'ত। হ'ত, অনেক ক্ষতি হ'ত। এমন কুরূপা মেয়ের বিয়েই হ'ত না সারাজীবন। অলোকের কোনও ভুল হয় নি। যাক, ভগবান বাঁচিয়েছেন! গৌরবাবু মিঃ এ. গুপ্তকে চেনেন, অলোক গুপ্তকে চেনেন না।

এইমাত্র ফিরলেন গৌরবাবু। হাত পা ধুয়ে, গামছা দিয়ে মুছে, সেই গামছাখানাকেই কাঁধে ফেলে খাতা নিয়ে বসবেন। অনেক লাভের অঙ্ক লেখা খাতা। ঐ খাতা ছাড়া গৌরবাবুকে কত অসহায় দেখায়।

হাসি পায় উজ্জ্বলার।

কে কড়া নাড়ছে। গৌরবাবু উঠেছেন। পিছনে পিছনে একটা মানুষ আসছে। চেনা চেনা। অলোক গুপ্ত—মিঃ এ. গুপ্ত এসেছেন। উজ্জ্বলার শরীরে একটা কাঁপুনি এল। লোকটা নতুন নয়। কিছু-দিন আগেও ওর সঙ্গে কথা বলে এসেছে। কিন্তু গৌরবাবুর সঙ্গে এই প্রথম দেখছে। ভীষণ একটা ভয়ের মানুষ উজ্জ্বলাকে ধরতে আসছে। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায়; কিন্তু এতটুকু শক্তি নেই ওর শরীরে। থর থর ক'রে কাঁপছে। চোখ ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। বিরাট একটা চীৎকার গলায় এসে আটকে আছে। একটা গোঙানির মত শব্দ বেরুল—না, না, না। দুহাতে জাপটে ধরেছে গৌরবাবুকে।

রামধনু

নবেন্দু কেশরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[মনের বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতি লেখক নিজের ভাষায় গাঁথিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। লেখকের নানান রসের, নানান বর্ণের সংক্ষিপ্ত এই লেখাগুলির "রামধনু" নামকরণ সার্থক হইয়াছে। মনের বহুল ভাবের পরিচয় এই লেখাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া ইহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হইতেছে।]

৫১

ফাল্গুন পূর্ণিমা রাতে
নেমে এলো বৈশাখীর ঝড়
বাণী তার অমিত অমোঘ।
নির্দয় আঘাতে আলোকের
শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত করি দিল।
মূক করি দিল ধরণীর অন্তরের
সকল মিনতি। দীপ নিভে গেল।
হে প্রবল, হেনেছ আঘাত
লোপ ক'রে দিলে শান্তির সান্ত্বনা
মুছে নিলে অন্তরের-আকিঞ্চন
ছিন্ন করে দিলে বাহুর বন্ধন।
চেয়েছি যা একান্ত আগ্রহে
তব দীপ্ত হাতে তুমি তারে
কেড়ে নিলে দূরে, চিরতরে।
পূর্ণতার স্পর্শ লাগি খুলেছিনু দ্বার
রুদ্ধ করি দিলে তারে তুমি।
মোর পরিচয়ে ঘেরা পৃথিবীর কায়া,
ছায়াতে মিলালো ঝটিতে ক্ষণিকে।
নিজেরে চেনালে তুমি তব সত্য রূপে।
এই ভাল, চিনেছি তোমারে।

৫২

ঘরের পাশে একটি গোলাপ গাছ কবে যত্ন করে এনে লাগিয়েছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। প্রথম ফুল ফুটল, আমার হৃদয়ের আগল যেন খুলে দিল। আবেগে উৎসাহে কতবার সে-ফুল দেখেছি, তার সৌরভ ভোগ করেছি। একদিন সে-ফুল ঝরেও পড়েছে। আমার একটু ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল কিনা আজ তা মনে নেই। এখনও দেখি মাঝে মাঝে ফুল ফোটে, কখনও চেয়ে দেখি, বিস্ময়

জাগে—কত কথা ভাবি। আবার কোনদিন সে-ফুল ফোটে একটা সাধারণ যেন নিয়মে বাঁধা প্রাত্যহিক ঘটনার মত ; মনে কোনও দাগ কাটে না। গাছে ফুল ফুটেছে তো ফুটেছে ; আমার তাতে কিছুই যেন নয়। গাছে ফুল-ফোটা ব্যাপারটা আসলে বিশেষও নয়, অবিশেষও নয় ; আমার মনের দাম দিয়ে তার দাম। সব সম্বন্ধই যে তাই, এ কথাটা মনে থাকে না। হয়তো মনে রাখতে চাই না। নিজেকে ভোলাতেই ভালবাসি।

৫৩

কখনও বলি দয়া কর, কখনও বলি মার্জনা কর। আবার কখনও বলি তোমার ইচ্ছা পুর্ণ কর। তোমাকে স্বীকার করি বলেই যে এ কথা বলি তা নয়। তোমাকে প্রবল বলে মানি, সেই সঙ্গে তোমার শক্তিতে আমাকে তুমি পীড়িত ক'রো না এই মিনতি জানাতে চাই। যা অবশ্যম্ভাবি তাকেও সোজাসুজি সহ্য করতে ভয় করে বলেই নিজে থেকে চেয়ে নিয়ে তাকে সহনীয় করে তুলতে চাই, তাই তোমাকে বলি পুর্ণ কর তোমার ইচ্ছা। যেন এই চাইলাম বলেই তুমি কিছু সন্তুষ্ট হয়ে কম করে দুঃখ দেবে মনে আমার, এই ইচ্ছাই গোপন থাকে।

৫৪

যখন বলি দুঃখ দাও তখন এই আশাই করি যে সে-দুঃখের দিন কেটে গিয়ে সুখের দিন আসবে।

৫৫

ভাল লাগা, ভালবাসা, ভাল হওয়া কোনটা যে চাই তাই জানি না।

৫৬

মাথার উপরে এত বিস্তৃত মহাকাশ, অগণিত তারা ; সব মিলে যে বিরাট, কেমন এক অসীমতা সর্বদাই রয়েছে এ কথাটা মনেই হয় না।

৫৭

অতি বড়র সান্নিধ্যে মন আপনা থেকেই বিনয়ানত হয়ে আসে।

৫৮

ঔদ্ধত্য দুর্বলের বিকৃত প্রকাশ।

৫৯

মনে মনে আমি শ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান, বাইরে সে-কথা বলতে লজ্জা পাই।

৬০

নিজের মূল্যটা প্রকাশ করতেই আয়ু ফুরিয়ে যায়। পুঁজির পাত্র শূন্যই থেকে যায়।

৬১

মন যখন আত্মদানের জন্য উন্মুখ হয়ে বিলিয়ে দিতে এগিয়ে গেল, তুমি তাকে বাঁধা পড়ার নতুন ফাঁদ মনে করে ভয়ে দূরে সরে গেলে।

৬২

এমন ক্ষণ আসে যখন সব কথা লোপ পেয়ে যায়; মন মূক হয়ে যায়। সে-অবস্থা কখনও আসে শূন্যতায়, কখনও আসে পূর্ণতায়।

৬৩

দিনে দিনে যে-সাজি মানুষ ভ'রে তোলে, কবে কখন সে-ফুল শুকিয়ে যায় তা জানতেই পারা যায় না। একদিন জেগে উঠে চেয়ে দেখি সে-সাজি পড়ে আছে—রিক্ত নয়, শুষ্ক ফুলের বিষণ্ণতায় ভ'রে।

৬৪

ভোরের আলোতে দেখি আমারই খুশিতে ভরা নানা রং ছড়িয়ে আছে।

৬৫

শূন্যতাও যে পূর্ণতা এ সহজ কথাটা এত কঠিন হয়ে দেখা দেয় কেন?

৬৬

ধরে রাখতে চাই বলেই হারানোর ভয়। যা যেমন রূপে আসে তাকে গ্রহণ করাতেই শান্তি।

৬৭

ভয় একটা ভ্রান্তি; সত্যকে স্বীকার না করাতে তার প্রতিষ্ঠা।

৬৮

যাকে চিনি বলে মনে করে গর্ব করি, একদিন দেখি তাকে চিনতে পারি নি। গর্ব আমার ভেঙ্গে পড়ে। নিজের সে-দীনতা সইতে পারি না বলেই বেদনার ক্রন্দন বাজে।

৬৯

আপন মনে দুঃখ ভোগ করার মধ্যেও নিজের প্রতি মমতা প্রকাশ করি। নিজেকেই নিজ স্নেহস্পর্শে সান্ত্বনা দিতে থাকি।

৭০

এমন অনুভূতি আছে যা ভোলা যায় না। জীবনের নানাক্ষণে আপনা থেকেই তা ফিরে ফিরে জেগে ওঠে।

৭১

সুখ আপনি আসে। খুঁজলে তাকে পাওয়া যায় না। সুখী হতে পারা চাই।

৭২

আজ যা আমার "ধ্যানের ধন", সময় গেলে তার দিকে হয়তো আর ফিরেও তাকাই না।

৭৩

ক্ষয়ক্ষতি জীবনে ঘটবেই জেনেও তা মেনে নিতে পারে না মানুষ ; তাই দুঃখ তার বাড়ে।

৭৪

যে-ভোগ চাই, সে-ভোগ করবার মত শক্তি আছে কিনা ভেবে দেখি না। সামর্থ্য কম বলেই দুর্বলের লোভই বড়।

৭৫

আশার পিছনে ছুটে একদিন ক্লান্ত মানুষ শ্রান্ত মনে বলে, 'পেলাম না'। বলে ব্যর্থ আমি। ভুলে যায় সব পাওয়াই পাওয়া। মাপে মেলাতে গেলেই তার রূপ বদলে যায়।

৭৬

মানুষ কখনই একা নয়। মনে মনে সে অনেক।

৭৭

মন মোর মুদেছে নয়ন
মূক আজি ভাষার বয়ন।
চেয়ে থেকে কাটিছে সময়
নাহি আশা দ্বিধা ও সংশয়।
শ্রান্তধারা শ্রাবণ সন্ধ্যায়
নেমে আসা আঁখির পাতায়
প্রিয়া তব বিষাদ মিনতি
মোর প্রাণে খুঁজিছে কি সাথী ?
সেই তব নীরব আকৃতি,
ধরি নিল সায়াহ্ন প্রকৃতি
আজি তার গভীর অন্তরে
তবু কারে চাহে বারে বারে।
নাহি জানে কোথা তারে পাবে
কাল যাপে স্তিমিত নীরবে।

৭৮

মোর বসন্ত সুর হারাবে যবে
শুষ্ক রুক্ষ করুণ ধূলিগুলি
রিক্ত পথে হেলায় প'ড়ে রবে।

৭৯

ফাগুন দিনের যতেক প্রতিশ্রুতি
চৈত্রদিনে জাগিয়ে তোলে
বেদন ভরা স্মৃতি।

৮০

তোমার তরে আছে যাহা
আমার তরে নাই
কেমনে তারে পাই।

৮১

ছোট্ট একটি চড়ুই পাখী কোথা থেকে আমার জানালার পাশের হাস্নুহানার ডালে এসে একটু বসল, আবার উড়ে চলে গেল। কেন জানি না মন আমার খুশিতে ভরে উঠল।

৮২

কে সে আমার প্রিয়া,
কার দুয়ারে আসি
বলি 'তোমায় ভালবাসি'।

৮৩

দীর্ঘ তপস্যার পরে যখন অভীষ্ট লাভ হয়, নীরব চাহনিতে অন্তরের মিলনে ডুবে যাওয়া ছাড়া তখনের মনোভাব প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সারা দেহ তখন মূক মুখরতায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

৮৪

নিজের বা অপরের প্রকৃত মূল্য আমরা দিতে পারি না। সর্বক্ষেত্রেই কম বা বেশী মূল্য দিয়ে চলি।

৮৫

যে আমার, তার ভাল বা মন্দ আমাকে সুখ বা দুঃখ দেয়। যে আমার সে আংশিক আমি, তাই এই অনুভূতি।

৮৬

বস্তু সুখ দিতে পারে না, সুখী হবার মত মন চাই।

৮৭

মানসম্মান মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে বিপথগামী করতে সহায়ক হতে পারে। অবস্থা বুঝে চলা কঠিন।

৮৮

লাভে আনন্দ, লোকসানে দুঃখ। এর কোনওটাই প্রকৃত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। আমাদের কামনা-বাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনে ঐ ভাব দেখা দেয়।

৮৯

আমার সততা সাধুতার আড়ালেও আমিটাই উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে

৯০

লোকে বলে একমাত্র ভগবানকে পেলেই মন তৃপ্ত হতে পারে। এ ছাড়া আর কোনও এক বা বহুতে মনের পূর্ণ তৃপ্তি আসে না। কিন্তু সে-ভগবানও কেবল ঐ নামেই এক, গুণে কর্মে তিনি সর্ব অর্থাৎ অন্তহীন, অনেক; যখন যা চাই তখন তাই। যে-এক বহু নয় তাতে তৃপ্তি নেই। মানুষের অন্তহীন চাওয়া মেটাতে হলে সেই অন্তহীন পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে পরম তৃপ্তিবোধ হতে পারে না।

৯১

দুটি ডালে দুটি ফুল হাওয়ায় দুলে দুলে পাশাপাশি কাছে এসে প'ড়ে আবার দূরে সরে সরে যাচ্ছে। চেয়ে দেখে দেখে সময় কেটে যাচ্ছে। কী অব্যক্ত বোধ যেন ধরা দিতে এসে কোথায় মিলিয়ে যায়।

৯২

ছোটখাটো কথায়, ব্যবহারে, কাজে, নিজের অজান্তে মনের গোপন ভাব কতখানি যে প্রকাশ পেয়ে যায় মানুষ তা বুঝতেই পারে না।

৯৩

জীবনে এককতাই সত্য। মিলনের বহু প্রচেষ্টা এই সত্যতাকে ঢাকতে গিয়ে তাকে স্পষ্ট করে তোলে।

৯৪

যাকে একান্ত ভালবাসি সে যখন আমার ভালবাসা বিশ্বাস করে না, নিজেকে তখন একান্ত অসহায়, মূল্যহীন মনে হয়।

৯৫

অপরের কাছে নিজের দাম চাওয়ার ভিক্ষাবৃত্তি আমার শেষ হবে কবে?

৯৬

তুমি যা দিয়েছ মোরে
অমূল্য সে দান,
হোক সে অমৃত কিংবা
হোক অপমান।

৯৭

ভালবাসার বাহুবেষ্টনে প্রিয়কে যখন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে, অন্তরের গভীরে তখনও স্বার্থপরতা, অহংকারের কালনাগ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

৯৮

শুধু অর্ধেক প্রহর তুমি
　　এসেছিলে মোর জীবনে,
চিরদিনের স্বপ্ন তাহা
　　রইল গাঁথা যতনে।

৯৯

নানা কাজের পাকে সারাদিন ঘুরে বেড়াই, মন তবু অবিরাম কী মন্ত্র জপ করে চলেছে।

১০০

বাইরে যা ব্যবধানের অন্তরায়ে দূর, অন্তরে তা মিলনে পূর্ণ।

১০১

গর্বে তুমি হেলায় অপমানে
　দূরে ঠেলে দিলে
　এঁকে দিয়ে ভালে
　　গভীর পরাজয়,
পথে পথে ফিরি একা আনমনে
　গাঁথিলাম তারে
　একতারা সুরে
　　আমারি হল জয়।

১০২

দিনের আলো যখন ম্লান হয়ে আসে, মনে আপনা হতেই বিষাদের ছায়া নামে। এ কি প্রিয়-বিচ্ছেদের বেদনা ? নিজের বিদায়ের বেদনা কি ?

১০৩

মেঘে-ঢাকা অন্ধ কালো রাত্রিতে একা বসে বসে এই পৃথিবী ছেড়ে যেন কোথায় চলে যাই ; দিশাহারা, পরিচয়হীন সে তামসলোকে নিজেকে হারিয়ে কেবল চেতন মাত্র বেঁচে থাকে।

১০৪

নিশ্চিত বলে চাওয়া ভুল।

১০৫

মোরে ভুল করে তুমি ভালবেসেছিলে
　　আজিকে তোমার ভেঙ্গেছে ভুল।

জানি তুমি পুনঃ বাঁধিবে কবরী
পলাশ মুকুলে পরিবে দুল।
সন্ধ্যাতারার কাল হলে গত
আঁধারে সে হয় নীরবে হারা।
নবপ্রভাতের নব সূচনায়,
প্রেমভরে জাগে সে শুকতারা।

১০৬

রেগে গিয়ে যে শিশু-সন্তানকে প্রহার করে, আবার স্নেহ ক'রে বুকে টেনে যে আদর করে সে কি একই মা?

১০৭

নিজের দোষত্রুটী অপরের মধ্যে দেখতে পেলে, কখনও মানুষ খুশী হয় কখনও বা রুষ্ট হয়।

১০৮

একদিনের বরেণ্য অন্যদিনে নগণ্য হয়ে যেতে পারে; এ কথা মনে রাখবার দরকার আছে।

১০৯

গোধূলির পারে দেখা দিলে তুমি
ওগো সন্ধ্যার তারা।
বুলালে তাদেরে শান্তিপরশ
তপ্ত তৃষিত যারা।

১১০

কণ্ঠে আমার দিয়েছিলে সুর
ওগো সাথী ওগো প্রিয়,
সে সঙ্গীত যবে হয়ে যাবে হারা
শুধু মাধুরিমা রেখে দিও।
আজ যাহা আছে রবে না যে তাহা
জানি আমি তাহা জানি,
তবু তা আমার ছিল একদিন
সে মহাগৌরব মানি।
দূরে আঁখি মেলি পাঠাব সেদিন
মোর মূক গান প্রিয়,
দিগন্তে বসি স্মৃতির স্মরণে
বক্ষে তুলিয়া নিও।

"সমীক্ষার পরীক্ষা"

হিরণ্ময় ঘোষাল

গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবপদ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর "সমীক্ষার পরীক্ষা" প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ সন্দেহ যে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতালব্ধ বা প্রায়োগিক (emperical) জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। একমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপরই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমীচীন পরীক্ষা চলতে পারে, কিন্তু শিবপদ বাবু তাঁর সমালোচনা সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে করবার চেষ্টা করেছেন; এবং দুঃখের বিষয় তাতেও তিনি বিষয় প্রতিন্যাস (objective attitude) রাখতে পারেন নি। এমন অনেক জিনিসই মনঃসমীক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন যা কোনও দিনই তাঁরা বলেন না।

তাঁর সমস্ত আলোচনার মূল উপাদান হ'ল—"উৎসাহী ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শোনা যায় যে ফ্রয়েডের মতবাদ নাকি কোনওদিনই ভুল হ'তে পারে না, কোনও তথ্য বা ঘটনাই তাকে কখনও অসমর্থিত করতে পারবে না; কেবলমাত্র ঐ মতবাদের বিস্তার ও পরিমার্জনা হতে পারে।" এ ধারণা যে উনি কি করে বা কোথা থেকে পেলেন সে-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই নেই। উৎসাহী ফ্রয়েডপন্থী বলতে তিনি কাকে বোঝাতে চেয়েছেন তারও কোনও ইঙ্গিত দেন নি। কোনও "উৎসাহী" পদার্থবিদ বা রসায়নবিদের বক্তব্য নিয়ে তিনি কি সম্পূর্ণ পদার্থবিদ্যা কি রসায়নবিদ্যার সমালোচনা করা সংগত মনে করবেন? কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় এ প্রকার উক্তির স্থান হয় না। এটা নিতান্ত যেন শিবপদ বাবুর একটা ব্যক্তিগত অভিযোগ ব'লে মনে হয়। কোনও মনঃসমীক্ষক এ রকম কথা বলেছেন বলে তো আমার জানা নেই। ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষকগণের লেখায় বরং যথেষ্ট বিনীত ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের কথায় "Psycho-analysis is not like philosophies, a system starting out from a few sharply defined basic concepts, seeking to grasp the whole universe with the help of these and, once it is completed, having no room for fresh discoveries or better understanding. On the contrary, it keeps close to the facts in its field of study, seeks to solve the immediate problems of observation, gropes its way forward by the help of experience, is *always incomplete* and always ready to correct or modify its theories."।[১]

দ্বিতীয় যে-বিষয়টার উপর শিবপদ বাবু খুব জোর দিয়েছেন তা হ'ল এই যে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো মনঃসমীক্ষণকেও তার প্রকল্প ও সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে অপ্রমাণিত হবার ঝুঁকি নিতে হবে এবং কি কি অবস্থার উদ্ভব হ'লে তা হতে পারে সেটা প্রথমেই পরিষ্কার করে বলতে হবে। নিউটন কি তাঁর মহাকর্ষ ও গতিসূত্র (gravitation and the law of motion) প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে কি কি ঘটলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এ কথা (শিবপদ বাবু যেভাবে দাবি করছেন) বলে গিয়েছিলেন? যে

১। *Collected Papers*, vol. I, page 129.

কোনও বিজ্ঞানে এটা ধরেই নেওয়া হয় যে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন তথ্য ও নতুন ঘটনার দৃষ্টিতে পুর্বতন মতবাদের সংশোধন, এমন কি আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। বস্তুতঃ, বহু বৈজ্ঞানিক নিজের জীবিতকালেই নিজেই তাঁর পুর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন করেন। ফ্রয়েডের জীবনেও তাই দেখা যায়। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁর মূল সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পগুলির পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি; কি তাঁর পর অন্য কোনও মনঃসমীক্ষকের অভিজ্ঞতাতেও এখনও পর্যন্ত সে-প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

শিবপদ বাবু বলছেন যে, "পরন্তু নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও প্রকল্প পুর্বতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের চিতার উপরই গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে যে-মত আজ অভ্রান্ত বলে মানি, কালই তাকে কবরে দেবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানীরাই করে থাকেন"। এ কথা কিছুটা সত্যও বটে, আবার কিছুটা ভ্রান্তও। বিজ্ঞানী কোনও কিছুকেই চূড়ান্ত সত্য বা অভ্রান্ত জ্ঞান বলে মানেন না; তাঁর কাজই হ'ল বাস্তবকে দেখা এবং এ 'দেখা'-র পথে কোনও অন্তরালকেই তিনি দাঁড়াতে দেন না—তা সে পুর্বতনও কোনও মনীষীর মতবাদই হউক কি নিজস্থষ্ট কোনও সিদ্ধান্তই হউক। কিন্তু এ সত্বেও জাগতিক তথ্য ও ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ এবং সত্যের অন্বেষণে ক্রমে যে আজ এক বিরাট বৈজ্ঞানিক তন্ত্র (system) গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এক মৌলিক সমতান বা ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যে সব যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটেছে তার মধ্যে এক ঐকতান (harmony) বর্তমান আছে; কোনওটাই (এখনও পর্যন্ত) সম্পূর্ণভাবে কবরস্থিত হতে দেখা যায় নি। পদার্থবিদ্যার উদাহরণই নেওয়া থাক, যেখানে বহু বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। অনেকেই মনে করেন যে নিউটনের পর আইনস্টাইন এসে পদার্থবিদ্যার ভিত্তি আমূল পাল্‌টে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি আইনস্টাইন নিউটনের চিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? আইনস্টাইন নিজে এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা পড়লেই এ ভ্রম দূর হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন "Nevertheless, the thinking of physicists to-day is conditioned to a high degree by Newton's fundamental conceptions. It has so far not been possible to substitute for the Newtonian unified conception of the universe a similarly unified comprehensive conception. But what we have gained up till now would have been impossible without Newton's clear system"।[২] বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কারগুলি ভূরি ভূরি মিথ্যে বা নিত্য অসত্য প্রমাণিত হয় না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বীয় অবয়ব এবং সত্যজ্ঞান যদি এতই ভঙ্গুর হ'ত, তা হ'লে মানুষের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠত। প্রতি পদে পদেই সন্দেহ, অস্থিরতা ও অনিশ্চিতের পীড়া মানুষকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মনোবিদ্যা, বিশেষ ক'রে মনঃসমীক্ষণ কি বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পাবার যোগ্য? প্রকৃতপক্ষে শিবপদ বাবু তাঁর প্রবন্ধে প্রায় এই উক্তিই করেছেন। এ প্রশ্ন ওঠার পিছনে নানান কারণের মধ্যে একটি মূল কারণ হ'ল এই যে বিজ্ঞানকে অনেক সময় আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রযুক্তিবিদ্যা বা যন্ত্রবিজ্ঞানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। বিজ্ঞানের অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করা। প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধেই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব এবং

২। *Out of My Later Years*, page 222.

বিষয়ানুযায়ী জ্ঞানার্জনের পথের মধ্যে প্রকারভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্নভাবে উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষণ ইত্যাদি করা হয়। যে কোনও রীতিবদ্ধ (systematic) জ্ঞানই যার দ্বারা সাধারণ মূল সত্য সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায়, তাই বিজ্ঞান। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে উপনিষদ বিজ্ঞানের সারাংশ ("quintessence of science")। এ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেন "The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking"।[৩] দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানকে এ ভাবে দেখবার চেষ্টা আজও বিরল। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন আজ সমাজে সমাদৃত এ কারণে নয় যে, মানুষ আগের চেয়ে এখন অধিকতর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়েছে। বরং এ দুই বিদ্যার বর্তমান বিস্ময়কর প্রয়োগে, সাধারণ মানুষ "হতবাক ও বিভ্রান্ত" (যেমন শিবপদ বাবু নিজেই বলেছেন) হয়ে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যা বা তার নানান রকমের কারিগরি ব্যাপারকে ভয়ভক্তি করছে। এটা শক্তির উপাসনার নামান্তর মাত্র। এতে এবং আদিম মানুষের বা শিশুর "ম্যাজিক"-এর প্রতি যে মনোভাব তাতে কোনও তফাত নেই বললেই চলে।

মনঃসমীক্ষণ বা স্তরীয় মনোবিদ্যা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদির মতোই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু অন্য রকমের। অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রতি মানুষ স্বভাবতঃই নম্র; সেখানে চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণও সহজে কিছু বিচার করবার বা মন্তব্য করবার চেষ্টা করেন না। এটা ধরেই নেওয়া হয় যে বিশেষ বিদ্যার জ্ঞান ও সেই সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন নয়। একমাত্র মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এ যুক্তি বর্জিত হয়। এখানে প্রায় সকলেই মনে করেন যে এ বিষয়ে অনুশীলন বা চর্চা না করেও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা অনুচিত হবে না। তাই তাঁরা ধরেই নেন যে মন বলতে শুধু চেতনা ও সংজ্ঞানকেই (conscious) বোঝায়; আর মনের সংজ্ঞাত চেষ্টিত বা ব্যবহারের (conscious behaviour) মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যখন মনঃসমীক্ষণ "নির্জ্ঞান" (the unconscious)-র প্রকল্প গঠন করে, এঁরা ঔদ্ধত্য সহকারে বলে ওঠেন এ আবার কি আজগবী জিনিস।

মনঃসমীক্ষণের প্রধানতম প্রকল্প "নির্জ্ঞান" কিছুই রহস্যকর ব্যাপার নয়। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা অনেক সময়ই, মনঃসমীক্ষণ কিছু না জেনেও, সংজ্ঞানের বাইরেও যে একটা মানসিক অবস্থা আছে তা অনুমান করে নি। "এটা আমার অজান্তে হয়ে গেছে"; "ইচ্ছে করে করি নি—দোষ নেবেন না"; "ভেবেছিলাম বুঝিয়ে বলব, কথাবার্তা আরম্ভও করেছিলাম ভালভাবে কিন্তু সামলাতে পারলাম না—কোথা থেকে যেন প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা এসে মন জুড়ে বসল"; "ছি ছি একি করলাম! কোনওদিন যা কল্পনা করতে পারি নি—সামান্য কিছু টাকার লোভে এত বড় একটা মিথ্যে বললাম"; "ওকি আর নিজে করেছে—ওর মাথায় কিসে যেন ভর করেছে"। এ প্রকার বহু দৈনন্দিন উক্তির মধ্যে অন্য এক মনের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। এ সব বলার মধ্যে মানুষ যেন বোঝাতে চায় যে সে যা অন্যায় বা লজ্জাকর কাজ করেছে তা তার সংজ্ঞাত ইচ্ছা প্রণোদিত নয়। তা হ'লে এ রকম ইচ্ছে, মানুষের অজ্ঞাতসারে, কোথা থেকে আসে?

৩। "Physics and Reality", *The Journal of the Franklin Institute*, vol. 221, no. 3, March 1936.

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখি এবং জানি যে এ চিন্তাধারা ও জাগ্রদবস্থার চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে শৃঙ্খলা মানসবৃত্তিতে থাকে স্বপ্নে তা নষ্ট হয়ে যায়। স্বপ্নে নানারূপ অদ্ভুত চিন্তা ও দৃশ্য মনোমধ্যে উদিত হয়। শোক দুঃখ, সুখ আনন্দ, ক্রোধ ভয় ইত্যাদি প্রায় সব রকম মনোভাবই স্বপ্নে পাওয়া যায়; কিন্তু নিতান্ত অসংগত রূপে এগুলি দেখা দেয় যা আপাতদৃষ্টিতে সংজ্ঞান মনের কাছে রহস্যজনক। স্বপ্নে সাপ দেখলাম, কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা তার গায়ে হাত বুলতে আরম্ভ করলাম, আদর করলাম, এমন কি মুখে ঢুকিয়ে নিলাম—চাটতে লাগলাম। অন্যদিকে কোনও খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখে ভয় করতে লাগল। আবার এমন স্বপ্নও দেখি যাতে ভাবের অসংগতি হয়তো থাকে না কিন্তু যেখানে বাস্তবজীবনের ইচ্ছা বা চিন্তার সঙ্গে কোনও মিলই দেখা যায় না। যেমন দেখলাম, আমি মরে গিয়েছি বা কোনও প্রিয়জন মারা গেছে। এ ধরনের স্বপ্নে অনেক সময়েই ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সমস্ত জিনিসটাই তখন অদ্ভুত ঠেকে। জাগ্রত মন ভাবতে আরম্ভ করে এ কী করে সম্ভব হ'ল? ঘুমন্ত মনে এ প্রকার অদ্ভুত, আজগবী, অবাস্তব মনশ্চিত্র (phantasy) কেমন করে সম্ভব হয়? স্বপ্নতত্ত্ব জানবার জন্য মানুষ চিরদিনই উৎসুক এবং স্বপ্নের যে কিছু একটা অর্থ আছে তা সে চিরদিনই মোটামুটিভাবে অনুমান করে চলেছে।

ফ্রয়েডের মনীষা সাধারণ বুদ্ধি (common sense) প্রসূত এই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য ধরতে পেরে একে বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়। জোসেফ ব্রয়ারের সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর বিরেচন (cathartic) ও সংবেশন (hypnosis) পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে গিয়ে ও পরে স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ফ্রয়েডের মনে নির্জ্ঞান প্রকল্পের উদয় হয়। তা থেকেই প্রায় আকস্মিকভাবে খুলে গেল মনোবিদ্যায় এক বিরাট বিস্তীর্ণ নতুন গবেষণার ক্ষেত্র। যাঁরা অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে দ্বিধা বোধ করেন, তাঁদের কাছে কোনও ব্যক্তিকে সংবিষ্ট (hypnotise) করে প্রায়োগিক (experimental) পদ্ধতিতে অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় যে 'নির্জ্ঞান'-র প্রকল্প খুবই সংগত এবং চেতনা বা সংবিৎ মানসিক ক্রিয়ার (mental activity) অপরিহার্য অংশ (indispensable condition) নয়। সংজ্ঞান কি সচেতনতা মানস-জীবনের একটা গুণ বা ধর্ম (quality) মাত্র এবং তাও এমন এক গুণ যা খুব সুস্থিত (stable) বলা যায় না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে ফ্রয়েডের কাছে সংজ্ঞানের মূল্য কম। বরং মনঃসমীক্ষণের চেষ্টাই হ'ল তমসাচ্ছন্ন নির্জ্ঞানকে যতটা সম্ভব নাড়া দিয়ে নির্জ্ঞানস্থ প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলিকে (primary mental processes) সংজ্ঞানের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা।

মানুষের বহুপ্রকারের চেষ্টিত (behaviour) ও আচরণের উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে যুগে যুগে বহু কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিককেও সচেতন মনের বাইরে একটা কিছু কল্পনা ক'রে নিতে হয়েছে। এরিস্টটল্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্য ('unconscious purpose')-এর কথা উল্লেখ করেছেন।[৪] জার্মান দার্শনিক থিয়োডর লিপ্স্ (Theodor Lips) বলেন যে মানস আদত নির্জ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জীববিৎ ও শারীরতত্ত্ববিৎ স্যার চার্লস শেরিংটন (Sir Charles Sherington)-ও নির্জ্ঞান জাতীয় একটি অবচেতন মনের প্রয়োজন বোধ করেছেন। তিনি বলেন, "There would seem therefore

৪ Sherington, Sir Charles. *Man on his nature*, Pelican Edition, 1955 p. 250.

to be a grade or grades of mind which we do not experience, as well as the mind which is our mental experience"... .."It is as though our mind were a pool of which the movements on the surface only are what we experience. The mind which we experience, that is, which is our mental experience seems to emerge from elements of *mind which we do not experience.*"[৫]

নির্জ্ঞানের গতীয় গুণ (dynamics) আবিষ্কার করেই ফ্রয়েড মনোরোগ বিদ্যা ও মনোবিদ্যা উভয়কেই অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্তরে তুললেন। গতীয়গুণসম্পন্ন নির্জ্ঞানস্থ ইচ্ছার আধারে সুস্থ ও অসুস্থ মনকে যুগপৎ বোঝা সম্ভব হ'ল। উদ্‌বায়ু, বাতুলতা ও অন্যান্য অস্বভাবী মানসতা, স্বপ্ন, স্বভাবী মন ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে ফ্রয়েডীয় প্রকল্প ও তত্ত্বগুলির মাধ্যমে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। এইটেই হ'ল মনঃসমীক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান। সাপেক্ষ প্রতিবর্তক (conditioned reflex) কিংবা অন্য কোনও শারীরবৃত্তীয় সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প সাহায্যে এটা এখনও সম্ভব হয় নি। শেরিংটনের (Sir Charles Sherington) অভিমত এখানে প্রণিধানযোগ্য : "The student of the mind must find the physiology of the brain still remote and vague for his desiderata on his subject......There is for instance the condition 'anxiety'. None is I suppose more far-reaching as a warper of the mind. But where does neuro-physiology contribute anything to the knowledge of the norm from which anxiety causes departure and what has cerebral physiology to offer on the whole subject of 'anxiety'? The psychiatrist has perforce to go on his way seeking things more germane to what he needs. The mind is a something with such manifold variety, such fleeting changes, such countless nuances, such wealth of combinations, such heights and depths of mood, such sweeps of passion, such vistas of imagination that the bald submission of some electrical potentials recognizable in nerve-centres as correlative to all these may seem to the special students of mind almost derisory"।[৬]

শিবপদ বাবু প্রশ্ন করেছেন, কি হ'লে নির্জ্ঞানের প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যাবে? উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা এখন স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি অন্য কোনও প্রকল্প বা তত্ত্ব দিয়ে আরও সহজভাবে স্বপ্ন, স্বভাবী ও অস্বভাবী মনকে যুগপৎ বোঝা যায় এবং যদি তা দিয়ে মনোরোগ চিকিৎসা আরও ব্যাপকভাবে সম্ভব হয়, তা হলেই নির্জ্ঞানের প্রকল্প ও তজ্জনিত অন্যান্য তথ্যরাজি ধ'রে রাখা গোঁড়ামি ও নিছক মূর্খতা হবে। মনঃসমীক্ষণের "শত্রুরূপী বন্ধুরা" এই অতি কষ্টসাধ্য বৈজ্ঞানিক পথে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তগুলিকে নিরাকৃত করবার চেষ্টা করলে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন হবে এবং আমরা তাতে খুশীই হব।

শিবপদ বাবু এ্যাড্‌লারের যে বিকল্প ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রকৃত বিচার একমাত্র কোনও ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত, স্বপ্নবিশ্লেষণ ও অবাধ ভাবানুষঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমেই

৫ *Man on his nature*, Pelican Edition, 1955, pp. 250-251

৬ *ibid*, pp. 237-238

সম্ভব। পরে অন্য এক প্রবন্ধে তা করবার চেষ্টা করব। নিছক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনাই কঠিন হয়ে পড়ে এবং বহু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও প্রকল্প সম্বন্ধে ভুল ধারণা গঠিত হয়। শিবপদ বাবু যে ভাবে তাঁর প্রবন্ধে 'একটি শিশুকে জলে ফেলে-দেওয়ার' ঘটনাটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, তা আর যাই হ'ক মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যা নয়—ফ্রয়েড কি অন্য কোনও মনঃসমীক্ষক এভাবে কোনও ঘটনাকে বোঝবার বা বোঝাবার প্রচেষ্টা করেন নি। এ ছাড়া, উনি ঘটনাটির যে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা এবং সেই সঙ্গে এ্যাডলারের যে "বিকল্প ব্যাখ্যা" দিয়েছেন তার মধ্যে কোনটা ঠিক তা কি বিচার করা যাবে শুধু তত্ত্ব আলোচনায়? দর্শনশাস্ত্রে বা যুক্তিবিদ্যায় যা চলে, বিজ্ঞানে তা চলে না। এখানে সমস্ত সিদ্ধান্তকেই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়। তাই উপরোক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দুটির মধ্যে কোনটা ঠিক, তা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ধারিত করতে হ'লে দরকার হবে ঐ ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত এবং স্বপ্নবিশ্লেষণ ও অবাধ ভাবানুষঙ্গের মারফত সংগৃহীত উপাত্তসমূহ।

"নির্জ্ঞান-মন এমনই পদার্থ যা আমাদের সংজ্ঞান চিন্তায় স্পষ্টার্থক হবার কথা নয়", এ দিয়ে শিবপদ বাবু কী বলতে চেয়েছেন তা খুব স্পষ্ট নয়। নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব কেবল মনঃসমীক্ষকের অনুমান সাপেক্ষ এই ওঁর আপত্তি; না উনি বলতে চান যে নির্জ্ঞান প্রত্যয়টি (conception) ভালভাবে নিরুক্ত (well-defined) নয়। পদার্থবিদ্যায় ম্যাটার (matter), অ্যাটম্ (atom), ইলেক্ট্রন্ (electron), নিউট্রন (neutron), প্রোটন (proton) ইত্যাদি কি পদার্থবিদের ধারণামাত্র নয়? রাসেল বলেন ম্যাটার (matter) একটি "convenient formula for describing what happens where it isn't"।[৭] অধ্যাপক জোড্ বর্তমান পদার্থবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে " ...the atom, however, we conceive it, is not directly known. Its existence is inferred from events taking place elsewhere which it is presumed to have caused"।[৮] বৈজ্ঞানিক প্রকল্প এই ধরনেরই হয়ে থাকে; ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর হয় বলেই এদের মেনে নিয়ে বিজ্ঞানী চলেন।

ধারণা বা প্রত্যয়ের (concept) অস্পষ্টতা ও সঠিক সংজ্ঞার্থের (precise definition) অভাব ভূবিদ্যা (geology), জীববিদ্যা (biology), শারীরবৃত্ত (physiology), জ্যোতিষ (astronomy), এমন কি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নও কোনও কোনও স্থলে বর্তমান। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনোবিদ্যা ব্যতিরেকে অন্যান্য বিজ্ঞানে যে-সব তাত্ত্বিক অসংগতি বা অস্পষ্টতা আছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না। বস্তুতঃ, প্রতি বিজ্ঞানীই যদিও বা তাঁর প্রত্যয়গুলিকে মার্জিত (refine) করায় সর্বদাই সচেষ্ট, কার্যক্ষেত্রে এর অভাব বিশেষ কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে না। রসায়ন থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বহু রসায়নবিদ্ ও বহু ভূবিদের শত বর্ষেরও অধিক আপ্রাণ চেষ্টা ও গবেষণা সত্ত্বেও, আজও কয়লার গঠন (structure) কি স্বভাব (nature)-কে বৈজ্ঞানিকভাবে নিরুক্ত (define) করা সম্ভব হয় নি। কয়লার অ্যারোম্যাটিক কার্বন নিউক্লিয়স (aromatic carbon nucleus) কী তা রসায়নজ্ঞেরা একেবারেই বলতে পারেন না; কিন্তু এটা ধরে থেকে এঁরা কার্যক্ষেত্রে

৭ *At Outline of Philosophy,* p. 163

৮ *Guide to Modern Thought,* p. 111.

এগিয়ে যাচ্ছেন। এটা কী পদার্থ তা বোঝাতে গিয়ে এঁদের এতই অসুবিধে বোধ হয় যে সম্প্রতি এক বিশিষ্ট ইংরেজ রসায়নবিদ্ কার্বন নিউক্লিয়সের সঙ্গে নির্জ্ঞানের তুলনা করেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে উল্লেখযোগ্য : "......Now is not our unconscious or sub-conscious rather like the aromatic carbon ? It is the unconscious that goes through us steadily from the cradle to the grave, and we know nothing about it until a man like Freud starts digging into things with the energy and insight of a genius. Similarly, we seem to know as yet relatively little of the aromatic carbon nucleus of coal"। [১]

মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বীয় সূত্রগুলি (theoretical constructs) রসায়নবিদ্যার গঠন-সংশ্লিষ্ট সংকেতগুলির (structural formulae) সঙ্গে তুলনীয়। রাসায়নিক দ্রব্যের সংকেতগুলি ব'লে দেয় যে বিশেষ অবস্থায় দ্রব্যটিকে ফেললে তার কি কি প্রতিক্রিয়া হবে, এবং সেইরকম অবস্থায় দ্রব্যটিকে রেখে আমরা সংকেতগুলির যাথার্থ্য যাচাই করি। প্রায় সমভাবেই আমরা মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বীয় সূত্রগুলির উপযুক্ততা পরীক্ষা করি—যদিও বিষয়ের ভিন্নতা হেতু পদ্ধতি একটু ভিন্ন হতে বাধ্য। রোগীর কি স্বভাবী ব্যক্তির সমীক্ষণকালে অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) ও স্বপ্ন বিশ্লেষণ থেকে তার নির্জ্ঞানস্থ প্রেষণা বা উদ্দেশ্য (motives) ঠিকভাবে অনুমিত হয়েছে কিনা যাচাই করা যায় তার বিভিন্ন সংজ্ঞাত প্রতিন্যাস (attitude) ও চেষ্টিত (behaviour)-গুলি পর্যবেক্ষণ করে। সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার ফল হেতুই ধীরে ধীরে রোগীর রোগলক্ষণ উপশম হতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রতিন্যাসে ও ব্যবহারের মধ্যে আশানুরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেই কিছু না কিছু ফাঁক থেকে যায়। মনঃসমীক্ষণেও তাই ঘটে। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর বাকি থেকে যায় ; আর তাই প্রত্যেক মনঃসমীক্ষকই তাঁর অনুমানগুলিকে বারে বারে যাচাই করায় ও রোগীর চেষ্টিতসমূহ, ভাবানুষঙ্গ, স্বপ্ন, প্রক্ষোভজ গূঢ়ৈষা ইত্যাদিকে আরও বিস্তীর্ণ প্রসঙ্গে বোঝবার চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। ফ্রয়েড কি তাঁর অনুগামী কোনও মনঃসমীক্ষকেই এটা বলেন নি যে তাঁরা নির্জ্ঞানের গভীরতম প্রদেশ সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে ফেলেছেন, যার পর আর কিছুই দেখবার নেই। ফ্রয়েডের যে কোনও পুস্তক পড়লেই শিবপদ বাবুর অন্ততঃ এ ভুল ভাঙ্গবে।

বিজ্ঞানের পথ বড়ই দুরূহ। এখানে লেসিং (Lessing)-এর কথায় সত্যকে পাওয়ার চেয়ে বোধ হয় সত্যান্বেষণেরই মূল্য বেশী ("search for truth is more precious than its possession")। আর সব কিছুকে বাদ দিলেও, মনের মতো এক "অভৌতিক" পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষণ সম্ভব করে তোলার জন্যই সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না ; তাতেই বরং এই মহামনীষীর অবমাননা করা হবে। তাই মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে যে কোনও সমালোচনাই আমরা সাগ্রহে বোঝবার চেষ্টা করি এবং শ্রীযুক্ত শিবপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও তাঁর তাত্ত্বিক সমালোচনার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

[১] Dr. J. W. Whitaker, Proceedings of the Symposium on the Nature of Coal, page 319, published by the Central Fuel Research Institute, Dhanbad.

টোটেম ও টাবু*

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

টাবু শব্দটির অদৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন কাণ্ড ঘটেছে। এর দ্বারা যে দ্বর্থবোধ প্রকাশ হয় তার প্রয়োজনের অভাবে এই ভাব লুপ্ত হয়েছে ; কিংবা এর সমার্থবোধক শব্দমালা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরূপ ধারণা করে নেবার পিছনে যে কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহাসিক পরিবর্তন থাকতে পারে তা পরে খুব সম্ভবতঃ আমি দেখাতে পারব। শব্দটি যে প্রথমে বিশেষ রকমের মানব সম্পর্ক সূচিত করত যার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রক্ষোভীয় উভয়বলতা এবং যা থেকে সমধর্মী অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে তা-ও দেখানো যাবে।

আমরা ভুল না করলে দেখতে পাব যে, মানুষের বিবেকের প্রকৃতি ও উৎপত্তির উপরও টাবু আলোকপাত করছে। টাবু-নিয়ম ভঙ্গ করার পর মনে অপরাধভাবের ও বিবেক দংশনের আবির্ভাব হয়। এটা প্রমাণ করার জন্য কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। টাবু-ভঙ্গ-জনিত বিবেক-দংশন, যাকে এক কথায় টাবু-বিবেক (Taboo-conscience) বলা যায়, তা বোধ হয় বিবেকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীনতম।

কারণ, "বিবেক" (conscience) বলতে আমরা কী বুঝি ? পারিভাষিক প্রমাণ অনুযায়ী এর অর্থ হচ্ছে, যা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। কোনও কোনও ভাষায় চেতনা থেকে এর অর্থের প্রভেদ নেই বললেই চলে।

আমাদের মনে ইচ্ছা-বেগ (wish impulse) রয়েছে। এই ইচ্ছা-বেগের বিরুদ্ধে আপত্তির আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষীকরণই হচ্ছে বিবেক। এই আপত্তি নিশ্চিতভাবে স্বয়ংক্রিয়, যে অন্য কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না। বিবেকের এই দিকটায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। অপরাধী বিবেকের পক্ষে এটা খুব স্পষ্ট। সেখানে বেশ কতকগুলি ইচ্ছাবেগকে সফল করে তুলতে যেসব ক্রিয়া সাহায্য করে এমন সব ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মনের নিন্দাবাদ আমরা জানতে পারি। এর প্রমাণ করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না। যে ব্যক্তিরই বিবেক আছে সে নিজেই বুঝতে পারে মনের এই নিন্দাবাদ ও কৃত দুষ্কর্মের জন্য তিরস্কার কতটা সমীচীন। কিন্তু টাবুর প্রতি বর্বরদের মনোভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক এই রকমটিই দেখা যায়। টাবু হচ্ছে বিবেকের আদেশ, এই আদেশ অমান্য হলে মনে সাংঘাতিক অপরাধভাবের সৃষ্টি হয়। এটা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, অপরপক্ষে এর আরম্ভ কবে তাও তেমনি অনিশ্চিত।[১]

* অনুবাদ—ধনপতি বাগ, এম. এসসি, শ্রীনিকেতন।

১ এর পাশাপাশি ঘটনা বিশেষ লক্ষণীয়। টাবু ভঙ্গ করে যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়, অজানতে সেই নিয়ম ভঙ্গ করলেও অপরাধবোধের হ্রাস হয় না। (উপরের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। গ্রীসীয় উপকথার মধ্যে দেখা যায় যে, ইডিপস্ যে কাজ সজ্ঞানে করে নি, এমন কি যে কাজ সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেছিল সে-কথা জানা সত্ত্বেও তার অপরাধবোধ দূর হয় নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানব-সম্পর্কের মধ্যে যে উভয়বলতা রয়েছে সেইরূপ উভয়বলতা বোধ থেকেই বিবেকের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। টাবু ও অনুকর্ষী উদ্বায়ু উভয় ক্ষেত্রেই যে-সব অবস্থা বর্তমান, সম্ভবতঃ সেইসব অবস্থাতেই এর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দুটি বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে একটি অপরটির জবরদস্ত চাপের দ্বারা অবদমিত হয়ে অজ্ঞাত থেকে যায়। উদ্বায়ু রোগের সমীক্ষণের দ্বারা আমরা যেসব জ্ঞান আহরণ করেছি তাই দিয়েই আমরা এই মতকে সমর্থন করতে পারি। প্রথমতঃ, অনুকর্ষী উদ্বায়ুর ক্ষেত্রে দেখা যায়ঃ নির্জ্ঞান মনে বিচরণকারী প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ পীড়াদায়ক বিবেকানুবর্তীতা প্রলক্ষণের প্রাচুর্য ; যা রোগের উত্তরোত্তর অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী বিবেকের (guilty conscience) সর্বোচ্চ শিখরে উন্নিত হয়। যদি অনুকর্ষী উদ্বায়ু রোগীর মাধ্যমে অপরাধী বিবেকের মূল উদ্ঘাটিত না হ'ত তা হলে এর আবিষ্কারের আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না ; এ কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যেতে পারে। এই সমস্যাটির সমাধান নিউরোটিক ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে ; এবং জাতিগুলির বেলাতেও যে এর সমাধান পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, স্পষ্টই দেখা যায় যে, অপরাধ বোধের মধ্যে উৎকণ্ঠার অনেক কিছু লক্ষণই বর্তমান রয়েছে। বিনা দ্বিধায় একে বিবেক-ভীতি (conscience phobia) আখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু ভয়ের মূল রয়েছে নির্জ্ঞান মনে। উদ্বায়ু-রোগের মনোবিদ্যা চর্চা করে আমরা জেনেছি যে, যখন ইচ্ছানুভূতিগুলি (wish feelings) অবদমিত হয় তখন তাদের কাম (libido) উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধ বোধের মধ্যেও কিছুটা অজানা ও অজ্ঞাত (unconscious) জিনিস রয়েছে, যেমন, বর্জন করার প্রেষণা (motivation)। এই অপরাধ বোধের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তার প্রকৃতি থেকে এই অজানা পরিমাপের হদিস পাওয়া যেতে পারে।

টাবুর আত্মপ্রকাশ যদি প্রধানতঃ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে তা হলে একে স্বতঃসিদ্ধ বলেই গণ্য করা চলে। ইহার ভিত্তি যে সুনিশ্চিত বাসনাপূর্ণ আবেগের উপর স্থাপিত সে-কথা উদ্বায়ুর সঙ্গে তুলনা করে জোর করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। কেন না, যে কাজ কেউই করতে চায় না সে-কাজ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করারও দরকার হয় না। পরন্তু যা কিছু করার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে নিষেধাজ্ঞা আছে সেরূপ কাজের পিছনে নিশ্চয়ই প্রলোভনও আছে। যদি আমরা এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তটি আদিম জাতিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তা হলে আমাদের এরূপ উপসংহার করতে হয় যে, আদিম জাতিদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রলোভনগুলির মধ্যে তাদের রাজা ও পুরোহিতদের হত্যা করা, অজাচারিতা করা, মৃতব্যক্তিদের নিন্দা করা প্রভৃতি ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল ; এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যেখানে আমরা নিজেরাই আমাদের বিবেকের বাণী খুব স্পষ্টভাবেই শুনতে পাই সেইসব ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করি তা হলে আমরা খুবই মতবিরোধের সৃষ্টি করব। কেননা, সে-ক্ষেত্রে আমরা খুব জোর দিয়ে এবং কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না রেখে বলব যে আমরা এই সব দৈবাদেশ অমান্য করতে এতটুকু প্রলুব্ধ হই নি। উদাহরণ স্বরূপঃ তুমি হত্যা করিবে না, এবং এরূপ কথা মনে এলে আমাদের মনে ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু উদয় হয় না—এই দৈবাদেশটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

[ক্রমশঃ]

বর্তমান সমস্যা

সমাজকল্যাণে লোকসেবার, বিশেষ করিয়া পীড়িতের সেবার ইচ্ছা লইয়া কিছু কিছু শিক্ষিত উদারচেতা সহানুভূতিশীল ব্যক্তি লুম্বিনির রোগীদিগের জন্য কিছু কাজ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন, সে-কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পরে আমরা আরও চিঠি উক্ত মর্মে পাইয়াছি। সমাজ জীবনে ইহা শুভ লক্ষণের সূচনা করে। যুদ্ধ, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাস্তুহারা ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যা পর পর অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সমাজ জীবনে যে কঠিন আঘাত হানিয়াছে তাহার ফলে উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়া পুর্বাচরিত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মূল-বিশ্বাস নষ্ট করিয়া পুর্বাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা দুই-ই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ফলে দেশের প্রায় সর্বদিকেই নিষ্ঠাহীনতা, স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা এমন কি লজ্জাহীনতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রমে যেন আদর্শভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারের বাহাদুরীই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই সব লক্ষণ দেশের দুর্দিন সূচিত করে। অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের মতই এই হাসপাতালের কর্মিগণের কিছু অংশ এই কালস্রোতে ধরা পড়িয়াছে। ফলে হাসপাতালের প্রাত্যহিক কর্মে কিছু কিছু গলদ দেখা দিয়াছে। ব্যক্তি-সততার অভাব হইলে সুনিয়ন্ত্রিত সুষ্ঠু কর্মচালনা সম্ভব হয় না। একদিকে এই চিত্র যেমন দেখিতেছি, অন্যদিকে কিছু কিছু সত্যনিষ্ঠ যেসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদেরও সচেতনতা দেখিতেছি। ইহাই আমাদের আশার কথা। মানুষের মধ্যে নানা বৃত্তি কাজ করে। তাহা হইতে নানা প্রেরণা আমাদের জীবনে জাগে। এই সকল প্রেরণার মধ্যে কতকগুলিকে সমাজ ও জীবনহীতকর বলা যায়; অপরগুলি সমাজ ও জীবন দুয়েরই পক্ষে হানিকর বলা হয়। অবস্থার বিপাকে যে অহিতকর মানস প্রকৃতি প্রবল হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, সেই অনিষ্টের মধ্যেই আমাদের মনের কোনে শুভ ও কল্যাণ কামনা সুসময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকে। অনুকুল অবস্থায় আবার সেই সব ইচ্ছা প্রবল হইয়া কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়। সেই শুভ চেতনার আভাস দেখা দিয়াছে। ভাঙ্গনের মধ্যেও গঠনের প্রয়াস দেখিয়া আমরা আশান্বীত হইয়াছি। বিকারের প্রলাপ থামিলে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসে। আমরা আশা করিতেছি ক্রমে হাসপাতালে আবার সুস্থ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মানসিক রোগের হাসপাতালে শারীরিক রোগের হাসপাতাল হইতে কর্মীসংখ্যা বেশী থাকা প্রয়োজন হয়। মানসিক রোগী নিজের ও অপরের প্রতি যে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে অন্য রোগী তাহা করে না। এই কারণে বিশেষ সাবধানতার ব্যবস্থা রাখিয়া চলিতে হয়। শয্যার উপকরণ, খাদ্য ও কিছু পরিমাণে ঔষধও এক শ্রেণীর মানসিক রোগী নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার জন্যও ব্যয় বেশী হয়। লুম্বিনির আর্থিক অবস্থা কোনদিনই স্বচ্ছল ছিল না, আজও নাই। প্রায় ২৩ বৎসর নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়া চলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে বড় হইয়াছে এবং প্রায় আট হাজার মানসিক রোগীর চিকিৎসা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু লুম্বিনি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সমস্যার সমাধান না হইয়া সর্বপ্রকার দ্রব্যমূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধির ফলে হাসপাতালের ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়াছে। বাধ্য হইয়া পরিচালক সমিতি বিভিন্ন শ্রেণীর শয্যায় মাসিক দেয় খরচের হার কিছু বাড়াইয়া দিয়াছেন। মানসিক রোগ চিকিৎসা

করিতে দীর্ঘদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সামান্য আহার, পরিধান, শিক্ষা ইত্যাদির খরচ মিটানই দুঃসাধ্য হইয়াছে। তদুপরি মানসিক রোগীর চিকিৎসার খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। একদিকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক দেয় খরচের হার বৃদ্ধি, অপর দিকে অর্থসংস্থানে অপরাগ হইয়া বহু লোকের পক্ষেই দীর্ঘমেয়াদী এই চিকিৎসা করানো সম্ভব হইতেছে না। দেশের রাজ্যসরকার এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে এই সমস্যার কোনও সুরাহা হইতে পারে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি হইতে দেখিতে পাই দেশের স্বাস্থ্যো-ন্নতির জন্য নানা আয়োজন ও ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গুঢ় সমস্যার চাপে পড়িয়া মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যসরকার আজ পর্যন্ত এদিকে তেমন নজর দেন নাই। আমরা অচল হইয়া পড়িলে সময় সময় সরকারী অর্থ সাহায্য পাই সত্য, কিন্তু সে-অর্থের পরিমাণ হাসপাতালের দুর্দশা হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে নিতান্তই সামান্য। আমরা প্রতিবৎসর বহুবার করিয়া লুম্বিনির আর্থিক অবস্থার কথা সরকারকে জানাইয়া আসিতেছি। আশা করিতেছি অনতিবিলম্বে আমরা সরকারের সহায়তা লাভ করিব। সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ লুম্বিনির পরিচালক সমিতির সভ্য আছেন। তিনি এই হাসপাতালের সর্ব বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তদুপরি লুম্বিনির বিষয় আমরা নিয়মিতভাবে রাজ্য সরকারকে জানাইয়া থাকি। উচ্চপদস্থ সবকারী কর্মকর্তাগণের সহিত আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা প্রত্যেকেই লুম্বিনি সম্বন্ধে অত্যন্ত মমত্বপুর্ণ সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করেন। আমাদের দীর্ঘদিনের কর্মপ্রচেষ্টা ও জনহিতকর কার্যের ফলাফল বিচার করিয়া আমাদের স্বাধীন দেশের রাজ্যসরকার এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত বাৎসরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন আমরা এই আশা পোষণ করি।

দেশ বিভাগের পুর্বে এই বাংলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম ও জনসেবার প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদার শ্রেণীর প্রচুর দান পাইয়া পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীনতার পর সেই জমিদারশ্রেণী লোপ পাইয়াছে। তাহার স্থলে এক নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণী ধনী হইয়া উঠিয়াছেন। পুর্বের রাজা জমিদারদিগের অপেক্ষা এই নূতন শ্রেণীর পুঁজিতে হয়তো বা অনেক বেশী অর্থই সঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি বিশেষ করিয়া সাধারণের দুঃখকষ্ট দূর করিবার দিকে এবং লুম্বিনির মত লোকসেবায়তনগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য দান করেন তবে দুস্থজনের তথা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে। তাঁহারা কিছু কিছু তেমন সাহায্য করিতেছেন না এমন নহে। আমরা লুম্বিনির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাই শেষ কথা নহে। বিন্দু হইতেই সিন্ধু হয়। কিছুদিন পুর্বে আমরা জনৈকা বৃদ্ধার নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার অর্থসঙ্গতি কিছুই ছিল না। এমন কি দিনের প্রয়োজনীয় খরচই কুলাইতে পারেন না। তবু হাতে যাহা নিজের আহারাদি খরচ বাবদ সামান্য পয়সা পাইতেন তাহা হইতে এক পয়সা কোনদিন বা দুই পয়সা করিয়া জমাইয়া কয়েক বৎসরে প্রায় বার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। সেই টাকা লুম্বিনির রোগীদের কল্যাণের জন্য তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের আর সামর্থ্য নাই বলিয়া আর কিছু দিতে পারিলেন না ইহাও সহজ ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। এই শ্রদ্ধাস্পদা নারী তাঁহার নিজের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। যাঁহারা মনুষ্যত্বের মূল্য দিতে পারেন তাঁহাদের সকলের নিকটই ইনি পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করিবেন। আমরা আবার তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এই প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের

বাল্যকালে প্রায় প্রতি মাসে একদিন করিয়া এক অন্ধ ভিক্ষুক আসিত। নাম চিন্তামণি। হাসিমুখে আসিয়া বাড়ীর সকলের কুশল প্রশ্ন করিত। কোনদিন তাহার দাবী কিছু শুনি নাই। দেখিতাম আমাদের বাড়ীর সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন এবং তাহাকে মোটামুটি ভালই সাহায্য দেওয়া হইত। পরে জানিয়াছি সে নিজে যাহা ভিক্ষা করিয়া পায় তাহাও দিনান্তে নিজের ঘরে যাইয়া নিজের আহারের পরিমাণ সামান্য কিছু রাখিয়া, বাকি আর সব ভিক্ষালব্ধ জিনিস অন্য ভিখারীকে বিলাইয়া দিত। বহু বৎসর তাহাকে একই নিয়মে আসিতে দেখিয়াছি। তাহার খবর শুনিয়া অবধি তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়াছে—যৌবনের প্রারম্ভে সে শ্রদ্ধা আরও স্থিতিবান হইয়া আজও আপন স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারাও আমাদেরই দেশের মানুষ। এই আদর্শ অনুসরণ করিবার মত যোগ্যতা সকলের নাই জানি, কিন্তু অনেকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে কিছু সফলতা অবশ্যই লাভ করিতে পারেন। মনুষ্যের অন্তরে যেদিন সত্য বেদনাবোধ জাগে, তাহার হৃদয় সেদিন খুলিয়া যায়, সেদিন তাহার কৃপনতা স্বার্থপরতা ঘুচিয়া যায়। অহঙ্কার লোপ পায়। সেদিন সে-মানুষ নিজেকে ভুলিয়া অপরের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না। আমাদের দেশেও সেই দরদী আছে। বর্তমান স্বার্থপ্রধান ক্ষুদ্রতা হইতে ইহারাই একদিন দেশকে গৌরব দান করিবেন। সেই বিশ্বাস লইয়াই আমরা বারে বারে লুম্বিনির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে এই পত্রিকা মাধ্যমে জানাইতে প্রয়াসী হই।

১৯৩৬ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত লুম্বিনির আয়-ব্যয় ও অন্যান্য তথ্যগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

	আয়	ব্যয়
এপ্রিল —	২৫৫৪১·১৭	৪১১৮৮·৪০
মে—	২৪৭৪৯·৯৬	২৭৪৫৩·১৮
জুন—	২৬৩২৫·৫০	৩১৬১৩·৪০

রোগী ভরতি ও নির্গম

	ভরতি	নির্গম
এপ্রিল —	৪৬	৩৬
মে—	৩৩	৩৪
জুন—	৩৫	২৫

চিকিৎসার ফলাফল

	আরোগ্য	উন্নতি	মৃত্যু	অপরিবর্তিত
এপ্রিল—	২০	১৬	১	২
মে—	২২	১৩	১	১
জুন—	১৬	৭	১	১

বহির্বিভাগের মানসিক রোগী

	নূতন রোগী	পুরাতন রোগী	মোট
এপ্রিল —	৬৬	২৭৪	৩৪০
মে—	৫২	২৩৬	২৮৮
জুন—	৫০	২২৪	২৭৪

-তরুণচন্দ্র সিংহ

———

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha. D.Sc., for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9.29-1.

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

পঞ্চম বর্ষ

চিত্ত

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া এবং তাহার সাহায্যে সমাজের নানান সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজের বা অপর কাহারও মতামর্ত সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বক্তব্য মাত্র। এই পত্রিকায় ছাপা হইলেই প্রকাশিত মতবাদ সম্পাদকীয় বা পত্রিকার পরিচালক ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির অনুসৃত মতামত বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না।

চিত্ত

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০।

কল্পান

প্রণব বসু, এম. এসসি.

ভাবুক লোক তার ভাবনা-বিলাসিতার মধ্যে সময় কাটায়। যে-ভাবনা কোনও কাজে অনুপ্রেরণা দেয় না, যে-ভাবনা শুধু ভাবনার জন্যেই, যে-ভাবনার বিলাসিতায় ভাব-বিলাসী মন বিভোর হয়ে থাকে, সে-ভাবনা সত্যিই ভাবনার কথা। এই কল্পনা-বিলাস যখন ফেঁপে উঠে বেশী জোরাল হয়ে ওঠে তখন উন্মায়ু-গ্রস্ততা বা উন্মত্ততার গোড়াপত্তন হয়। মনের এই কল্পনা-গ্রস্ত অবস্থা মনের রোগের লক্ষণগুলোর গোড়ার ধাপের কথা। মনের এই অবাস্তব কল্পনা-বিলাসের সঙ্গে রাতে-দেখা স্বপ্নের বেশ মিল পাওয়া যায়। স্বপ্নের মত কল্পনাও ইচ্ছাপুরণের চাহিদা মেটায়। এই কল্পনা-প্রবণতা কমবেশী সবার মধ্যেই আছে। যারা স্বভাবী (normal) তারা এ কথা নিজের মনেই রেখে দেয়। কল্পনার জাবর কাটা, এ যেন অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার ; এর থেকে সুখ আছে, যে-সুখ নিজের অন্তরতম চাহিদা পুরণের সুখ—তাই তা আর কাউকে বলার নয়। এগুলো অসত্য, অবাস্তব আর অস্বভাবী (abnormal) ; তাই লজ্জার কথা। এক ধরনের লোকের উপর নিয়তির বিড়ম্বনায় অত্যন্ত কঠোর চাপ পড়ে, যে-চাপে পড়ে তারা তাদের নিজেদের সুখ আর কষ্টের একটা জবাবদিহি করার দায়িত্ব বোধ করে। তারাই হ'ল উন্মায়ুগ্রস্ত। আমরা জানি রোগী যা বলে সাধারণতঃ স্বভাবী লোক তা বলে না, কিন্তু কমবেশী সবার মধ্যেই তা আছে। যা আছে তা হ'ল কল্পনা-বিলাসিতা। এই কল্পনা-বিলাস থেকে যে-আনন্দ কবির ভাষায় তা হ'ল 'মোর ভাবনায় কী হাওয়ায় মাতালো মন'। কল্পনার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা আছে ; তাই আমরা বলি কবি কল্পনা-প্রিয় বা ভাব-বিলাসী।

প্রসঙ্গক্রমে অপরিহার্যরূপে কল্পনা-বিলাসিতা থেকে কাব্যকারের আলোচনায় এসে পড়েছি। আমরা মোটামুটিভাবে দু ধরনের কবি বা লেখকের হদিস পাই। এক ধরনের কবি বা লেখক সামনে একটা ছক রেখে সেই কাঠামো অনুযায়ী লেখাকে প্রসারিত করেন (যেমন বিয়োগাত্মক, মিলনাত্মক বা মহাকাব্যের লেখকেরা); আর এক ধরনের কবি বা সাহিত্যিক হলেন তাঁরা, যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের বিষয়বস্তু উদ্ভাবন করে যান।

এই দ্বিতীয় ধরনের লেখকের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষণীয়; তা হ'ল এগুলোর মধ্যে সব সময়েই এক নায়ক থাকে যে সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রধান হয়ে গল্প, নাটক, উপন্যাস বা কাব্যের মধ্যে বিরাজমান। সে সমস্ত কৌতূহলের লক্ষ্যবস্তু আর ঘটনা পরিবেশের মূলাধার। যাকে পাঠকের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে লেখক সম্ভাব্য প্রয়াসে সকল সময়ই প্রয়াসী। আরও হালকা জনপ্রিয় লেখার নায়ক সম্বন্ধে বলা যায়—সে মরেও মরে না। যদিও মহাকাব্য আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় তবুও বাস্তব-জ্ঞান-সম্পন্ন মন কখনও কখনও রামায়ণের রাবণের ভাষায় এই ধরনের লেখায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, "মরেও মরে না রাম, এ কেমন বৈরী?" এই বীর আর কেউ নয়, মহাবীর রাজাধিরাজ অহং। সেই সমস্ত নাটক, উপন্যাস গল্পের নায়ক।

আত্মকেন্দ্রিক লেখায় আর একটা চোখে পড়ার মতো বিষয় হ'ল, যে মেয়েই নায়কের সংস্পর্শে আসে সেই তার প্রেমে পড়ে বা প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'এ নায়কের প্রেমে কুলরমণীদের আক্ষেপ :

> "চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি। আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ॥
> কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান। কিবা নয়নের ধার কাড়ি লয় প্রাণ ॥"

এটা কবির নিজের অহং-এর চাহিদা যা অপূর্ণ কামেচ্ছা থেকে উদ্ভূত। কারণ আমরা জানি ইচ্ছা তার পুরণের পথ খোলা পেলে কল্পনা সৃষ্টি করে না; কল্পনা-বিলাস অপূর্ণ কামেচ্ছা থেকেই সৃষ্ট হয়। উপন্যাস বা নাটক বা কাহিনীর আর সব চরিত্রকে ভাল আর মন্দ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নায়কের সাজে সেজেছে যে অহং তার নায়কোচিত গুণকে সমর্থন বা অসমর্থন করার পরিপ্রেক্ষিতে যথাক্রমে ভাল বা মন্দ গুণ চরিত্রগুলির উপর আরোপ করা হয়। যেমন অসামাজিক আর বেআইনী গর্ভসঞ্চারের আসামী সুন্দরকে গ্রেপ্তার করেও কোটাল কুলরমণী আর সবার বিরাগভাজন হ'ল, এমন কি কবিরও। নায়কের চেহারার সৌন্দর্যে স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই হতবাক্‌ ও মুগ্ধ। আত্মপ্রীতি কবির আবেগে অত্যন্ত সহজে ধরা পড়ে। কবি কাব্যের নায়কের দিকে সেই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন যে-দৃষ্টিতে গ্রীক দেবতা নারসিসাস জলের উপর নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

অনেক কল্পনা-প্রসূত লেখা দিবা-স্বপ্নের মূল গুণ থেকে চরিত্রগতভাবে অনেক দূরে সরে গেলেও তার মধ্যে অনেক পরিবর্তনের, অব্যাহত সংক্রমণ ধারার মাধ্যমে একটা সংযোগ গড়ে তোলা যায়। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসেও এই ছাঁচ চোখে পড়ে। আত্মদর্শনের মাধ্যমে অনেক লেখক তাঁদের একটা অহংকে অনেক ভাগে ভাগ করে ফেলেন আর সেই বিপরীত ইচ্ছেগুলোর উপর ব্যক্তিগুণ আরোপ করে অনেকগুলো নায়ক সৃষ্টি করেন। একটা ইচ্ছে একটা নায়ক; তার বিপরীত ইচ্ছে সেও একটা নায়ক। কতকগুলো উপন্যাস আছে যেগুলো এই আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে অর্থাৎ অহংকেন্দ্রিক নয়; সেগুলো দিবাস্বপ্নের বিপরীত। এই উপন্যাসগুলোতে নায়ক অন্য সব চরিত্রের চেয়ে কম ক্রিয়াশীল; অর্থাৎ

নায়ক কিছুই করছে না; কোনও কিছুতে অংশ না নিয়ে সে দর্শকের ভূমিকায় থেকে সব কিছু দেখে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা এই ধরনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এও দেখা গেছে যে, লেখক ছাড়াও যেসব লোক অনেক দিক দিয়েই অস্বভাবী তাদের অহং দিবাস্বপ্নের মধ্যে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বেশ তৃপ্ত থাকে। বর্তমানের কোনও ঘটনা যদি কারও মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, তা হলে সেই প্রভাবকারী ঘটনা শৈশবের সমস্বভাবের কোনও ঘটনার স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে আর সেই সঙ্গে একটা ইচ্ছেকেও জাগিয়ে তোলে যেটা বর্তমান কাজের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হবার পথ খোঁজে; যে-ইচ্ছের মধ্যে সদ্যবর্তমান আর পুরনো স্মৃতি দুইয়েরই উপাদানগুলোকে আবিষ্কার করা যায়। একটা মনগড়া উপমা ধরা যাক। যদি কোনও সমাজতান্ত্রিক লেখক কোনও দুষ্কৃতকারীর ছবি আঁকেন, তো সেই সঙ্গে তাঁর মানসপটে শৈশবের স্মৃতির মাধ্যমে সেই ধরনের কতকগুলি দুষ্কৃতকারীর ব্যবহার ভেসে উঠতে পারে। সেই সময়ে চেঁচিয়ে সবাইকে যে কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল সেইটাই বর্তমানে সেই ধরনের চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে। এর মধ্যে অতীত আর বর্তমান দুইয়েরই সমন্বয় আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ছেলেবেলাকার খেলা থেকে দিবাস্বপ্ন পরিণত জীবনে রূপ নেয়। কাল্পনিক যে কোনও সৃষ্টির আবির্ভাবেরও সেই একই উৎস। সেই ছেলেবেলার খেলার সূত্র ধরে ও অদলবদলের মধ্য দিয়ে নবরূপায়ণ হ'ল এই সৃষ্টি।

কবি সম্বন্ধে আরও দুটো কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কবি দুটি গুণে গুণবান। একটি হ'ল কবির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ বোধগম্যতা; আর একটি হ'ল নিজের নির্জ্ঞান (unconcious) মনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে প্রকাশ করার সাহসিকতা। উচ্চস্তরের মানসিক গুণসম্পন্ন কবি বা লেখকের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবু এই প্রকারের পথে কতকগুলি বাধা আছে। তা হ'ল সৌন্দর্যবোধ, অর্থাৎ কাব্যবিচারে যাকে 'রস' বলে বর্ণনা করা আছে সেদিকের বাধা। বিদগ্ধ মনের চাহিদায় পরিবেশন করার বাধ্যবাধকতায় তার মনের সাবলীল প্রকাশ সীমাবদ্ধ। কবি তাই যা আছে তাই বলতে পারেন না; কিছু কিছু বিষয়কে আলাদা ক'রে নিয়ে বিশৃঙ্খল উপাদান থেকে সেগুলোর যোগ ছিন্ন করে সেই ফাঁকগুলোকে মনমতো পুরণ করে সমস্ত বিষয়বস্তুটাকে কমনীয় করে তোলেন। এই সমস্ত কার্যধারাটার নাম দেওয়া যেতে পারে 'কবির ছাড়পত্র'।

উপরের সমস্ত উক্তি একটা বিশেষ আলোচনার প্রস্তুতি। আমাদের হাতের কাছে বহু সম্বর্ধিত কবির বহু প্রশংসিত একটি বই রয়েছে। এই বইটি অনেকগুলি উদ্দেশ্য এক সঙ্গে সাধন করেছে। প্রথমতঃ কাব্য হিসেবে এ বই রসোত্তীর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যে রসোত্তীর্ণ কথার অর্থ হ'ল ব্যঙ্গের সমাবেশ। ব্যঙ্গ মানে হ'ল বাচ্য যখন বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, অর্থাৎ যা বলা হ'ল তার আভিধানিক অর্থ ছাড়াও যখন আরও বেশী কিছুর ইঙ্গিত করে মনকে ভরিয়ে তোলে। এটা অহং-এর দিক থেকে পাঠকের চাহিদার দিকে নজর দিলেই হয়; তাই এতে অহংকে খাটো করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে একে ফ্রয়েডের ভাষায় excentric বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ বিদগ্ধ মনে চাহিদা হিসেবে এর অহংপ্রবৃত্তি, যৌন-প্রবৃত্তির উপর স্থান পেয়েছে। সে-বিষয়ে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। তৃতীয়তঃ সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ, মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ণ ও আত্মবিশ্লেষণ একযোগে এই ছোট বইটাতে জায়গা করে নিয়েছে। আর কোনও প্রতীক্ষার মধ্যে না রেখে পাঠকের কাছে এই বহু-পাঠ্য বই আর কবির নাম বলে দেওয়া উচিত। এটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের কাছে এই নিয়ে আলোচনার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে। মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা তাঁদের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। মনে হতে পারে কাব্যরসের রাজত্বে মনঃসমীক্ষণের এটা অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু তা নয়। সেই বিশ্বকবির দিনের অনেক সময় তাঁর মধ্যেকার 'আমার মধ্যে যে আমি', এর খোঁজে কেটে গেছে। তাঁরই কথা, "রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম, দেখিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়·· ···চিনিলাম আপনারে, নিজেরে জানিলাম আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায়। সত্য যে কঠিন বড়, সে সত্যেরে ভালবাসিলাম; সে কখনো করে না বঞ্চনা······"। অনেক দিন ধরে আত্মসমীক্ষণের আয়াসসাধ্য প্রয়াসের যে বেদনা তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের তফাত কোথায়? আত্মসমীক্ষায় উত্তীর্ণ এক সুস্থ ব্যক্তির সমীক্ষাকালীন বেদনার সঙ্গে এই 'নিজেরে জানিলাম আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়' এ কথার পার্থক্য কোথায়? কোথাও নেই। যদি থাকে তা হলে তা ব্যক্তিপূজার অন্ধ-সংস্কারপূর্ণ ভক্তির গোঁড়ামির মধ্যে—যেটা বাস্তবগ্রাহ্য নয়। তফাত হ'ল তাঁর অন্তরতম এক বেদনার আবিষ্কারের ও প্রকাশের কৃতিত্ব যেটা মানুষের জীবনের চরম সত্য; তাই তাঁর বক্তব্য বিশ্বজনীন আর তিনি বিশ্ব কবি।

দু রকম অহং আমরা দেখতে পাই। একটা যে-অহং বাস্তব স্বীকার করে তাকে প্রয়োজন মাফিক বদল করতে চায়; তার মানে যে-অহং কাজ করার ক্ষমতা দেয়। অন্য একটি আরও পুরনো অহং, যে শুধু সুখ খোঁজে। যখন শুধুমাত্র সুখ-সন্ধান ছেড়ে অহং বাস্তববাদী হতে চায়, তখন বস্তুবাদী অহং-এর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তারত মনের একাংশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এদিকটা বস্তুবাদী মন থেকে আলাদাভাবে সরে গিয়ে শুধুমাত্র সুখ-নীতির আওতায় গিয়ে পড়ে। এটাই কল্পনা-বিলাস। ছেলেবেলার খেলা, পরের বয়সের দিবাস্বপ্নের মধ্যে বাইরের জগতের উপর নির্ভরকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে, এ স্থায়ী বাসা বাঁধে।

সুখ-সন্ধানী আর বস্তু-সন্ধানী অহং-এর মধ্যে শিল্প বিশেষ উপায়ে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। মূলতঃ শিল্পী বাস্তব থেকে সরে কল্পনার জগতে তার উচ্চাশা আর সুখের সন্ধান করে। কারণ প্রথমেই সে প্রবৃত্তি-সুখ থেকে অব্যাহতি পাবার চাহিদা মেটাতে পারে না। কিন্তু কল্পনা থেকে সে তার বিশেষ ধরনের গুণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আবার বাস্তবে ফিরে আসে। কল্পনাকে সে নতুন ধরনের এক বাস্তবে রূপান্তরিত করে; আর সাধারণে তাকে বাস্তবের এক মূল্যবান প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নেয়। তাই নির্দিষ্ট পথ ধরে সে, বীর, রাজা বা স্রষ্টা হয়ে পড়ে—যা তার ইচ্ছে; আর তার জন্যে তাকে বাস্তবকে পরিবর্তন করে কোনও নতুন ঘোরানো পথ বার করতে হয় না। সাধারণেও তার মতই অসন্তুষ্ট; সেই একই কারনে তাই এই অসন্তুষ্টিটা বাস্তবেরই অংশ হয়ে পড়ে।

'তাসের দেশ' এই নামই হ'ল একটি ইচ্ছার প্রতীক। সেটা হ'ল শাসককে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা। শাসকের শাসন যেন তাসের (ঘর?) দেশের মত ভঙ্গুর। শাসক এখানে অতি-অহং বা অধিশাস্তার (super-ego) বাড়াবাড়ি; তাই তার চাপে অহং আত্মরক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছে। অহং বিষয়টাকে বাস্তবে বদলাতে অপারক; তাই সে চিন্তায় সুখ আনতে চাইছে, কল্পনায় শাসককে নিপাত করছে।

অদস্ অর্থ যাহা অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। যার মানে হ'ল প্রাণী বা উদ্ভিদের রস; প্রাণীর রক্তমস্ত বা প্রাণরস। তা হলে দাঁড়ায় যা স্বয়ংক্রিয় (প্রাণের) রসাবেগ। একেই ফ্রয়েড বলেছেন

ইদ (id)। সেই প্রাণের বাইরে যা কিছু তার সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ করে তা বাহ্য; আর সেই বাহ্যিক চাপে প্রাণ নিজের মধ্যে অদস্ ছাড়া যা কিছু নিজস্ব করে নেয় তা অতি-অহং। আর এই বাহ্য-বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যেই প্রাণরসের নিশ্চেতনায় আঘাত লেগে যে তরঙ্গ ওঠে তাই চেতনা বা অহং। অতি-অহং বা অধিশাস্তা হ'ল সামাজিক ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি; অদস্ হ'ল জন্মকালীন উত্তরাধিকার সূত্রে সৃষ্ট; অহং হ'ল অদসের চেতন স্তরের বস্তু। মূল প্রবৃত্তি হ'ল (ফ্রয়েডের মতে) দুটো: একটি 'ইরস্' (eros) বা বাসনা থেকে সৃষ্টি, আর একটি ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। আত্মরক্ষার চাহিদা আর বংশরক্ষার চাহিদার মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব, আবার অহং-প্রেম আর বস্তু-প্রেমের যে-দ্বন্দ্ব এই দু ধরনের দ্বন্দ্বই 'ইরস'-এর মধ্যে পড়ে। সৃষ্টির ইচ্ছাতে এই দুই দ্বন্দ্বেরই সমন্বয় সাধন হ'ল 'ইরস্'-এর কাজ। আর দুটোকেই আলাদা ক'রে দ্বন্দ্বকে পার্থক্যহিসেবে খাড়া করানো ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির কাজ। ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি প্রাণকে জড়ত্বের দিকে নিয়ে যায়। প্রাণের ঘাটতি থাকলেই জড়ত্ব আসে, তাই আত্মরক্ষার চাহিদায় প্রাণ সব সময় এগিয়ে যেতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের অধিশাস্তা তাঁর স্বদেশের সভ্যতা, তাঁর জন্মসময়কালীন দেশের বা জাতির সমস্যা, তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য আর পিতা দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম এবং তাঁর নিজের শিক্ষাব্যবস্থা। শৈশবে বেশী সময় নির্ভরশীলতার মধ্যে কাটানোর জন্যে তাঁর উপর অধিশাস্তার চাপ প্রবল হয়েছে। দুটো মূল প্রবৃত্তির মধ্যে যে ভারসাম্য তা নষ্ট হলেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কামনার চাপ বেশী হলে যেমন প্রেমিককে হত্যাকারী করে, তেমনি আবার ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির চাপ বেশী হলে ব্যক্তিকে লাজুক ও নির্বীর্য করে তোলে। কামনাকে পরিবেশের খাতিরে বড় বেশী ছেঁটে ফেলার দরুন কবি শিশুকাল থেকেই চাপা স্বভাবের ও কল্পনা-প্রিয়।

তাসের দেশ অধিশাস্তার চাপে নিষ্পেষিত অহং-এর বিভিন্ন রূপ। রাজপুত্র প্রথমে স্বপ্ন-সন্ধানী, পরে বাস্তব-সন্ধানী অহং; সদাগর দ্বিধাবিভক্ত অহং-এর আর এক রূপ। অতি-অহং-এর চাপে অহং ছাড়া পাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে; সে অক্ষম হয়ে গেছে। রাজা (তাসের দেশে)— বিদেশী শাসক—এর বাইরের দিক; যে দিকটা ভিতরে এসে গেছে ও অতি-অহংএ রূপান্তরিত হয়েছে সেটা তাসের দেশের তাসেরা। 'তাসের দেশ'-এর ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সঙ্গে নিজের বেশ খানিকটা তফাত আছে, অর্থাৎ যাদের মধ্যে লেখক নেই তারা হ'ল 'দহলা পণ্ডিত, রাণীমাতা, আর রাজা'। এই তিন জনকেই বা তিন অবস্থাকেই কবি নিজের থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। দহলা-পণ্ডিত—শাসন। রাণীমাতা—মাতৃ-আসক্তি। রাজা—পিতৃ-বিতৃষ্ণা। শাসন (দহলা) সব সময় পিতার (রাজা) অধীন। এদিকে রাণীমাতা আর সদাগর তার আত্মসুখের সহায়, আর অপরদিকে রাজা তার পণ্ডিত দহলা-পণ্ডিত আর রাজার অধীনের বাহিরের জগৎ। নিজের জগৎ হ'ল রাজপুত্র, সদাগর আর রাণীমাতা অর্থাৎ নিজের দ্বিধাবিভক্ত মন আর মা, অপরদিকে পিতা আর তার মত শত্রুমনা বহির্জগৎ। আর একদিক দিয়ে দেখলে: রাজপুত্র—সুভাষ বসু—অহং-এর আদর্শ—অহংএর অসহায়াবস্থার অবলম্বন; যিনি দেশে জাগরণ আনবেন; যে জাগরণ আনবে সে নিজেরই কল্পনা। বিদেশী শাসক যে দেশের অর্থাৎ নিজের উপর (আমার দেশ) চেপে বসেছে সেই রাজা। সেই রাজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা বিদেশী স্বদেশী উভয়েই—আমার দেশের লোক বা অন্য দেশের লোকের সংমিশ্রণ—আমি ও বাহিরের মিশ্রণ। এইবার আমাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করার জন্য সংলাপের মধ্যে আসা যাক্।

"উৎসর্গ। কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম"। এই উৎসর্গের মধ্যে যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে তার প্রতি পুজার অপেক্ষা বন্ধুভাব বেশী। অনেকটা যেন এই কথা: তোমার মনে যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের ব্রত তা আমারও। যদিও লেখাটা আগে ছাপা তবু উৎসর্গ বইটা লেখার পর; আর তা প্রায় ছয়বছর পরে। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্রও এ অবস্থায় তাঁর 'পথের দাবী' হয়তো সুভাষ বসুকে উৎসর্গ করতেন।

প্রথমেই যা গান তা হ'ল "খর বায়ু বয় বেগে ....."। এখানে অহং এর শিক্ষার একদিক আমরা দেখতে পাই; যেমন "যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ ওঠে উত্তাল, হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল, জয়-জয় জয়গান গাইয়ো"। অহং পরিবেশকে বদল করে বাঁচে। বদল করার পদ্ধতি ভাঙার মধ্যে নয়; তাকে বুঝে তারই তালে তাল দিয়ে চলার মধ্যে। এটা অহং-প্রবৃত্তি স্থায়ীভাবে গেড়ে বসতে পারলে তবেই হয় (পাঠক যেন এই 'অহং'এর অর্থে আত্মম্ভরিতা না ভাবেন; এটা হ'ল পরিণত মন যৌন-প্রবৃত্তিকে যে অহং জয় করেছে)।

প্রথম দৃশ্যেই একজনের মধ্যে প্রাণরস আর অতি-অহং এর ভাব বিনিময়।

"রাজপুত্র। আর তো চলছে না বন্ধু।" (এই স্থাবরাবস্থা পরিবেশের চাপে সৃষ্ট)

নাটকের প্রথম সংলাপ হ'ল কোথায় যেন আটকে যাওয়ার ভাবের অভিব্যক্তি।

"সদাগর। কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন করে বলব" (অন্ধ আবেগ)। "কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, ... ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।" এই অকারণ আনন্দ প্রাণের অন্ধ আবেগ।

"সদাগর। আমরা যে সোনার খাঁচায় থাকি দানাপানির লোভে।" পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে শৈশব নির্ভরই হ'ল সোনার খাঁচা। আর দানাপানি সে কি বিনা আয়াসে লভ্য কোনও বস্তু (আত্ম-প্রীতির মোহ ?)।

"রাজপুত্র।......নৈবেদ্যের বাঁধা বরাদ্দ; কিন্তু ভোগে রুচি নেই" (অহং এর কাতরোক্তি)।

"সদাগর।......ভাগ্যিস বাঁধা বরাদ্দ। বাঁধন ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়।" পাছে অদসের বাড়াবাড়ি হয় তাই অতি-অহং এর ভয়। প্রাণরসের বাড়াবাড়িতে আত্ম-বিধানের ভয়। বাইরের বিধান যখন আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনই ব্যক্তির মনে আত্ম-বিধানের সৃষ্টি।

"রাজপুত্র।......আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে" (বেড়াজাল কথাটার মধ্যে নিজেকে একটা বদ্ধ, অকর্মণ্য বা পঙ্গু ভাবার মনোভাব আছে। এ পঙ্গুভাব অহং এর প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে। এ মনোভাব পরের সংলাপে আরও প্রকট। "নিরাপদে খাঁচায় থেকে থেকে আমার ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে"। এ রাজসাজ বিধান (পিতার উত্তরাধিকার ও মাতার নিরাপত্তা—দুই মিলিয়ে বালক রাজকুমার)। বিধানের চাপে পড়ে প্রাণরস আর বিধানের টানাটানিতে অহং বাস্তবকে আরও আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তাই, রাজকুমারের কথা, "ঐ যে ফসল খেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে"। চাষী এখানে প্রাণের প্রকাশ। কল্পনার স্বর্গ।

এবারে পত্রলেখা আসছে। সে মনের কথা। এই চাপে সে নিজেকে গোপন রাখতে পারছে না। ইচ্ছা আর গোপন থাকবে না; তাকে দমন করা যাবে না। তাই এ গানে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গী আছে। আর আছে একটা কল্পনার প্রিয়বস্তুর কথা। তাই বাঁচার জন্যে ঘর ছেড়ে বাণিজ্যে যেতে হবে; বাহিরের জগতের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে একটা প্রাণরসের বেপরোয়া ভঙ্গী আছে, যেমন, "লক্ষীরে হারাবই যদি অলক্ষীরে পাবই।······মরবো না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালু তীরে······সাত রাজার ধন মানিক আমি পাবই"। 'সোনার বালুর তীর' ছেড়ে 'সাত রাজার ধন মানিক'এর আশা। সে মানিক হ'ল 'নবীনা', কিন্তু 'সোনার বালুর তীর' কোনটা? তারপরেই রাজমাতার প্রবেশ। এবার পরিষ্কার মাতৃবন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে আর এক নবীনার সন্ধানে যাবার ব্যগ্রতায় মন ভরে উঠেছে।

"মা।······আবার ছেলেমানুষ হতে চাস নাকি?" আবার সেই রক্তমস্তুতে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা নাকি? ধ্বংসাত্মক প্রাণের কাজ নাকি? কবির নিজেরই সংশয়। সেই নির্ভর আর জড়ত্ব-ঘেরা মাতৃগর্ভের অন্ধকারে।

"রাজপুত্র।······বুড়োমানুষের সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ-হাঁফিয়ে উঠেছে"। প্রাণরস (অদস্) বিধানের চাপে নিষ্পিষ্ট।

"মা। বুঝেছি বাছা,······তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি"। সে-অভাব অহং প্রতিষ্ঠার সুযোগের অভাব।

এইবার বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার (reality test) সময় এল। তাতে ইতস্ততঃ ভাব আছে. তার সঙ্গে বেপরোয়া ভাব। যথা: "সাগর উঠে তরঙ্গিয়া বাতাস বহে বেগে"। বাস্তবের অসুবিধে। তার পরেই বেপরোয়া ভাব। তা হ'ল প্রাণরসের: "যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাবো তো তবু"। তবু জড়তা নয়; "ভিটার কোণে হতাশমনে রইবো না আর কভু"। ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি কামনাকে খারিজ করে জড়তা এনেছিল; চাপা ইচ্ছের জোরে আজ প্রাণরস প্রচণ্ড প্রকাশের আবেগে বেরিয়ে আসছে। তারপর অহংএর প্রকৃত মূল্যায়ণের ভাবী সম্ভাবনা মনে উঁকি দিয়ে যায় "ভিখারী মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো"।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই রাজপুত্র আর সদাগর দুজনেই মাঝ সমুদ্রে ভরা ডুবি হয়ে এক ডাঙা থেকে আর এক ডাঙায় ভেসে উঠল। এখানে সমুদ্রে ডোবার সঙ্গে জন্ম, পুনর্জন্মের একটা সংযোগ আছে। ডোবা মানে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাওয়া। জীবনের এই ভাবনাটা সব সময় কৈশোরের একটা ভুলে-যাওয়া অবস্থাকে মনে করিয়ে দেয় (latency period)। যেমন: "রাজপুত্র। ···ভেসে উঠলেন আর-এক ডাঙায়। এতদিন পর মনে হচ্ছে, জীবনের নতুন পর্ব শুরু হ'ল"। তারপর সদাগরের কথা, "······যাই বল বন্ধু পুরোনোটা আরামের"। "রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে"। চাপা ইচ্ছের ক্ষোভ। "এটা বুঝলে না উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন"। এখানে যম সৃষ্টি করছে; সেটা পরের কথায় আরও পরিষ্কার। "সদাগর। রাজতিলক তো ললাটে নিয়ে এসেছো জন্মমুহূর্তে"। "রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষা-দানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে"। যম অর্থ 'সর্বভূতক্ষয়'—এই অর্থে ধ্বংসাত্মক

প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। আবার যম মানে 'কাল', অথবা 'শমন'—এই অর্থে কাল বলতে কালের সঙ্গে গতি ও তার সঙ্গে পরিণত হওয়া বোঝায়, আর 'শমন' মানে 'দমন' বলতে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির দমন বা বাসনার উপর অহং-প্রবৃত্তির দমন বোঝায়। তাই 'যম' অর্থে দমন এখানে গ্রহণধারা। তাই নতুনের সন্ধানে অহং পা বাড়িয়েছে, "নাম-না-জানা প্রিয়া নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া"। অহং-প্রীতি বস্তুর উপর আরোপ করা হলেই বস্তু-প্রীতি জাগে। এখানে কল্পনায় সেটা নাম-না-জানা প্রিয়ার উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আত্মরক্ষনশীলতা আর বংশ (জাতি)-রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব মূলের কথা। ধ্বংসাত্মক মন এ দুটোকে এক না করে উলটে এদের যোগাযোগ ছিন্ন করে; আত্মপ্রেম আর বস্তুপ্রেমের দ্বন্দ্বেরও সে একই কথা। এখন নিজেকে আর অপরকে একসঙ্গে বাঁধবার ইচ্ছে রাজপুত্রের, কিন্তু সদাগরের এতে তত সায় নেই। একদিকে অতি-অহংএর চাপ যা পারিপার্শ্বিকতা আর বংশ ঐতিহ্যের দ্বারা তৈরি, তার সঙ্গে অহংএর বস্তুপ্রেমের একাগ্রতার দ্বন্দ্ব। তাই রাজপুত্রের অপর দেশ বা তাসের দেশের সম্বন্ধে আগ্রহে সদাগরের বিরক্তি। রাজপুত্র চায় প্রাণের কাঁচা রূপটা বার করতে; তাতে সদাগরের বেশে বিধানের আপত্তি।

আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই তা হ'ল দুটি বিধানের মধ্যে যদি মতের মিল না থাকে তা হলে তাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ অতি-অহং আর অদসের টানাটানির মাঝে যে অহং বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে মনের মধ্যে থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ে; তাই দুটি অতি-অহং পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে না। যেমন কালী-ভক্ত আর কৃষ্ণ-ভক্ত; শাক্ত আর বৈষ্ণব। দুটো ভক্তির মানসিক ক্রিয়া এক হলেও দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য অনেক। তাই সদাগর তাসের দেশের তাসেদের উপর বিরক্ত। তাই যে আগে বলেছে, "বাঁধনটা ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিতে হয়," সেই আবার পরে ব্যঙ্গ করেছে, "আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই"? তাসেরা অত্যন্ত চাপা-ইচ্ছের কারণে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বা আবিষ্টমনা; তাদের আচ্ছন্ন চিন্তায় তাই যে কাজ তা সুস্থমনের লক্ষণ নয়। যেমন, 'তোলন নামন, পিছন সামন, বাঁয়ে ডাইনে চাই নে"। সহজভাবে বাঁয়ে ডাইনে চাওয়াও সম্ভব নয়। উৎকণ্ঠাসঞ্জাত বাধ্যতামূলক কার্যকলাপ প্রাণরসের অতি বেশী অবদমনেরই ইঙ্গিত দেয়। তারপরেই প্রাণরস আর আত্মবিধানের দ্বন্দ্ব আরও ফুটে ওঠে। "ছক্কা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমদের, চালটা নেই"। "সদাগর। আর, তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটাই নেই"? 'চাল' হ'ল অতি-অহং আর 'চলন' হ'ল অদস্।

সদাগরের মনোভাব তাসেদের মধ্যে আরও প্রকট। "ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা"? "রাজপুত্র। আমরা বিদেশী"। "পঞ্জা। বাস্। আর বলতে হবে না। তার মানে তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই"। যা নেই তা সবই বিধান বা অতি-অহংএর গুণ। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য তখন হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজ এই রকমই পংক্তিহীন; আবার ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ হিন্দু আচারের দিকে সেভাবেই সদাগরের হাসির মতন ব্যঙ্গে ভরা। অর্থাৎ তাস ও সদাগর। এটাই আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন মনোভাব আর দাস মনোবৃত্তির সংঘাত)।

তাসেদের সৃষ্টি কথা ছক্কার সংলাপ হ'ল এই: "ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন সে হাই থেকে আমাদের উদ্ভব"। হাই তুললেন মানে সৃষ্টিকর্তা

অর্থাৎ সৃষ্টিকারী মন নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইল আর সেই হ'ল এই সব অস্বাভাবিক, অবাস্তব কাজের উৎস।

আর রাজপুত্রদের সৃষ্টি : "পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই......বিশ্ব কাঁপানি হাঁচি থেকেই...... উৎপত্তি।" এটা আধানশক্তি (cathexis) ; তাই গোড়ার কথা।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীকের সাহায্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি পরিস্ফুট। এইভাবে সারা তাসের দেশে স্বাভাবিক অহং প্রস্তুতির পথে। নীচে আরও কয়েকটা কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ দিয়ে আমরা তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করব।

১। গান। "আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,......অদ্ভুত। আমরা বেড়া ভাঙি......যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।"

২। রাজপুত্র। "বেড়ার নিয়ম ভাঙলে পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।"

৩। "এই নাও ভুইকুমড়োর ডাল একটা করে।" "... . কেন।" "চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ করে, খবরদার বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ো না।"

৪। "এদেশে যা দুর্লভ, তাই এনেছি।" "সেটা কী শুনি।" "উৎপাত।" শুনলে তো, রাজাসাহেব, (বৃটিশ শাসনে রায়সাহেবের প্রতি বক্রোক্তি নয় তো?)......লোকটা এগোতে চায়,"

৫। (রাজকুমারীদের কাছে রাজপুত্রের গান করে আবেদন) "ওগো, শান্ত পাষাণ মুরতি সুন্দরী, চঞ্চলের হৃদয়তলের রক্ত রবি। কুঞ্জবনে এসো একা," "রাণী। এ কী অনিয়ম, এ কি অবিচার!" (নিজের মনের শৈশব আসক্তি নয় তো? তাই রাণীর মুখ দিয়ে প্রথম প্রতিবাদ?) "পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন ওকে নির্বাসন!" অতি-অহংএর বাঁধন ছিঁড়ে যাবার ভয়। তারপর রাণী বললেন, "না নির্বাসন নয়।" টেক্কাকুমারীরা একে একে বলল, "না নির্বাসন নয়।" ছেলেবেলার ভালবাসা পরিণত হবার সমর্থন পেলে।

৬। (এইবার অতি-অহংএর চাপ প্রাণরসের আবেগে ভেসে গেল)। "রাজা।...বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?" "বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে" (অবচেতন) "আমরাও চালিয়ে থাকি—দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।" "টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।"

৭। "গোপাল। এ কী হ'ল। হায় কৃষ্টি ....." "রাজা। সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।" মনের গতির এই অদস্প্রাধান্য অতি-অহং রক্ষীর মতন নিজেকে বাঁচাবার খাতিরে চিন্তাকে থামিয়ে দেয়। প্রাণের রসধারা রক্তমন্তর জোর—সেই অদস্ উঠে আসছে। বাধা ভেঙে যাচ্ছে।

৮। (তৃতীয়ে দৃশ্যে তাসরমণীদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগছে।) "চিড়েতনী।......তোমাদের তাসিনী হয়ে মরার চাইতে মানবী হ'তে পারলে বেঁচে যেতাম।" 'তাস' এখানে মানুষের স্বাভাবিকতার বিকৃতরূপ। এগুলো ধরা পড়েছে অহংএর জাগার সঙ্গে সঙ্গে।

৯। চতুর্থ দৃশ্যে তাসেদের সাজ খসে পড়ছে। "হরতনী। সাজবদল করেছো, আমারই মত। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়?" রুইতন। মনে হচ্ছে পর্দা খুলে গেছে, চাঁদ থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ।" তারপর স্বাভাবিক মন ফিরে আসছে। অতীতের স্মৃতি মনে আসছে। "রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলে ছিলুম কী করে তাই ভাবি।"

তারপর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির উপর 'ইরস্' বা সৃষ্টিকারী কামনাত্মক মনের লড়াইয়ের ছবি। "রুইতন। দেখো হরতনী, মন ছটফটিয়ে উঠছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে"। বারবার মিলনাত্মক ইচ্ছাকে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি সরিয়ে দেওয়ার ব্যথা। তারপর দহলার উপস্থিতি বাধার মূর্তিতে। "ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া শোওয়াবসার কোটকেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী।" "দহলা। চুপ।" "ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করবো না চুপ"। প্রাণ ছক্কায় পঞ্জায় কথা কয়ে উঠতে চাইছে। "দহলা। ভয় নেই?" "·· নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী"। "অর্থ নেই। নিয়ম।" "যদি নাই মানি?" "অধঃপাতে যাবে।" "যাবো সেই অধঃপাতেই।" লড়াই সমস্ত আড়াল ঘুচিয়ে মনের মধ্যে আরও স্পষ্ট।" অতি-অহংএর অস্বাভাবিকতায় যে শান্তি বা তৃপ্তি তা শান্তি বা তৃপ্তির ভান তাই হরতনীর কথা (যার সঙ্গে কবি একাত্মীভূত সজ্ঞানে হয়েছেন); "আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মত। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।" দহলার শান্তি তার কথায় "অতল স্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগরের মত"। (যেটা একটা 'বৈষ্ণবী মায়া, তমঃগুণের আকর বা অতি-অহংএর তৃপ্তি)। তারপর আসছে আত্মগ্লানি: ছক্কা। একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি'।" "দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচি নেই।" তাসেদের সংলাপের মধ্যে আত্মগ্লানি আর ধিক্কার আরও সহজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাওতো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়।" মন মুক্তির পথে, সমস্ত চাপ সরে যাচ্ছে, "সকলে। দোষ নেই। টিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে"।

এইবার অবদমিত ইচ্ছের প্রকাশ সব কিছু যাতনা বাধা উড়িয়ে দিল। "ছক্কা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে ইচ্ছেমন্ত্র নিয়েছি"। যে ইচ্ছে ছাড়া পেতে চায় আর যে ইচ্ছে বাধে, এই দুই বিপরীত ইচ্ছেই মনের কাছে ধরা পড়েছে। দমন করছে যে-ইচ্ছে আর দমিত হচ্ছে যে-ইচ্ছে তাদের মধ্যে মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই আত্মজ্ঞানের সিংহদ্বার।

"ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে, সেই দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
"বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে॥" ইচ্ছে বাঁধন ছেড়ে আবার বাঁধন পরে।
"রাজা।···হঠাৎ এমন হল কেন।" "ইচ্ছে"।

সে-ইচ্ছে যে কোথায় তা বুঝতে আর কোনও ফাঁক নেই: "রাণী।······এই অপরাধটাই সবচেয়ে বড় সম্ভোগের জিনিব।" "রাজা। শাস্তির জিনিষকে বললে ভোগের জিনিষ। তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ?" "রাণী।······শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষাভোলার সময়

এসেছে"। (রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা শাসকের স্তোকবাক্য আর মনোজগতে অতি-অহং‌এর কারণে বাধার দ্বারা ব্যাহত সহজ ইচ্ছার ছদ্মরূপ)।

"রাণী।……স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়"। স্বর্গ হ'ল মনের বাসনা কামনা যাকে অপরাধ বলে চেপে রাখা হয়েছে। রাণীর মাধ্যমে প্রথম দৃশ্যের বা শেষদৃশ্যে নবীনারূপে রাণী হ'য়ে ফিরে এল। অসহায় রাজকে রাজপুত্র সান্ত্বনা দিলেন যে রাজার মানুষ হতে পারার সম্ভাবনায় সন্দেহ আছে। কিন্তু রাণী আছে তোমার সহায়। জয় রাণীর"। "বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও… ·" বলে "বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।"—রূপে প্রাণরসের আবেগ বেরিয়ে এল, আর এল অহং‌এর সাহস "মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।"

মদ খেতে খেতে কোনও মাতালের পরিবর্তনের ইচ্ছে আসে না। তাই যৌনাবেগ বা ভোগের পথে অহরহ তৃপ্তি পেলে মানুষ আজকের সভ্যতায় পৌছতে পারত না। অহংপ্রবৃত্তি সব সময়ে যৌন-প্রবৃত্তির উপর জয়ী হয়ে সভ্যতার সবশ্রেষ্ঠ অবদানগুলোকে সম্ভব করেছে। যদি তা না হয়ে মানুষ বিনা-বাধায় এগিয়ে যেত তো বহির্জগতের সংঘাতে তার চেতনার স্ফূরণ হ'ত না; সে আজকের এই স্তরে কখনও পৌছতে পারত না। প্রখ্যাত মনীষীদের চিন্তাধারায় সহজেই তা ধরা পড়ে; তাই তাঁরা বিশ্ব প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের এই অহং-প্রবৃত্তি ইচ্ছের জয়গান গেয়েছে যেখানে আর একজন মনীষী এই 'অহং-এর আর একটা রূপ দেখিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে; মানুষের মস্তিষ্ক কিসের জন্যে? যদি শুধু হাত-পাগুলোকে নাড়াবার জন্যেই তার দরকার হ'ত তা হলে তো একটা ইঁদুর মানুষের মস্তিষ্কের আধখানারও কম মস্তিষ্কের মালিক হয়ে সুন্দরভাবেই তা করতে পারে। শুধু চলা নয়; কেন চলা, কিসের জন্য চলা তাও জানা দরকার। তা না হলে চলার অন্ধ আবেগে মানুষ নিজে নিজেকে ধ্বংস করবে। বার্ণার্ড শ'-এর এই বক্তব্য অহং‌এর না অতি-অহং‌এর তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এঁরও জীবনে অহং-প্রবৃত্তিকে অনেক কষ্টে যৌন-প্রবৃত্তিকে জয় করতে হয়েছিল।

বিবাহ

(১)

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.*

আমাদের দেশে "বিবাহ-বন্ধন" কথাটা প্রচলিত আছে। এই বন্ধন কিসের বন্ধন? বিবাহ দিয়া বা বিবাহ করিয়া মানুষ কি মানুষকে বাঁধিয়া ফেলিতে চায়? একদিক হইতে দেখিলে কথাটা সত্য মনে হইবে। বিবাহের দুইটি প্রধান দিক আছে। একদিকে আছে প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর সুবিধা, যেমন ঘরকন্না ও অন্যান্য প্রয়োজন, সন্তান প্রজনন, সন্তান পালন ইত্যাদি; আর অন্যদিকে আছে মানুষের ভাল লাগার ও ভালবাসার দাবি পূরণ। আমরা নিজের মনের সাধ, আশা, ইচ্ছা, মন খুলিয়া একজনের নিকট বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে তাহার কথা শুনিয়া সুখী হই; আমার কথা শুনিবার, আমার জন্য ভাবিবার, আমার জন্য করিবার, আমার নিজের বলিয়া দাবি করিবার, ভালবাসিবার, একান্ত নির্ভর করিবার মত কেহ আছে এই বোধ আমাদের তৃপ্তি দেয়। আমাদের এই চঞ্চল পৃথিবীতে, সংসারের সদা পরিবর্তনের স্রোতে চলিয়াও আমরা কেন এমন আশ্রয় চাই সে-প্রশ্নের আলোচনা এ-প্রবন্ধে করিব না। আমরা যে এই সকল মানসিক সুখ চাই এবং তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করি সে-সম্বন্ধেও আর বিস্তৃত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মানুষের প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধ, অনেকের একত্রে বাস করিবার আবশ্যকতা বোধ হইতে ক্রমে জাগে। অনেক মানুষ কাছাকাছি বাস করিতে থাকিলে তাহাদের চলাফেরা, আচারব্যবহার, ক্রমে ক্রমে বিশেষ নিয়মাধীন করিবার বিশেষ দরকার হয়। তাহা না হইলে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, কাটাকাটি, ও স্বেচ্ছাচারের ফলে জীবনের সুখশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হয়। আমরা সুখী হইতে চাই বলিয়াই সুখের পথে বাধাগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা একদিকে যেমন করি, অন্যদিকে নিজের ভোগ মিটানোর সহজ সুখের পথে বাধা দিয়া তাহা নিয়মে বাঁধি অথবা সেই সুখটাকেই বদলাইয়া দিতে চেষ্টা করি। বিবাহ এই রকম এক বিশেষ নিয়ম।

মত বিশেষে পুত্র-লাভের জন্যই বিবাহ করা প্রয়োজন বলা হইয়াছে। প্রজননই বিবাহের একমাত্র প্রয়োজন না হইলেও, ইহা যে এই প্রথার প্রধান ও মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে 'পুত্র-লাভ' কথাটা পুরুষ-প্রধান সমাজ নিয়মের অঙ্গ হিসাবে দেখা চলে। কিন্তু যে-সমাজ নারী-প্রধান বা যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার নিকট হইতে কন্যার পাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে সেই স্থানে পুত্র হইতে কন্যা লাভের ইচ্ছা বড় হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য, কর্মজীবনে পুরুষ ও নারীর নিজ নিজ কতকগুলি বিশেষ রকমের কার্য আছে; যাহা একের তাহা অপরশ্রেণী দ্বারা করা সম্ভব হয় না। পুরুষের করণীয় কার্য হইলে পুরুষ, আবার নারীর করণীয় হইলে নারীই প্রয়োজন হয়। এই প্রশ্ন বাদ

* মনঃসমীক্ষক, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতি, লুম্বিনি পার্ক (মানসিক হাসপাতালের) অধিকর্তা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার অবৈতনিক উপাধ্যায়।

দিলেও সন্তান-প্রজননের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয়। তাহা না হইলে সামাজিক বিশেষ রূপ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বর্তমানে যে-সমাজরূপ চলিতেছে, তাহাতে পিতার পরিচয় সন্তানের প্রয়োজন হয়। যে-সমাজে এক নারীর একাধিক স্বামী রাখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই সমাজেও সন্তানের পিতৃত্ব স্থির করিবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও অনুষ্ঠান ঠিক করা থাকে। এক শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীর মতে মানুষের সভ্যতার কোনও এক স্তরে গোষ্ঠী-বিবাহ প্রথা বর্তমান ছিল। অর্থাৎ এক সমাজের সকল পুরুষ সেই সমাজের সকল নারীকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে ও সেই রকম আচরণ করিতে পারিত। সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিয়ম বদল হয়। অতীতের অনেক নিয়ম আজও অপ্রয়োজনে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি সত্য, কিন্তু অনেক নিয়মই আবার ভাঙ্গিয়া বদল করিয়া বা বাদ দিয়া নূতন নিয়ম গড়িয়া সমাজের রূপ বদল করিয়াছি। এই কিছুদিন হইল আমাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহের নিয়মের চলন হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজের অনেক পরিবর্তন হইতেছে। এই রকমই সময়ের দাবিতে নিয়মের পরিবর্তন হয়। কিছুই চিরকাল স্থির থাকে না।

পুর্বে যে কথার উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে আমরা কত বিভিন্ন কারণে বিবাহিত জীবন যাপন করি। শুনিতে পাই কোনও কোন০ পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেকের পক্ষেই প্রকৃত ঘর-সংসার পাতিয়া জীবনযাপন করা আর সম্ভব হয় না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই জীবিকার জন্য কাজ করেন। নিজের বাড়িতে রান্না খাওয়ার পর্ব প্রায় নাই। বাহিরের খাদ্য-প্রতিষ্ঠানে তাহা সমাধা করিতে হয়। সন্তানের পরিচর্যার জন্যও প্রতিষ্ঠান আছে। সেইখানে সন্তানকে রাখিয়া পিতা মাতা নিজ নিজ কাজে চলিয়া যান। সন্তান একটু বড় হইলেই তাহাদের আবাসিক শিক্ষালয়ে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় সন্তানের সহিত পিতামাতার প্রয়োজনের ও আবেগের সূত্র শিথিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজেও এই রীতির সূত্রপাত হইয়াছে। টাকা দিলেই অন্যে যদি আমার হইয়া সন্তান-পালন করিয়া দেয় তবে পারিবারিক বাঁধন ক্রমে শিথিল হওয়াই স্বাভাবিক। নিজেদের ভোগ মিটাইবার অবসর বাড়াইবার জন্যও এই প্রথার চলন হইতেছে। অনেক বিত্তশালী বনিয়াদী পরিবারে বহুকাল হইতেই সন্তান-পালনের ভার আয়া বা ঝি চাকরের উপর মূলতঃ ন্যস্ত থাকে। এমন কি শোনা যায়, শিশু মাতৃস্তন্য পান করিবার সুযোগও পায় না। এই প্রকার সমাজ বা পরিবারে সন্তান-পালনের প্রকৃত প্রয়োজন না হইলেও, অন্যান্য নানান কারণে বিবাহপ্রথা বজায় আছে।

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনোবিদের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখিলে নানা কথা বলিবার আছে। যে সমাজ-নিয়ম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, মনে রাখিতে হইবে সেই সকল নিয়ম নিজেদের প্রয়োজন-বোধে আমরাই সৃষ্টি করি। সমাজ আমরা যেমন প্রয়োজনের তাগিদে গড়ি, তাহার নিয়মও আমরা নিজেদেরই নানা প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করি। অবস্থানুসারে এক সমাজে যেমন পুরুষের পক্ষে একাধিক নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার নিয়ম চলে, অন্য সমাজে তেমনই এক নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ করার নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান জগতের ধারা ক্রমেই এক পুরুষের একজন মাত্র স্ত্রী এবং এক নারীর পক্ষে একজন মাত্র স্বামী থাকার নিয়মের দিকেই চলিয়াছে। আইন করিয়া একসঙ্গে বহুবিবাহ করিবার প্রথা আমাদের দেশে সম্প্রতি লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দেশের কোনও কোনও অনুন্নত উপজাতিদের (tribal) মধ্যে এখনও বহুবিবাহ প্রথার চলন আছে। ক্রমে তাহাও লোপ পাইবে ; সমাজের চাকা সেই দিকেই ঘুরিতেছে। মহাযুদ্ধ বা

অন্য কোনও কারণে দেশের লোকক্ষয় যদি কখনও অতিমাত্রায় দেখা দেয় তখন সমাজে আবার সাময়িক বিকল্প ব্যবহার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। শোনা যায় বিগত মহাযুদ্ধের পরে লোকক্ষয়ের ফলে ইউরোপের দেশগুলি যখন জনবলের দিকে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং দেশের নানান কাজের জন্য লোকবল কম হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কোনও কোনও দেশে বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানলাভের প্রথাও, আইনের দৃষ্টিতে না হইলেও, সমাজের সমর্থন পাইত। রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারি ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় এইরূপ বিবাহবন্ধনহীন সমাজ-বিগর্হিত প্রজনন সমাজ মানিয়া লইয়াছে; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ বিবাহপ্রথা সমাজের সাধারণ নিয়ম হইলেও, অসাধারণ অবস্থার ফলে এই সাধারণ নিয়মের পরিবর্তন হয়। মানুষ এ বিষয়ে যে-মতই পোষণ করুক, নীতির দিক হইতে ইহাকে যে আখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, তবু ইহা সত্য।

কেবল ঐ বিপর্যয়ের সময়ের কথাই বলি কেন? সমাজবিজ্ঞানীর কথা বাদ দিলেও, সমাজের খবর যাঁহারা রাখেন, মানুষের গতি-প্রকৃতির হিসেব যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই জানেন যে নরনারীর যৌনমিলন, সমাজের স্বাভাবিক সহজ অবস্থাতেও, বিবাহের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। নীতি যত প্রবলই হউক, শাসন যত প্রচণ্ডই হউক, মানুষের কামপ্রবৃত্তি সকল বাঁধন ভাঙ্গিয়া চলে। কোনও বিশেষ সমাজে, বিশেষ সময়ে ইহার মাত্রার কমবেশী হইতে দেখা গেলেও, সর্বকালেই মানুষ এই ভাঙ্গনের পথে কমবেশী চলিয়াছে। আমাদের প্রবৃত্তির স্বভাবই এই। সেইজন্যই তাহার গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির মুখে নিয়ম ও নীতির বাঁধনের লাগাম পরাইতে হইয়াছে। এই প্রবৃত্তিকে একটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার জন্যই নিয়মের প্রয়োজন। এই জন্যই বিবাহকে বন্ধন বলা চলে। ঘর-ভাঙ্গা স্বভাবটাকে ঘরে বাঁধিবার এই এক রকমের প্রথা।

মনঃসমীক্ষকের মতে মানুষ স্বভাবতঃই polygamous অর্থাৎ বহুগামী। তাহার কামপ্রবৃত্তি একের সংসর্গে পুর্ণতৃপ্ত হয় না। সমাজের তাড়নায় অনেকে একের সঙ্গ লাভ করিয়াই জীবন কাটায় এবং মনে করে তাহাতেই সে তৃপ্ত। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে গেলেই তাহার বহুগামিতার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আবরণে যাহা পুজা পায় সেই প্রবৃত্তির অনাবৃত রূপটা একেবারেই ভিন্ন হইতে পারে। একদিকে আমার প্রবৃত্তির বেগ আপন পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া ফেরে, অপর দিকে আমার অহংকার, সমাজবোধ, নিয়মপালনে গর্ববোধ করে। এই দুইয়ের লড়াই অবিরাম আমাদের মনে চলিতেছে। নিজেকে নিয়মানুবর্তী বা নীতিধর্মী বলিয়া মনে করিবার মধ্যেও আমাদের অহংকারই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। নিজের প্রবৃত্তি ও বাস্তব অবস্থার সুষ্ঠু বিচার অতি অল্প সংখ্যক মানুষই করিতে পারে। কিন্তু যে পারে তাহার জন্য কোনও নীতির বাঁধনের আর আন্তর প্রয়োজন থাকে না।

পুর্বে প্রকাশিত "নীতি" প্রবন্ধে এই বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এখানে করিব না। এই লড়াই চলে বলিয়াই আমাদের নিজেদের মনকে নানা রকমে ফাঁকি দিয়া চোরা পথে, মন আপন প্রবৃত্তির চাহিদা কিছু কিছু মিটাইয়া লয়। আমাদের জীবনে নানান সাহিত্য ও শিল্পসঙ্গীত ইত্যাদি রসসৃষ্টি, খেলাধুলা, অপরাধ এবং কাজের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন ও মানসিক রোগলক্ষণই তাহার প্রমাণ দেয়। অর্থাৎ আমাদের প্রবৃত্তি বাঁধন সম্পূর্ণ মানে না। আমরা এই প্রকার স্বভাব ও প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্ট মানুষ; তাই ইহাদের লইয়া কোনও কিছু গড়িতে গেলে, কোনও বিশেষ রূপ দান করিতে হইলে যথাসম্ভব কিছু কিছু বাঁধন দিতে হয়। রূপ দিতে গেলেই রেখার বন্ধনী দরকার। বিবাহপ্রথার মধ্যেও সেই বন্ধনীই কাজ

করিতেছে। ধর্ম, নীতি, প্রেম, সত্য, নিষ্ঠা ইত্যাদির দোহাই দিয়া এবং একটা অপ্রকৃত মর্যাদা দিয়া, এই বাঁধন রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "বাঁধন ছেঁড়ার সাধন" মনের যে-প্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রবৃত্তিকে বারে বারে নানাভাবে বাঁধন পরাইবার কৌশল ও দোহাই আমাদের মনেরই অপর এক চেষ্টা।

বলিয়াছি নিয়ম পালন করিয়া আমরা গর্ববোধ করি। জন্মের পর হইতেই শিশুকে নানাপ্রকারে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়বিলাসের নানান প্রকরণ ও কামক্রোধলোভ ইত্যাদি রিপুগুলির সহজ প্রকাশকে নিন্দনীয় বলিয়া শিক্ষা দিই। এই শিক্ষা যখন সে পালন করে তখন তাহাকে বাহবা দিই, আদর করি, তাহার গুণগান করি। ইহাতে তাহার গর্ববোধ হয় এবং সে যে সুশিক্ষিত হইয়াছে, প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া চলিতে পারে এই বোধে তাহার অহংকারও তৃপ্ত হয়। আমার নিজ সম্বন্ধে সম্মানবোধও ইহার সহিত যুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে যাহা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি তাহাদেরই আমরা আমাদের রিপু বা শত্রু বলিয়া মনে করিতে শিখি। ইহার ফল সকল সময় বা সকলের পক্ষে সম মাত্রায় ভাল হয় না। নানাপ্রকার মানসিক বিকারও ইহার ফলেই দেখা দিতে পারে।

কোনও বস্তু আমার বলিয়া মনে করিবার বা প্রচার করিবার মধ্যে যেমন একটা ঐশ্বর্যের গর্ববোধ থাকে, একজন মানুষকেও আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান ইত্যাদি বলিয়া "আমার" সঙ্গে যুক্ত করিয়া সেই প্রকার অধিকারেরই গর্ব আমরা বোধ করি। ইহা আমার "আমি-বোধকে" বড় করে, গৌরব দেয়। স্ত্রী পুত্রকে "আমার" বলিয়া আমার যে-গর্ববোধ তাহার সহিত স্ত্রী পুত্র আমাকে তাহাদের আপন বলিয়া মনে করে এই বোধেও আমার অহংবোধ স্ফীত হয়। বিবাহপ্রথার নানান মহান ব্যাখ্যার আড়ালে আমাদের এই বোধটাও তৃপ্ত হয়।

আবেগের দিক হইতে দেখিতে গেলে আমরা ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া তৃপ্ত হই। ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি এ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। পরে এক পৃথক প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ভালবাসার মধ্যেও ভোগ চরিতার্থতা আছে। বাস্তবে যে-ভোগ তৃপ্ত হইতে পারে না কল্পনার বিলাসে আমরা তাহার আংশিক পূরণ খুঁজি। কল্পনা করিতে হইলেও কিছু আশ্রয় দরকার। কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের সব রসসৃষ্টিই যে ঐ কামনা তৃপ্তির পরিচায়ক সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। যাহাকে ভালবাসিলাম মানুষ হিসাবে সে উপলক্ষ্য মাত্র। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার মন তাহাকে মনের কল্পনায় মিশাইয়া নূতন এক রূপে সৃষ্টি করিয়া লয়। বস্তুতঃ সেই কাল্পনিক সৃষ্টিকেই আমরা ভালবাসি। যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার মনের চাহিদা মিটাইবার সুযোগ পাইলাম সে আমার কাম্য হইয়া উঠে। ভালবাসা মনের এই এক রকমের বাঞ্ছিত বিলাস। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে এই সত্য ধরা দিয়াছে ; তাঁর ভাষায় "অর্ধেক রমণী তুমি অর্ধেক কল্পনা"। পুরুষও অনেকখানিই নারীর দৃষ্টিতে তাহারই নিজ মনের কল্পনার সৃষ্টি। ভালবাসায় আমরা সেই স্বপ্নমাখা চোখে প্রিয়ের দিকে তাকাই। নিজেও তখন কিছুটা স্বপ্নঘোরে অবাস্তব হইয়া যাই। নিজেকেও কল্পনায় নূতন করিয়া গড়িয়া তুলি। ভালবাসায় পাত্রপাত্রী উভয়েরই এই অবাস্তব স্বপ্নবিলাসের পালা চলে। প্রবৃত্তির সহজ পূরণ যেখানে সম্ভব হয় না, সেই সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যেও আমরা কল্পনায় এক অশরীরী লোক সৃষ্টি করিয়া অথবা নানাপ্রকারের উদ্গাতির (sublimation) সাহায্যে নিজ প্রবৃত্তির আংশিক পূরণ সম্ভব করিয়া লই। কাব্য সাহিত্যে, প্রেমে আমরা প্রচলিত সমাজবিধানকে অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়া দিতে আপত্তি করি না। যাহাকে চাপিয়া একেবারে সম্পূর্ণ বধ করা যায় না তাহাকে প্রকাশের কিছু সুযোগ না দিলে তাহা

এক সময় ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মত সমাজজীবনকে ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতে পারে। মন মানে না বলিয়াই তাহাকে ভোগ করিবার কিছু সুযোগ দিতে হয়। এই সব প্রকাশের বা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথ খোলা আছে বলিয়াই আজও সমাজ-বন্ধন বজায় থাকা সম্ভব হইয়াছে। মুখে আমরা যতই নীতি বা ধর্মের দোহাই দিই, বা বড়াই করি না কেন মনের গভীরে আমাদের তাহার বিপরীত প্রবৃত্তিগুলিও সজোরে কাজ করিতে থাকে। পতি পরম গুরু এই সূত্র অতি প্রবল হইয়া প্রবৃত্তির সহজ গতিকে যখন পিষিয়া মারিতে বসে তখনই ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিরোধী শক্তি ক্রমে প্রবল হইতে থাকে। ইহারই পরিণামে এক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা আইন ও নীতি সংগত হইয়া গৃহীত হয়। তখন এক পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে বাধে না। বয়স, দেহসৌষ্ঠব ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য বজায় থাকিলে একাধিকবার পতি বদল করা বা পত্নী বদল করা বর্তমান সমাজে সম্ভব হইয়াছে। এই নিয়ম গ্রহণের ফলে প্রবৃত্তি যেমন আংশিক পুরণের সুযোগ পাইল অপর দিকে সামাজিক নিয়মও মানিয়া চলা হইল। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে মানিতে হইবেই এমন অবস্থা দেখা দিলে সেই অবস্থাকে আইনের বা নীতির সূত্রে বাঁধিয়া সুযোগ করিয়া দিতে পারিলেই সমাজ বাঁচিতে পারে। তাহা না পারিলে সমাজে ভাঙ্গন ধরে, বিকার দেখা দেয়। সুতরাং কেবল বাঁধ বাঁধিলেই হয় না, সে-বাঁধন প্রয়োজন মত অন্ততঃ আংশিক খুলিবার ব্যবস্থাও রাখিতে হয়। আজকাল ভারতের অনেক নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সে-বন্ধন যতই প্রবল করা হউক না কেন প্রয়োজন মত স্রোতধারাকে প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা তাহাতে না থাকিলে সে-বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে বা ব্যর্থ হয়।

কোনও জীবন্ত শক্তিকেই নিঃশেষে বাঁধিয়া রাখা যায় না। সমাজ বিবাহ প্রথা মানিয়া লইয়া আমাদের সহজাত অনেক প্রবৃত্তিকে যেমন শৃঙ্খল পরাইয়াছে তেমনই অপর দিকে আমাদের নাটক, নভেল কবিতা, চারু ও কারুকলার মাধ্যমে আমরা কাম প্রেম ইত্যাদির সামাজিক গণ্ডিবদ্ধ রূপের ও পরিসরের বাহিরের নানা বিলাস ও বিকাশকে আন্তরিক সমর্থন দিয়া গৌরবের স্থান করিয়া দিয়াছি। বিবাহিত নারী বা পুরুষ সেই সব রচনার পাত্রপাত্রীদের সহিত নিজের একাত্মতা (identification) অনুভব করিয়া তাহাদের কাম প্রেম হিংসা আক্রম ইত্যাদি প্রবৃত্তির আংশিক সার্থকতা লাভ করে। আমরা রসসৃষ্টির দোহাই দিয়া কল্পলোকে অতি সহজে সামাজিক বাধানিষেধ পার হইয়া নিজেদের প্রবৃত্তি কিছুটা মিটাইয়া লই। কেবল তাহাই নহে যে শিল্পী কৌশলে আমাদের এই নিষিদ্ধ সুখভোগ করিবার পথ করিয়া দেন তাঁহাকে পুরস্কৃত করি ও সামাজিক জীবনেও তাঁহাকে সম্মানিত করি। অর্থাৎ এক হাতে যাহা বাঁধি, অন্য হাতে তাহা খুলিয়া দিই। ইহাই জীবনের লীলা।

মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের নিয়ম একদিকে মানিয়ে চলে, আবার অপরদিকে সেই নিয়মই গোপনে বা একটু রং বদল করিয়া প্রকাশ্যে অমান্য করিয়া চলে। ইহাতে তাহার সামাজিক গর্ব খর্ব হয় না। ইহাই সাধারণ মানুষের চরিত্র। মানুষের মনের এই পরস্পর-বিরোধী শক্তির খেলা এবং দ্বন্দ্ব বৈপরীত্যের অসংখ্য প্রকাশ তার চরিত্রে এক বিশেষ বৈচিত্র দান করিয়াছে। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা সহজভাবে স্বীকার করি না। খুব কম মানুষই বাস্তব অবস্থা সহজভাবে দেখিতে ও স্বীকার করিতে পারে। অধিকাংশ মানুষের মনই দুর্বল। তাই বাস্তব সত্যকে তাহারা সহজভাবে দেখিতে ও স্বীকার করিতে এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে নিয়ম, কল্পনা, নীতি ও ধর্ম ইত্যাদির দোহাইয়ের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন চলিবার জন্য নির্ভরযোগ্য যষ্টি আর কিছু থাকে না।

কেবল যে মানুষের ভাগ্যেই এই দুর্বলতা বহন করিবার বোঝা চাপিয়াছে তাহা নহে। মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীতে দেবলোকেও নানান নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানেও দেবতাদের নানান বিধিনিষেধের বন্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যেও নিয়ম অমান্যকারী ইন্দ্রের দেখা পাওয়া যায়; তবু তিনি স্বর্গলোকে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইহাই স্বাভাবিক। মনঃসমীক্ষকের মতে স্বর্গ, দেবতা, সবই মানুষ নিজের মন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। আর যাহাই মানুষের সৃষ্টি তাহাতেই মানুষের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে ইহাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের মূল সহজাত কামপ্রবৃত্তিকে বাঁধিবার জন্য বিবাহবন্ধন প্রথার সৃষ্টি করা হইয়াছে; এবং এই বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই নিয়ম-পালনের সহিত সম্মানবোধ, গর্ববোধ ও অহংকার প্রভৃতি আমাদের মনের অন্যান্য কামনা-বাসনাগুলিকে মিশাইয়া দিতে হইয়াছে। অর্থাৎ এক রিপুকে বাঁধিবার কাজে আমরা নিজেদের অপর রিপুগুলির সাহায্য লইয়া চলি। আমাদের স্বভাবে যাহা আছে তাহা দিয়াই আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল কাজ মিটাইতে হইবে। আর পাইব কোথায়? আমরা সকল বিষয়েই সীমাবদ্ধ। আমাদের সকল শক্তিই সীমাবদ্ধ। আমাদের পক্ষে তাই সীমাহীন বা অসীমের সম্যক অনুভূতি যেমন সম্ভব নহে, অসীম হওয়াও তেমনই অসম্ভব। কিন্তু সীমিত বলিয়াই সীমার বন্ধনকেই প্রধান করিয়া গণ্ডি কেবলই ক্ষুদ্রতর করিতে থাকিলে, তাহাতে জীবনের সহজ সুন্দর প্রকাশ ব্যাহত হইয়া জীবন বিকৃত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ জীবনের প্রকাশের জন্য, রূপায়ণের জন্য যে পরিমাণে বন্ধন প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণেই মূল্য দিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। নিয়ম-পালনকেই প্রধান করিয়া তুলিলে জীবনের গতি স্তিমিত হইয়া ক্লেদযুক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহার পক্ষেই সে-বন্ধন সার্থক হইতে পারে; অপরের পক্ষে নহে। যে কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি সেই সকল ও অন্যান্য কিছু কারণের জন্যই বিবাহপ্রথাকে বন্ধন বলা যাইতে পারে।

যে সুখ-সুবিধার আশায় নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়িয়া মানুষ সামাজিক বিবাহবন্ধন মানিয়া লইয়াছে, বহুশত বৎসর সেই বন্ধন মানিয়া চলিবার অনুশীলন করিয়া বর্তমান মানুষ সুখী হইতে পারিয়াছে কিনা এবং কেনই বা সুখী হইয়াছে, অথবা বিবাহিত জীবনে সুখী না হইতে পারিলে কী কারণে সুখী হইতে পারে না, পরের প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

"সমীক্ষার পরীক্ষা"

দেবব্রত সিংহ, এম.এ., ডি.ফিল.*

গত দুই সংখ্যায় এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মনঃসমীক্ষণ তথা ফ্রয়েডীয় মতের বৈজ্ঞানিক মূল্য নিয়ে প্রশ্নের উপর বাদানুবাদ চলেছে। প্রথম প্রবন্ধে সাধারণ বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনঃসমীক্ষণের বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি তোলা হয়েছে। সে-আপত্তিতে একদেশদর্শিতা এবং অত্যুক্তি রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে ফ্রয়েডপন্থীর দিক থেকে এ আপত্তির উত্তরে প্রতিবাদ জানান হয়েছে। এ সম্বন্ধে তৃতীয় কোনও পক্ষের অবতারণা করছি না; মূল প্রশ্নটিকে আরও একবার বুঝে দেখবার চেষ্টা করছি।

মনঃসমীক্ষণের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, তার গোড়ায় আছে সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (scientific method) স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন। কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে বা থিওরীতে উপনীত হয়? এই প্রশ্নটি আলোচনা করে দেখা যাক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলসূত্র এক কথায় এ ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—'অনুমানের উদ্দেশ্যে উপগম' ('induction with a view to deduction')। রীতিবদ্ধ প্রত্যক্ষের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সামান্যীকরণের মাধ্যমে বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই থিওরীর সত্যতা নির্ধারণ করতে গিয়ে আবার প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যের উল্লেখ করতে হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সামান্য-সত্য থেকে অনুমিত বিশেষ-সত্যকে বাস্তব-তথ্যের নিরিখে পরীক্ষা করা হয়, বাস্তব-তথ্যের সমর্থনে সামান্য-সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করা হয়। একদিকে তথ্য থেকে সামান্যীকরণ, অপর দিকে তথ্যের সমর্থনের মারফৎ সামান্য-সিদ্ধান্তের পরীক্ষা; এই উভয়মুখী রীতি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের কয়েকটি যুগান্তরকারী আবিষ্কারের ফলে—বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে—বৈজ্ঞানিক চিন্তনে পূর্বতন স্বীকৃত এই পদ্ধতি সম্বন্ধে সংশয় উঠল।

সংশয়টা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সত্যতা-পরীক্ষার (verification) নীতি নিয়ে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যের সমর্থনের (confirmation) মধ্যে সামান্যীকৃত থিওরীর সত্যতা অনুসন্ধানের নীতি। কেবল তথ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে থিওরীর সত্যতাকে পরীক্ষা করবার এই সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি উঠল কোনও কোনও মহলে। অধিক থেকে অধিকতর তথ্যকে বা তথ্যরাশিকে ব্যাখ্যা করতে পারছে—কেবল এ দিয়েই কোনও থিওরীর সত্যতা নির্ধারিত হয় না। কোনও থিওরীকে গ্রহণ করে নিয়ে তথ্যের পর্যবেক্ষণ করলে তার সমর্থনে তথ্য আবিষ্কার করা কঠিন নয়; অনেক তথ্যের মধ্যেই এমন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যদি সমর্থন আবিষ্কার করাই বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য হয়। এজন্য সমর্থনের এই নীতিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার যথার্থ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে

* দর্শনশাস্ত্রের সহ-অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

আপত্তি তুলেছেন আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের কোনও কোনও প্রবক্তা। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক Karl Popper-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

তথ্য দিয়ে সমর্থনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মুখ্য নীতি স্বীকার না করে বরং খণ্ডনযোগ্যতাকেই (refutability) বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ণয়ের মান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। অধ্যাপক Popper প্রত্যক্ষ দ্বারা সমর্থনের চেয়ে খণ্ডিত হবার সম্ভাবনার উপরেই জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত তথ্যপুঞ্জের ভূমিকায় এমন কোনও ঘটনার পূর্বাভাস উপস্থিত করা সম্ভব হবে যা প্রত্যক্ষীভূত তথ্যের বিরুদ্ধগামী হতে পারে। কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে যথার্থ পরীক্ষা করতে হলে তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার প্রচেষ্টা দিয়েই শুরু করতে হবে। এক কথায় খাঁটী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত বা মূলসূত্র সমর্থনের চেয়ে তার খণ্ডনের সম্ভাবনার দিকেই লক্ষ্য থাকবে।

এখন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে এই সাধারণ আলোচনার ভূমিকাতে ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণের মূল্য বিচার করা যেতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে উল্লিখিত প্রথম প্রবন্ধে লেখক Popper-এর মতেরই পুনরালোচনা করেছেন বলে মনে হয় (যদিও তার উল্লেখ প্রবন্ধে নেই)। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পর্যালোচনায় বিশ্বাসের (faith) যে কোনও চূড়ান্ত স্থান নেই সে-কথা Popper বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে শেষপর্যন্ত কার্যকর প্রকল্প (hypothesis) বা বড়জোর অস্থায়ী বিশ্বাস হিসাবে গণ্য করতে হবে; তার অতিরিক্ত কোনও স্থায়ী চূড়ান্ত বিশ্বাস হিসাবে নয়। "নির্জ্ঞান" (the unconscious) দিয়ে ফ্রয়েডের যে সিদ্ধান্ত তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না—যদি ফ্রয়েডীয় মতকে, মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তকে পুরাপুরি 'বৈজ্ঞানিক' বলে দাবী করতে হয়।[২]

এই প্রসঙ্গেই প্রথম প্রবন্ধের মূল আপত্তি—এবং Popper এই আপত্তি সুস্পষ্টভাবে উত্থাপন করেছেন—এই যে, ফ্রয়েডের মত বিশ্বাস হিসাবেই গৃহীত হয়েছে। এবং এর ফলে মনঃসমীক্ষণের **বৈজ্ঞানিক** মূল্যের হানি ঘটেছে। অধ্যাপক Popper-এর বক্তব্য এই যে, নির্জ্ঞানের তত্ত্বটি দ্বারা মানসরাজ্যের যে কোনও ঘটনার পরিষ্কার ব্যাখ্যান সম্ভব—এমন একটি **বিশ্বাসের** ফলে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তটি যথার্থ **বৈজ্ঞানিক** সিদ্ধান্তের পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিছুটা অনুরূপ অভিযোগ প্রখ্যাত জার্মান-সুইশ দার্শনিক Karl Jaspers (যিনি নিজে একসময় মনোরোগবিশারদ—psychiatrist ছিলেন) এনেছেন মনঃসমীক্ষণের (এবং মার্কস্‌বাদেরও) বিরুদ্ধে। মনঃসমীক্ষণের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলতে গিয়ে Jaspers মন্তব্য করেছেন, "It is an attitude marked by universal scepticism, and at the same time by a readiness to accept any possible interpretation."[৩]

Popper, Jaspers প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের সমালোচনা সম্বন্ধে অন্ততঃ এটুকু বলা চলে যে ওঁদের অভিযোগ ঠিক ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা অতি উৎসাহী ফ্রয়েডপন্থী আধা-বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে। মনুষ্যজীবনের নানাক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় আবিষ্কারের ব্যাপক ও বহুল প্রয়োগের সম্ভাবনার ফলে

১ K. Popper, "Philosophy of Science", "British Philosophy in the Mid-century" (I. C A. Mace) পুস্তকে প্রবন্ধ এবং অন্যত্র।

২ '*Visva-Bharati Quarterly*' (No. 4, 1959)-তে প্রকাশিত লেখকের "Methodology and Faith" প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

৩ K. Jaspers, '*Reason and Anti-Reason in our Time,* (tr. from German by S. Godman)

একদিকে বৈজ্ঞানিক থিওরীকে বিশ্বাসের বা জীবনবেদের ভূমিকায় নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অপর দিকে, এই 'পপুলার' অপপ্রয়োগ বা আতিশয্য দেখে ফ্রয়েডের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তুচ্ছ করবার প্রবৃত্তিও নিতান্ত অসঙ্গত। দ্বিতীয় প্রবন্ধে গোড়ার দিকেই ফ্রয়েডের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক ও সমর্থক।

কোনও একটি বিশেষ দার্শনিক মতের, এমন কি কোনও বিশেষ জীবন-দর্শনের পরিপোষক বা সমর্থক ফ্রয়েড ছিলেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষমূলক (empirical) ভিত্তিতে মনের প্রকৃত রূপ ও গঠন উদ্ঘাটন করা। তা করতে গিয়ে তিনি নিছক তত্ত্বানুমানের আশ্রয় নেন নি—ধর্মীয় বা ধর্মতত্ত্বীয় (theological) বিশ্বাসের তো প্রশ্নই নেই। একমাত্র মানসরাজ্যের ঘটনা ও প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে, সুস্থ ও অসুস্থ মনের প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মতর বিফলতার পর্যালোচনার পথে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। যে কোনও দিশারী বৈজ্ঞানিকের মত তিনিও স্বভাবতঃই প্রকল্পের অবতারণা করেছেন। সে প্রকল্প অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 'নির্জ্ঞানে'-র প্রকল্প। যে কোনও সার্থক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকল্পের উপর যতটুকু কার্যকরী বিশ্বাস না থাকলে পর মৌলিক আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, তার অতিরিক্ত বিশ্বাস ফ্রয়েড পোষণ করেছেন বলে মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

আর খণ্ডনযোগ্যতার (refutability) পরীক্ষা সম্পর্কে অন্ততঃ এটুকু বলা চলে যে ফ্রয়েড আগাগোড়া একটা একান্ত বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে গেছেন। বস্তুতঃপক্ষে, ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক জীবনে আত্মসমালোচনা ও পরিবর্তনশীলতার মনোভাব অত্যন্ত বেশী প্রকট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েড সম্পর্কে বর্তমান এক মনোবিদের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে: "He was also a daring paradox, giving the semblance of self-contradiction, of inconsistency and of all-solidity."[৪] সত্যের খাতিরে, তথ্যের দাবিতে নিজের মত সম্পর্কে এই পরিবর্তনশীলতাকে কখনও কখনও ফ্রয়েডের চিন্তায় সঙ্গতির অভাব বলেও অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর চৌষট্টি বছর বয়সে "*Beyond the Pleasure Principle*" গ্রন্থটি লিখে ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণবিদ্যায় একটি নূতন স্তরের সূচনা করলেন। এর দ্বারা তাঁর এই দাবিই আবার ঘোষিত হল যে তিনি কোনও বিশেষ দার্শনিক মতের অনুসারী নন ; কোনও প্রচলিত দার্শনিক মতের বা জীবনবেদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য মেলে কি না মেলে সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এক ভূমিকা নেবার প্রস্তাব করলেন।[৫]

নির্জ্ঞানের তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ব্যাপক এবং অস্পষ্টও বটে। এমন আপত্তি ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, এই এক নির্জ্ঞানকেই কামলিপ্সা থেকে শুরু করে মৃত্যু-ইচ্ছা পর্যন্ত বিভিন্নমুখী নানান প্রেষণা ও প্রবৃত্তির উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন একটি অস্পষ্ট অথচ সর্বগ্রাসী প্রত্যয়ের ভিত্তিতে সঠিক বিজ্ঞান কি সম্ভব? এর উত্তরে বক্তব্য এই যে, সব বিজ্ঞানের মূলীভূত তত্ত্বই তো কিছুটা অস্পষ্টতাদোষে 'দুষ্ট' হয়। কারণ, প্রতি বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রেই উচ্চতম সামান্যীকরণের পর্যায়ে এমন অস্পষ্টতা আসা কিছু অস্বাভাবিক নয়। "নির্জ্ঞান" মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যাপকতম প্রকল্প, যা মানসজীবনের সর্বস্তরকে ব্যাখ্যা করবার দাবি করে। তা ছাড়া এটাও মনে রাখা

৪ Dr. Gregory Zilboorg, Introduction, Freud's "*Beyond the Pleasure Principle*" (Bantam Books).

৫ লেখকের প্রবন্ধে "ব্যক্তিমানস ও সংস্কৃতি", চিত্ত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০) দ্রষ্টব্য

দরকার যে, ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের যে স্পষ্টতা থাকে, মানস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেটা প্রত্যাশা করা চলে না। এদিক থেকে প্রথমোক্ত প্রবন্ধে লেখকের এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য: "তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় যেন মানুষের নির্জ্ঞান কোনওদিনই স্পষ্ট হবে না—ব্যবহারিক দিক থেকে যাই বলা হ'ক না কেন।" কিন্তু এই তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার অর্থ এই নয় যে মনঃসমীক্ষণের সমগ্র বৈজ্ঞানিক মূল্য বা সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হবে। তেমনি আবার এই তাত্ত্বিক অস্পষ্টতার অজুহাতে মনঃসমীক্ষণের প্রকল্পীয় সিদ্ধান্তকে এক কথায় 'বিশ্বাস' বলে চিহ্নিত করাও সুবিচারের পরিচয় নয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় সম্যক্ তথ্যানুসন্ধানের আলোয় প্রকল্পের পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠার পথ দুরূহ ও ধৈর্যসাপেক্ষ। মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রেও সেই ধৈর্য ও নিষ্ঠা রক্ষা না করবার কিংবা করা যায় না এমন মনে করবার, কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

একটি দিনপঞ্জী

উদয়চাঁদ পাঠক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮

সেদিনের আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল এ বর্ষা আর কোনওদিন থামবে না। আকাশটা কাল রাতের অন্ধকারে কখন যেন উলটে গেছে। সোনালী-রৌদ্র-মাখা নীল আকাশটা যেন ঘুরে উপর দিকে মুখ ফিরে গেছে আর ওদিককার জলভরা মেঘে ঢাকা দিকটা এই আমাদের পৃথিবীর দিকে উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। কোনওকালে এদিকে যে আর সূর্য বা চাঁদ দেখা যাবে তেমন আশা করবার মত কিছু ছিল না। বৃষ্টি গত রাত্রিতে কখন শুরু হয়েছে টের পাই নি। ঘুম ভেঙ্গে সকালে চেয়ে দেখি পরিচিত পৃথিবীর রূপটা বদলে গেছে, এ যেন সে-আশা-করা সকাল নয়। কাজের তাগিদ যেন লোপ পেয়ে গেল। বসে বসে শিথিল চিন্তাগুলো আমার মনের আকাশ ছেয়ে ফেলল। কী ভেবে চলেছি তার হদিস পাওয়া যায় না, তবু ভেবেই চলেছি। প্রাত্যহিক নিয়মে প্রাতরাশ শেষ হ'ল; কথা বলবার ইচ্ছা হ'ল না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে তাতে আমার কি? কিছুই না। ঘরে বসে আছি ভেজবার সম্ভাবনা নেই, আপিসের দেরী হবার তাড়া নেই, তবু মনে হচ্ছে এ বর্ষণের মধ্যে যেন আমার কোথায় কি হয়ে চলেছে। মনের কোন্ মণিকোঠায় কী যেন এখন নড়ে নড়ে উঠছে। থেকে থেকে বুকটা ভরে ওঠে, ঢেউয়ের মত দুলে ওঠে। আভাস আসে পরিচয় পাই না। এমন অবস্থার মধ্যে যেন কেমন এক বেদনা-মধুর অনুভূতি জাগে। জানি না, বুঝি না, তবু সে আমারই।

বাইরের ধারা বর্ষণের দিকে চেয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে আছি। সে বর্ষণের ধারা বেয়ে এক সময় মন আমার বর্তমান ছেড়ে অতীতের এক অপরিচিতের দুয়ারে ঘা দিল। মহিম বলেছিল সেদিন এই পৃথিবীতে আকাশ-ঢালা বর্ষা ঝরে পড়ছিল। তখন শহর থেকে অনেক দূরের নির্জন গ্রামে ঘুরে বেড়াই। বাদলের দিনে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ছোট পাহাড়ী ঝরনা পার হয়ে এ পারে উঠে এসেছি। অদূরে বড় কি গাছের নীচে একটি কুটির দেখতে পেয়ে একটু আশ্রয়ের আশায় এগিয়ে গেলাম। সকাল থেকে বৃষ্টিতে ভিজে চলেছি। শরীরে কাঁপুনি ধরেছে। হাতের আঙুলে আড়ষ্টতা অনুভব করছি। পথে বেরিয়েছি তবু আশ্রয় চাই। দুয়ারে আঘাত করলাম, কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ তাই মনে হ'ল কেউ নিশ্চয় আছে কিন্তু মানুষের আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বার কয়েক আঘাতের পরে প্রশ্ন এল—'কে'? বললাম পথিক—একটু আশ্রয় চাই। দেরী হ'ল না, দুয়ার খুলে গেল। ভেতরে যাবার আহ্বান জানিয়ে সে বললে, 'এমন দুর্দিনে আপনি এখানে'? উত্তর দেবার তো কিছু ছিল না—কী বলব! কেন এদিনে? এখানে কেন? সে কি বুঝবে—কেন? আমার কথা তা তো একা আমারই। আর কেউ তার অর্থ কি বুঝবে? উত্তর না পেয়ে

লোকটি নিজেই বলে চলল, 'একেবারে ভিজে কাহিল হয়ে পড়েছেন যে, শিগ্‌গির কাপড়-জামা বদলে ফেলুন'। বলেই সে পেছনের জানালা দিয়ে ডাকলে, 'মায়া একবার এস তো, অতিথি এসেছেন'। মধ্যবয়স্কা যে-নারী সেই মেঘলা অন্ধকারের মধ্যে ঘরে এসে দাঁড়াল মন বললে এ সাক্ষাৎ কল্যাণী।

তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে একটা কাপড় একটা মোটা চাদর বের করে একটা গামছা হাতে দিয়ে বললে, 'আপনি শরীরটা মুছে কাপড়-জামা বদলে ফেলুন! ইস্ ভিজে কী হয়েছেন! আমি গরম দুধ নিয়ে আসি'। কিছু বলবার আগেই মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য দিকের বারান্দা দিয়ে চলে গেল। গরম দুধ এল। যে-ভাবে সে সামনে এনে দিয়ে বলল খেয়ে নিন, তাতে আদেশ ছিল, মিনতি ছিল, বেদনা-ভরা সহৃদয়তা ছিল। এখনও কিছু বলতে পারি নি। মায়া আবার চলে গেল।

যে দরজা খুলেছিল সেও মধ্যবয়স্ক, হয়তো প্রায় চল্লিশ বৎসরের মত তার বয়স। স্বাস্থ্য ভাল। চোখে পড়ে তার মুখে শান্তির আবেশ। অনেক কথা হ'ল। শুনলাম এক সময় অবস্থা বেশ ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। নিজের পৈতৃক বাস ছেড়ে আসতে হয়েছিল সব ফেলে রেখে। একমাত্র সন্তান তাকেও সঙ্গে আনতে পারে নি। চিরদিনের মত দেশের মাটিতেই সে রয়ে গেল। পলায়নের পথে গভীর রাত্রে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়। ছেলেকে হারিয়ে বাপ মা আশ্রয়ের আশায় চলে এসেছে। দেশ ছেড়ে বহুদূরে নির্জন এই ছোট্ট গ্রামপ্রান্তে একটু আশ্রয় পেয়েছে। স্ত্রীর সামান্য গহনা দিয়ে সামান্য কিছু জমি আর গরু বলদ কিনে এইখানেই বসবাস করছেন। এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেল, তবু মনে কোনও তিক্ততা নেই—ভাগ্যের প্রতি সামান্য মাত্রও দোষারোপ শুনতে পেলাম না। অনেক কথাই শুনলাম। অতি পরিতৃপ্ত হয়ে রাতের আহার শেষ করেছি। যোগেন ও আমি খেতে বসেছি; মায়া নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালে। আয়োজনের বাহুল্য নেই—আলুভাতে, তরকারি আর ডাল। কোনও ভূমিকা নেই, যা আছে তাই দিয়ে অতি সহজে অতিথি সৎকার করলে। যোগেন ততক্ষণে আমাকে দাদা বলতে শুরু করেছে। এক সময় দেখি মায়াও আমাকে দাদা সম্বোধন করছে। শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে মায়া হঠাৎ আমায় প্রণাম করে বললে 'দাদা, রাত হয়েছে বিশ্রাম করুন, আর কথা বলা নয়'। সেই আদেশ-মিশ্রিত আন্তরিকতার সুর। আমি আর যোগেন ঘরের মধ্যে শুয়েছি। মায়া বোধ হয় ভেতরের বারান্দায় বা অন্য ঘরে শুয়েছে। মনে হ'ল তার খবরটা নেওয়া উচিত ছিল—কোথায় সে ঘুমল, তার শোবার ব্যবস্থাই বা কি হ'ল। যোগেনকে সে-কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত দেহ তবু ঘুম এল না। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে—সব যেন ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাবে। এতদিনের চেনা পরিচয়ের জগৎ যেন লোপ পেয়ে গেল। যে ঘরে শুয়ে আছি তার সীমা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিরাট এই পৃথিবীর এক কোণে এই শান্ত পরিবেশে একমাত্র এই ছোট সংসারটুকু যেন আছে; তার চারিপাশে মহাবিস্তারে যেন আর কোথাও কোনও জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টার সামান্য পরিচয় তবু পরম আত্মীয়; একান্ত আপন বলে মনে হতে লাগল। আমি যেন এদেরই একজন। ভাবছিলাম কি করে তা সম্ভব হ'ল। আমি নিতান্ত অপরিচিত আগন্তুক; তবু বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে আমাকে যে এত আপন করে নিল, তা কেমন করে হতে পারল। কী আছে এদের মধ্যে যা আমার মনের সব দ্বিধা প্রশ্নকেও লোপ করে দিয়ে ওদেরই সঙ্গে সমানে সুর মিলিয়ে দিলে? সোনার কাঠির স্পর্শে আমাকে বদলে দিলে—ভেঙে তাদের নিজের মত করে গড়ে নিলে! বৃষ্টির বিরাম নেই, আকাশ আর মাটি যেন এক হয়ে গেছে।

রাত কখন পোহাল জানি না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম যখন ভাঙল তখন বোধ হয় অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমার জন্য সব প্রস্তুত করা আছে। উঠে বসতেই মায়া এসে প্রণাম করে করুণাময়ীর মত দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে গেল। কোথাও কোনও তাড়া নেই। আপনা থেকেই সব যেন হয়ে যাচ্ছে। আমি পথিক, যেতে চাইলাম। দুজনে এসে বাধা দিলে, অনুরোধ করে ক'দিন থাকতে বললে। এড়াতে পারি নি। পথের পথিক ঘরের টানে বাঁধা পড়ে, দেখলাম তাই। বাঁধন নেই, দাবি নেই, কর্তব্যের চাপ নেই; তবু থাকতে হ'ল। আমারও মন বাঁধা পড়তে চায়। ঘর টানে তবু পথের হাতছানি এড়াতে পারি না। নিজের ঘর বাঁধা হ'ল না, তবু কাকের বাসায় কোকিলের ছানা হতে মন চায় এই তো দেখছি। থাকতে হ'ল দুদিন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি একটু ক'মে আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। থামবে না এ বর্ষণ, থামবে না—এ থামতে জানে না। উন্মাদিনী বর্ষা নিজেকে সম্পূর্ণ শেষ না করে ক্ষান্ত হবে না। সে রাত্রেও ঘুম আসছে না। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছি। এক সময় মনে হ'ল আমার পথের ডাক শুনতে পেলাম। আর নয়। ঘুম এল না। জানালায় বসে রাত কেটে গেল। ভোর হতেই মায়া ধীরে ধীরে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি ফিরে তাকাতেই সে প্রণাম করে উঠে কেবল বললে 'দাদা'! উত্তর দিতে পারি নি। আপনা থেকেই কেমন ডান হাতটা তার মাথায় রাখলাম। শান্ত চোখে সে মাথা নত করে আবার আমার দিকে চাইল। সে দাঁড়িয়ে রইল। কি বুঝেছি জানি না। কতক্ষণ কেটে গেল। এক সময় বললাম 'আমার যাবার ডাক এসেছে, বোন'! সে অতি করুণ তবু সহজ স্বরে বললে 'বুঝেছি দাদা'। একটু দাঁড়িয়ে থেকে মায়া চলে গেল। যোগেনও একবার এসে প্রণাম করল, চেয়ে রইল, আর কিছু বলল না। আমার চেয়ে ওরাই যেন আমাকে বেশী ভাল চেনে। বাধা দিলে না, আতিশয্য দেখালে না। যাবার সময় বৃষ্টি তেমনই বেগে পড়ছে। দুজনেই আবার প্রণাম করলে। কথা কিছু নেই, কথা বলা হ'ল না। চোখ তুলে তাকালাম, তারাও একবার চেয়ে দেখল। সেই বৃষ্টির মধ্যে আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম। বাধা দিল না, কোথায় যাব শুধাল না, আবার আসতে বলল না। যে-কুটিরে নিজে থেকে আশ্রয় নিয়েছিলাম নিজেই সে কুটির ছেড়ে বেরুলাম। আমি জানি, যে সেদিন আশ্রয় নিয়েছিল আর যে আজ পথে বেরুল তারা এক মানুষ নয়।······

ঘুরে ঘুরে প্রায় দশ বছর আরও কেটে গেছে। কত মানুষ দেখলাম, কত জায়গা দেখলাম, মন্দির, মসজিদ, গির্জা অনেক দেখলাম। গ্রাম, শহর, তীর্থক্ষেত্র ঘুরে দেখেছি। সমুদ্রতীর, পাহাড়, জঙ্গল কত ঘুরে দেখেছি। সাধুসন্ত, চোর, ঠগ, জুয়াচোর, অনেক দেখেছি। সবই যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। মানুষ, মানুষের কীর্তি, কুকীর্তি, সবই কিছু কিছু দেখেছি—সুন্দর অসুন্দর সবই আছে, থাকবেও। আমার জীবন আমার স্রোতেই চলেছে। একবার ভুবনেশ্বর হয়ে পুরীতে গেছি। কদিন সমুদ্রের পারে আর নানা মন্দির ঘুরে মনে হ'ল এবার আবার চলার সময় এসেছে। পরের দিন ভোরে যাত্রা করব ঠিক করে জগন্নাথের মন্দিরে একবার প্রণাম করতে গেলাম। ও মূর্তি মানুষের গড়া, মানুষের আয়োজনে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ সব কথা জানি তবু ইচ্ছে হ'ল প্রণাম করে আসি। ক্ষতি কি? মন যদি নতি জানাতে চায়, তা সে যাই হ'ক না কেন, তা মানতে আমার বাধে না। মন যদি মূর্তির অতীত কিছু রচনা করে তারই উদ্দেশে প্রণাম জানায় তবে তাই হ'ক। একটু তৃপ্তি যদি তাতে পাই ক্ষতি কি? জানি ঐটুকুই তার মূল্য। আমি তার বেশী কিছু ভাবতে পারি না।

যাঁরা পারেন তাঁদের কথাও শুনেছি কিন্তু আমার এই পথিক মনে তাঁদের ভাবধারার সিংহাসন রচিত করা হ'ল না। আমি পারি নি। আমার পথ আমারই রয়ে গেল। সকালে মন্দির প্রণাম করে এসে বিকেলে সমুদ্রতীরে দূরে একা বসে নীল সাগরের দিকে চেয়ে আছি। অগণিত ঢেউ সম্মুখে এসে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কী সে ব্যাকুলতা! মূক সে উত্তর দেয় না। নিজের মনেই তার উত্তর খুঁজে নিতে হয়। আমার মনই সে-উত্তর জুগিয়ে চলে—কখনও এটা কখনও ওটা, যখন যেমন ভাবি। তবু ভাল লাগে ঐ ঢেউয়ের ভাঙ্গাগড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের মনে অফুরন্ত এই ভাঙ্গাগড়া। এর মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি, কি ভাবি তার ঠিকানা মেলে না। ভাল লাগে এই আপন-ভোলা, হারিয়ে-যাওয়া অবস্থা। অনেক সময় কেটে গেছে, এক সময় অন্যমনস্ক হয়েই উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছি। পেছন থেকে ডাক কানে এল—'দাদা'! ডাক কানে গেল কিন্তু ঠিক মনে গেল না। ফিরে তাকালাম। আবার মুখ ফিরিয়ে চলতে যাব পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে, মায়া। শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা, যেন ঐ আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন সমুদ্রতীরে একমাত্র এই রূপই সার্থক বলে মনে হ'ল। আভরণ তার আগেও দেখি নি, এখন আরও শুভ্র সুচীতা ফুটে উঠেছে তার শুভ্রবেশে স্নিগ্ধ চাহনিতে। প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হ'ল না। বুঝে নিতেও দেরী হ'ল না। মায়ার জীবনে আবার মোড় ফিরেছে। সে বললে 'তোমায় আজ সকালে মন্দিরে দেখেছিলাম একবার দূর থেকে। ভিড় ঠেলে সামনে আসতে পারি নি—সে-ক্ষীণ আলোতেও তন্ময়তা দেখে চিনেছি যে তুমি। অদূরে ঐ মন্দিরে এসেছিলাম, ফেরবার সময় নজরে পড়ল একা-বসে-থাকা আপনভোলা তোমাকে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না তোমার চেহারা, তবু মন ঠিক বলেছে এ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। এলাম আর একবার প্রণাম করতে'। কোনও প্রশ্নই জিজ্ঞেস করবার মত খুঁজে পেলাম না। সবই যেন স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু কথা বলতে হয়, এও এক বিড়ম্বনা! কোথায় থাকে, জানতে চেয়েছিলাম। শান্ত ধীর উত্তর পেয়েছি। তাদের সে কুটীর, জমি, গরু সবই তাদের যে কাজ করত ওদেরই বিলিয়ে দিয়েছে। নিজের দিন ভালই কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তীর্থে বা এখানে ওখানে যায়; বাকী সময় সেই কুটীরের পাশেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বাস করে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য যা পারে করে। দু-বেলার আহার আপনা থেকেই জুটে যায়। ওরা সবাই মা বলে ডাকে। আমার কথা কিছু জানতে চাইল না। কেবল জিজ্ঞেস করেছিল আর ক'দিন থাকব। থাকা আর হ'ল না—পরের দিন ভোরেই আবার চলতে শুরু করেছিলাম। সেদিন সেই উদাসী বিসন্ন সন্ধ্যায় একসঙ্গে কিছু দূর চলার পরে যখন আমাদের ভিন্ন পথে চলার সময় এল, মায়া আবার প্রণাম করে আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখেছিল। কি প্রার্থনা সে করেছিল জানি না। বুঝেছিলাম সে আমাকে জানে, আমাকে সে চেনে। কিন্তু কেমন করে বলব কী সে জেনেছে, কী সে চিনেছে। জানি না, জানবার বস্তুতঃ কোনও প্রয়োজনও নেই; তবু মায়ার কথাটা মাঝে মাঝে শান্ত স্নিগ্ধ কোনও এক নম্র ক্ষণে মনে পড়ে যায়। মায়া ধীরে ধীরে নিজের পথ ধরে চলে গেল। আমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসে জলস্থল একাকার করে দিয়েছে। বালুচর থেকে যখন ফিরতে শুরু করলাম—অনুভব করলাম, আমার মধ্যে আবার যেন কোথায় কি বদলে গেছে। আমি আর সে-আমি নই।

মহিম আর কিছু না বলে খানিক বসে থেকে চলে গিয়েছিল। সেদিনের সে-ভাবনা আজকের এই বর্ষার সন্ধ্যায় আবার আমায় ঘিরে এল। এই মহিম, এই মায়া, যোগেন, এরা এই পৃথিবীরই

মানুষ। ধরণী নাকি সর্বংসহা। হয়তো তাই। কিন্তু মানুষ কি সইছে না! এ কি উপায়হীনের সয়ে নেওয়া মাত্র? একদিকের বিবেচনায় মানুষের সয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। এমন অবস্থার অন্ত নেই। জীবনে কত এমন অবস্থার মধ্যে মানুষকে পড়তে হয়। সওয়া ছাড়া তখন আর তার কিছু করবার থাকে না। কিন্তু তবু কি মানুষ সহজ মনে মেনে নিতে পারে? মায়া, যোগেন যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে তাদের কোনও নালিশ নেই। সব অবস্থাতেই তারা সহজ হতে পেরেছে। পৈতৃক সম্পদ, ভিটে বাড়ী, একমাত্র সন্তান, শেষপর্যন্ত শেষ আশ্রয় স্বামীকেও হারিয়েছে; তবু মায়া তার অন্তরের শান্তি মাধুর্য হারায় নি। এটা কি কেবল বাধ্যতায় ভাগ্যকে মেনে নেওয়ায় সম্ভব? জানি না মানুষ কি পারে, কি পারে না, তা আজও আমি জানি না। মায়া তার জীবনে কিসের সন্ধান পেয়েছে যার প্রভাবে সে এই মাটির পৃথিবীর মতই সর্বংসহা হয়ে জীবনের দুঃখ বেদনার উপর শান্ত সবুজের প্রলেপ তার চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। সে নিজে বদলায় কিনা সে খবর আমি জানি না। মহিমকে যে সে বদলে দিয়েছে তা নিজে দেখেছি। যে-মহিম এত বৎসর ধরে কেবলই অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াল এখন দেখি তার সে অস্থিরতা শান্ত হয়ে এসেছে। তার পথ চলার, তার কথা বলার সুর গেছে বদলে। চোখে দেখার অতীত যেন সে কিছু দেখতে পায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুভূতি ছাড়িয়ে সে যেন অনেক গভীর আরও কিছু অনুভব করে। আমাদের ভাষাতেই সে কথা বলে, কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন। সে আমাদেরই মত, আমাদের অতি চেনা মানুষ, তবু অচেনা যেন সে।

কোথায় মায়া, কোথায় মহিম, কোথায় তারা আছে, কি তারা করছে, কি তারা পেল, কি তারা পেল না, কিসের সন্ধানে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে নয়তো ধ্যানে বসেছে, তার কোনও খবরই জানি না। ঘরে বাস করি কিন্তু মন আমার ভবঘুরে। তাই কি এই অপরিচিত ঠিকানাহীন ভবঘুরের ক্ষণিক ঠিকানা আমার এই ছোট্ট খোলা বাতায়নে এসে নিজেদের জানান দিয়ে যায়? আমি কেন তাদের কথা শুনি, তাদের কথা ভাবি, নিজেই যে ভেবে পাই না। এক একবার মনে হয়েছে আমার মধ্যেও এদের সকলের স্বভাবের কিছু আছে যা আমাকে আঘাত দিয়ে সাড়া দিয়ে যায়, সচেতন করে দিয়ে বলে দিয়ে যায়— আমি আছি। আমাকে যেন ভুলতে দেয় না। আমার বহুরূপীর পরিচয় আমি এদের কাছেই পাই। নিজেকে জানা কি সহজ? চোখ মেলে থাকি আর সব দেখতে পাই, কেবল নিজটাই সে-দৃষ্টির আড়াল দিয়ে [illegible] যায়। ওরা আমার সেই পরিচয়টাকে জানিয়ে দিয়ে যায়। ওরা আমার সহায়ক, ওরা আমার শিক্ষক, আমার গুরু। আজকের এই বর্ষণঘন অন্ধকারে একা আমি তাদের নতি জানাই—তোমরা সুখী হও। মঙ্গল হ'ক।

রামধনু

নবেন্দু কেশরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[মনের বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতি লেখক নিজের ভাষায় গাঁথিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। লেখকের নানান রসের, নানান বর্ণের সংক্ষিপ্ত এই লেখাগুলির "রামধনু" নামকরণ সার্থক হইয়াছে। মনের বহুল ভাবের পরিচয় এই লেখাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া ইহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হইতেছে।]

১১১

সেদিনের সেই তুমি আজো আছ কাছে
তবু তুমি আজ কতদূর
আমাদের দুজনার মাঝে
ঐ শোন বাজে দিনান্তের মুলতানী সুর।

১১২

একই কথা দুজনের কাছে অর্থ যায় বদলে। আবার দুজনে একই কথা বললেও অর্থ এক হয় না।

১১৩

ক্রোধ যখন ধ্বংস করতে উদ্যত, বাধা পেলে ফিরে এসে নিজেকেই আঘাত করতে পারে। নিজেকে পীড়া দেবার ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকে বাইরে, নাগালের অতীত।

১১৪

মৃত্যুকে স্বীকার করি, অবশ্যম্ভাবি মনে করি, কিন্তু খুঁজে দেখি মনে মনে মৃত্যুরও রং [illegible] বদলে। হবে মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু সে নিশ্চিত দিনটা প্রতিদিনই অনিশ্চিত দূরে থাকবে এই ক[illegible] বিশ্বাস করি।

১১৫

ভালবাসায় মনটা অতি সামান্যতে যেমন দোল খায় অন্যদিকে আবার সব সয়ে, অগ্রাহ্য স্থির থাকে।

১১৬

মিষ্টি কথায় মিথ্যাকে বেশীদিন ঢেকে রাখা যায় না। মোহ কাটলে মিথ্যা ধরা পড়বেই।

১১৭

কথার আড়াল ভেঙে আমাদের স্বভাব হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে আসে। কত রকমে তাকে ঢাকতে চেষ্টা করি, না পারলে সেই স্বভাব নিয়েই দাপট করি বড়াই করি।

১১৮

যে-জিনিস ভাল লাগে তা পেতে ইচ্ছে করে, নিতে ইচ্ছে করে। দাম দেবার কথাটা পরে মনে আসে। ইচ্ছা আগে, নীতি পরে।

১১৯

ঘুম আমার ভাঙবে বলেই ঘুমতে ভয় থাকে না। যে-ঘুম থেকে আর জাগা যাবে না এমন ঘুম কি আমরা চাই ?

১২০

কখনও মনে হয় এটা চাই, কখনও মনে হয় ওটা; আবার কখনও মনে হয় আর কোনওটা অথবা কোনওটাই না। কী যে চাই তাই জানি না।

১২১

যা চাইলাম তা পেলাম। তবু কেন তৃপ্তি মেটে না ? চাওয়া অনন্তকাল ধরে চলবে, পাওয়াও তেমনি অন্তহীন চলবে; এই বোধ হয় আমার চাওয়া পাওয়ার স্বরূপ।

১২২

আমি রাগ করে বকি মারি; কিন্তু আমাকে কেউ যদি বকে মারে তবেই আমার রাগ হয়—নানা প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। আমি রাগ করে বা অনিষ্টের ভয়ে সাপটাকে মারতে পারি কিন্তু সাপটা যদি রেগে বা প্রাণের ভয়ে আমাকে ছোবল মারে তাতে আমার প্রতিক্রিয়া জাগে। দুনিয়াটা আমার জন্যে, আমার আপন জনের জন্যে, আমার আপন দলের জন্যে, আমরা আপন শ্রেণীর জন্যে, এই ধারণার বশেই চলি। পৃথিবীতে মানুষের দাবিই সবচেয়ে গ্রাহ্য। এর অন্যথা দেখতে পাই যখন অন্য প্রাণীর সঙ্গে আমার মনের টান থাকে। আমিই প্রধান।

১২৩

মানুষের মনে নিজের সম্বন্ধে একটা গর্ব আছে; যতই তা অস্বীকার করুক তবু তা সত্য। সে-টু খর্ব করতে চাইলে মানুষ সহ্য করে না। বাইরে চুপ করে থাকলেও মনে তার আন্দোলন দেয়।

১২৪

জিনিসটা কার ? যে বানায়, যে এনে দোকানে রাখে, যে কেনে, যে ব্যবহার করে, কার সে-[illegible] আরও আছে যা দিয়ে তৈরি হ'ল, সে-জিনিসের আদি খুঁজতে গেলে খোঁজা আর শেষ হবে না। [illegible]লে জিনিসটা কার তাও ঠিক করা যাবে না। জিনিস কারও নয়। ভোগ করতে পারাটাই আসল

১২৫

অন্যের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হয়। আর বলে জোর করে নিলে হয় গুণ্ডামি; মিথ্যা করে নিলে হয় ঠকানো। কিন্তু দোকানী যখন কেনা দামের চেয়ে বাড়িয়ে ক্রেতার কাছে দাম চায় তখন সেটা হয় তার প্রাপ্য লাভ। গম, সুজি, আটা ময়দা।

১২৬

যে কোনও কাজের কেউ করে সমর্থন, কেউ করে প্রতিবাদ।

১২৭

কেবল দৃষ্টিকোণের উপরই রূপ নির্ভর করে না। আলো, ছায়া, রং, পারিপার্শ্বিক, দ্রষ্টার শিক্ষা ও মনোভাব এমনই আরও কত কিছুর প্রভাবে রূপ রচিত হয়।

১২৮

ঘড়ির কাঁটার দাগ পরিক্রমণ আর টিক্ টিক্ শব্দ সময়ের উপরই দাগ কেটে দেয়।

১২৯

আসল কথাটা হ'ল আমি সুখী হতে চাই। তার জন্যে আয়োজন উপকরণ জুটিয়ে নিজেকে যত বাঁধি আমার মূল উদ্দেশ্যটি তত যায় হারিয়ে। উপকরণের চাপে সুখের হয় সমাধি।

১৩০

সকল সময়ে সকল অবস্থায় কোনও কিছুই ভালও না মন্দও না।

১৩১

চোখে দেখি সীমাহীন নীল আকাশ, মন চায় ছোট্ট একটু নীড়।

১৩২

পেট ভরানো, শরীরের জন্যে খাদ্য জোটানো, সে তেমন কিছু নয় ; কিন্তু গোল বাধাল জিহ্বা।

১৩৩

প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায় যদি ভোগ এসে তাতে যোগ না দেয়।

১৩৪

ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে ডাকলে আর কি তাকে পাওয়া যায় ?

১৩৫

আমার জীবনে তোমার পরশ দিয়া
কী ছবি আঁকিলে প্রিয়া।
তোমার জীবনে আমারে বরিয়া নিয়া
(মোর) ভরিয়া দিয়াছ হিয়া।

১৩৬

আঁখিতে আমার ঘুমের কাজল লাগে,
স্বপনে আমার তোমারি আনন জাগে।

১৩৭

তুমি চুপি চুপি এসো
ঘুমের দুয়ার ঠেলে
ব্যাকুল দু বাহু মেলে।

১৩৮

না-চাওয়ার পাওয়াও যে-পাওয়া তা যখন বুঝতে পারি তখন খুশীতে প্রাণ ভরে ওঠে।

১৩৯

আপন মনে গান গাই, সব বাঁধন খ'সে প'ড়ে মন মুক্তির স্বাদ পায় অনন্ত ঐ আকাশে।

১৪০

সমে এসে গান থামাতে হয়। ঠিক জায়গায় এসে রচনা শেষ করতে হয়। প্রয়োজন ফুরলে ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। সম্বন্ধ আল্‌গা করতে হয়, নইলে রসের অপমৃত্যু ঘটে, তিক্ততা জাগে।

১৪১

বয়স বাড়ে, আয়ু কমে। বোঝা বাড়ে, প্রয়োজন কমে।

১৪২

পিতামাতা স্নেহে যত্নে সন্তানপালন করে সুখী হয়। সন্তান বড় হয়; পিতামাতা তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। সন্তান নতুন করে সংসার পাতে; বৃদ্ধ পিতামাতা যেন হয় অপ্রয়োজনের বোঝা।

১৪৩

পূর্বপুরুষদের কথা পরের পুরুষ বোঝে না; সুতরাং দুই পুরুষের মানসিকতার মিল হয় না। পশ্চিমের ব্যক্তিবাদ সমাজের এদিকটাকে প্রকট করে তুলে ধুঁকছে।

১৪৪

জীবনটা আমার একার কিন্তু তার সার্থকতা ঘটে অনেকের সহযোগে। নিজের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বীজ কুসুমিত হতে পারে না।

১৪৫

প্রেম আমাকে পূর্ণ করে, হিংসা আমাকে রিক্ত করে।

১৪৬

যাকে আমি ভরা মনে দিতে চাই সে যদি পূর্ণ প্রাণে নিতে না পারে তবে আমার সে-দেওয়া [illegible] এসে আমাকেই আঘাত করে।

১৪৭

ছোট বড় আর মান অপমানের ভূত আমাদের জীবনে বিকার ঘটিয়েছে। জীবনের সব [illegible] থেকে এই ভূতকে তাড়াতে না পারলে সহজ শান্তি মেলে না।

১৪৮

ভালবাসা কী, তা না বুঝেই ভালবাসতে চাই ভালবাসা পেতে চাই।

১৪৯

প্রেম আমার স্বপ্ন, সংসারের বাস্তবের বালুচরে মরীচিকা

১৫০

আমি সুখেও গান গাই, দুঃখেও গান গাই, ঐশ্বর্য জানাই, আকুতি জানাই

১৫১

আমি কখনও দাতা, কখনও ভিখারী।

১৫২

মানুষ প্রয়োজন সৃষ্টি করে তা মেটানোর জন্য খেটে মরে। এও এক রকমের বায়ুরোগ।

১৫৩

এই দুনিয়াটা আমার মনের মত হবে এই আমার মনের আশা। তা না হলেই অভিযোগ করতে থাকি। সকলেই কমবেশী তাই করে চলেছে। সংসারে তাই অভিযোগ এত শোনা যায়।

১৫৪

মূল্য-বোধটা মানুষের নিজের। প্রয়োজন দিয়ে মূল্য বিচার করা হয়। সব সময় সে-প্রয়োজনটা মানুষ নিজে বুঝতে পারে না।

১৫৫

কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও রাগ করি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সং, অথবা অভিনয় করছি। পাগলও মনে করতে পারে।

১৫৬

আমি কী চাই প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব কি? বলতে পারি যখন যা চাই, তাই চাই।

১৫৭

একটা আদর্শ খাড়া করে সেই দিকে ছুটতে থাকি। বুঝতেই পারি না ধীরে ধীরে আদর্শটার চেহারা যায় বদলে, তার প্রয়োজনের তাগিদও যায় ঢিলে হয়ে। সময় সময় তেমন অবস্থায় নিজেকে আদর্শচ্যুত মনে করে কষ্ট পাই। একটা কিছুকে আঁকড়ে না ধরলে আমরা চলতে পারি না। বয়স যতই হ'ক মানুষ আজও শিশু।

১৫৮

এক এক সময় শরীর খাটিয়ে পরিশ্রম করতে পারলে বেশ তৃপ্তি বোধ হয়।

১৫৯

'আমি'-র মূল্যটা নানাভাবে আমরা সব কাজে পেতে চাই। তার চেয়ে বড় কথা নিজের কাছে নিজের মূল্যটা অনুভব করতে চাই। সেই মূলেই আমার মূল্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

১৬০

স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাব। স্বার্থহীনতার বড় বড় নজিরের ভিতরকার কথা ঐ স্বার্থপরতা।

১৬১

ভোগ করতে পারলে সুখ হয়। সব ভোগেই সুখ আসে, কিন্তু তাতে বাদ সাধে শিক্ষা সমাজ ইত্যাদির নামে আমার নিজেরই আর এক ইচ্ছা।

১৬২

খেলার মত চরিত্রগঠনমূলক আনন্দ আর কিছু নেই

১৬৩

খাওয়াপরার জন্যই আমরা এত করি কিন্তু সেই খাওয়াপরাতেই হাজার বাধা নিষেধ তৈরি করেছি। এ বৈপরীত্য আমাদের স্বভাব।

১৬৪

বেশীর ভাগ সময়ে মানুষ গান করে প্রশংসা পাবার জন্যে। মনের আনন্দে গান খুব কমই শোনা যায়।

১৬৫

বড় বড় কথা বলে উদারতা, মনের প্রসার দেখাই; বাস্তবে রচনা করি নিজের ছোট একটা গণ্ডি।

১৬৬

গ্রীষ্মের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। উঃ আঃ করে অস্বস্তি অশান্তি প্রকাশ করি। বাইরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপও বাড়িয়ে তুলি।

১৬৭

রোগ, শোক, জরা মৃত্যু ইত্যাদি আমাদের কাতর করে। বলি সইতে পারি না, সইতে পারব না। দুঃখ বোধ করি, কিন্তু যখন আসে যেমন করেই হ'ক সয়েও যায়। কেবল বিরক্তিকর স্মৃতিটাই থেকে যায়।

১৬৮

জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যা মানি তা ভয়ে মানি। বাস্তব বুঝে যা মানি তার শক্তি ও ভিত্তি অনেক বেশী দৃঢ় হয়।

১৬৯

লুকিয়ে ঢোক গিলব, কিন্তু লোভের কথা প্রকাশ করে বলতে পারব না।

১৭০

বাস্তব ভোগের বেলায় যে দুয়ার বন্ধ থাকে কল্পনায় সে ভোগের দুয়ার থাকে অবারিত।

১৭১

ভোগ আর দুর্ভোগের সীমারেখাটা মানুষের নিজের তৈরি।

১৭২

আমার বুদ্ধি আর বাসনার যে দ্বন্দ্ব থেকে থেকে দেখা দেয় তার মীমাংসা আজও হ'ল না।

১৭৩

ঘুম থেকে জেগে উঠে বুঝতে পারি যে-আমি ঘুমিয়েছিলাম এ-আমি সেই-আমি। অথচ, ঘুমের মধ্যে যা ঘটে গেল তা আমার কিছুই জানার মধ্যে নেই। এ বড় বিস্ময়।

১৭৪

এই ভোলা মন দেখি অনেক দিনের পুরনো এক এক কথা স্মৃতিতে ধরে রেখেছে যার আপাত-দৃষ্টিতে কোনও মূল্যই নেই। সেদিনের সেই পরিবেশে ফিরে গেলে দেখি সে-কথা আমার মনের কোনও গভীর রসে সমৃদ্ধ।

১৭৫

টাকার প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়েও তার সঞ্চয়ের নেশাটা বড় হয়ে ওঠে।

১৭৬

অসুবিধের অবস্থায় পড়লে কেউ চায় সেখান থেকে পালিয়ে যেতে, কেউ চায় লড়াই করে সে-অবস্থা জয় করতে।

১৭৭

এমন এক এক সময় আসে যখন কিছুই ভাল লাগে না। আবার কখনও সবই ভাল লাগে।

১৭৮

সমস্যার মীমাংসা একের পর এক আমরা করতে চেষ্টা করছি ; সাময়িকভাবে সফলও হই। কিন্তু সেই মীমাংসার সূত্র ধরেই আবার নতুন সমস্যা দেখা দেয়। যুগ যুগ ধরে এই তো চলেছে।

১৭৯

বসন্তের বাঁশি শুনি
দেখা দিল নবীন পল্লব।
প্রতীক্ষা চঞ্চল ধরা
খুঁজে ফেরে হৃদয় বল্লভ ॥
দূরাকাশ বাহু মেলি
বক্ষে টানি তারে যায় চুমি।
অনুরাগ সে-পুলকে
পুষ্পরাগে সাজে রিক্তভূমি ॥

টোটেম ও টাবু*

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু আমরা যদি আমাদের বিবেকের প্রামাণ্যের দাবি মেনে নিই তা হলে নিষেধাজ্ঞা, অর্থাৎ টাবু ও আমাদের নৈতিক নিষেধাবলী অবান্তর হয়ে যায়। অপরপক্ষে বিবেকের অস্তিত্ব অ-ব্যাখ্যাতই থেকে যায় ; এবং বিবেক, টাবু ও উদ্বায়ুর মধ্যে যোগসূত্রও অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, আমরা আজ যেখানে আছি সেইখানেই থেকে যাই। অবশ্য যদি মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তা হলে অন্য কথা।

কিন্তু আমরা যদি মনঃসমীক্ষণের নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি সম্বন্ধে অবহিত হই তা হলে এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট অগ্রসর হবে। স্বভাবী সুস্থ মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে দেখা গেছে যে, হত্যা করার প্রলোভন সম্বন্ধে আমরা যতটা সন্দেহ করি আসল প্রলোভন তার চেয়ে ঢের বেশী জোরাল এবং এই ইচ্ছা অনেক বেশী ঘন ঘন মনে উদয় হয়। এমন কি, ইহা সব সময় আমাদের চৈতন্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করলেও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এবং যখন আমরা জেনেছি যে কয়েকটি উদ্বায়ু রোগের আবেশজ সূত্রাবলী (obsessive rules) হত্যার নিমিত্ত শক্তিশালী আবেগের বিরুদ্ধে আত্মপ্রবোধ ও আত্মপীড়নের প্রতিবন্ধক খাড়া করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমাদের পূর্বোল্লিখিত প্রকল্পের, অর্থাৎ প্রত্যেক নিষেধের পিছনে যে বাসনা লুক্কায়িত আছে তাকে পুনরায় সাধুবাদ দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে, হত্যা করার এই ইচ্ছা সত্যি করেই রয়েছে এবং টাবু ও নিষেধবিধিগুলি মনোবিদ্যার দিক থেকে মোটেই অবান্তর নয়। উপরন্তু এটি যে হননকারী আবেগের প্রতি উভয়বল (ambivalent) প্রতিন্যাস (attitude) এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব এবং তা সমর্থনযোগ্য।

এই উভয়বল সম্পর্কের প্রকৃতি অর্থাৎ নিঃসংশয় প্রচ্ছন্ন বাসনাটির আশ্রয় নির্জ্ঞান মনে তা যে মৌলিক, সে-কথা বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এই থেকেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখানোর এবং নানান সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। আমরা জানি সংজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়া ও নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়া হুবহু এক নয়। নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি সুবিধা আছে ; সংজ্ঞান মনের বেলা সে-সুবিধাগুলি নেই। যেখানে আমরা নির্জ্ঞাত (unconscious) আবেগকে প্রকাশমান হতে দেখি সেইখানেই যে তার শুরু হতে হবে এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এর উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র থেকেও হতে পারে এবং শুরুতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু অভিক্রান্তির (displacement) মাধ্যমে যখন এক বিশেষ অবস্থায় এসে

* অনুবাদ—ধনপতি বাগ, এম এসসি, শ্রীনিকেতন

পৌছয় তখনই তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এমনটি সম্ভব হবার মূলে রয়েছে নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার অবিনশ্বরতা ও তার অসংশোধনীয়তা। এজন্যই আবেগটির প্রকাশস্থান নানান অসম অবস্থার মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও শুরু থেকে শেষপর্যন্ত তাকে রক্ষা করা সম্ভব। এ সব আভাসমাত্র হলেও, সাবধানে এগুলিকে বিস্তার করলে দেখা যাবে সভ্যতার বিকাশকে বুঝতে হলে এগুলির প্রয়োজন কত।

এই আলোচনা শেষ করার আগে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। এতে আগামী কালের গবেষণার সুবিধা হতে পারে। টাবু ও নৈতিক নিষেধের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা জোর দিলেও দুইয়ের মধ্যে মনোবিদ্যার দিক থেকে যে তফাত আছে সে-বিষয়ে আমাদের কোনও মতভেদ নেই। এমন নিষেধগুলি টাবুর আকারে যে দেখা যায় না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মূল উভয়বল তার সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে।

সমীক্ষণের বিচারে টাবুর ব্যাপারে অনুকর্ষী উদ্বায়ুর সঙ্গে এর মিল কিভাবে দেখানো যায় সেইদিকে লক্ষ রেখেই আমরা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু টাবু উদ্বায়ু নয়—এটা একটা সামাজিক রচনা; তাই এও প্রমাণ করা আমাদের দায়িত্ব যে উদ্বায়ু ও সংস্কৃতি-জাত টাবুর মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ কোথায়।

এখানে আমি পুনরায় একটিমাত্র ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করব। আদিম জাতির লোকেরা টাবু নিয়ম ভাঙার দরুন যে-শাস্তির ভয় করে তা, হয় কোনও কঠিন ব্যাধির ভয় নয়তো মৃত্যুর ভয়। এই শাস্তির ভয় কেবল তারই যে নিয়মভঙ্গ করে অপরাধী হয়েছে। অনুকর্ষী উদ্বায়ুর ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য-প্রকার। এক্ষেত্রে রোগী যদি নিষিদ্ধ কিছু করতে চায়, তা হলে তার নিজের শাস্তি পাবার ভয় সে করে না; তার ভয় হয় অন্যের শাস্তির কথা ভেবে। এই অন্য ব্যক্তিটি সাধারণতঃ এমন কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়। কিন্তু সমীক্ষণের দ্বারা দেখা গেছে যে এই লোকটি রোগীর কোনও একজন বিশেষ পরিচিত ও ভালবাসার পাত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে, বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিটি যেন পরার্থবাদী (altruist) আর আদিম মানবটি যেন অহংবাদী (egotistical)। যখন স্বাভাবিকভাবে অপরাধীর শাস্তি না হয়, কেবল তখনই বর্বরদের মধ্যে আশঙ্কা জাগে যে, তাদের সকলকেই এই রীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। এবং সেইজন্য তারা নিজেরাই অপরাধীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। এই দৃঢ়তার (solidarity) মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব সোজা। এটা হচ্ছে সংক্রমণের ভয়, বা উদাহরণটি অনুকরণ করার প্রলোভনের অর্থাৎ টাবুর সংক্রামক শক্তির ভয়। যদি কোনও ব্যক্তি তার অবদমিত বাসনার তৃপ্তিদানে সমর্থ হয় তা হলে সেই বাসনা তার আর সকল সঙ্গীদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করবে। অতএব প্রলোভনকে দমন করে রাখার জন্য এই ঈর্ষিত ব্যক্তিটিকে তার দুঃসাহসিকতার ফলভোগ থেকে বঞ্চিত করা একান্তই দরকার। প্রায়ই দেখা যায় যে এই শাস্তিদান কাজের মারফৎ শাস্তিদাতারা প্রতিশোধ গ্রহণের নামে ঐ একই রীতিবিরুদ্ধ কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করে। ইহা সত্যই মানব রচিত অপরাধ সংহিতার (code) মূল সূত্রগুলির মধ্যে একটি। এই নিয়ম অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি (criminal) ও সমাজের যারা তার অপরাধের প্রতিশোধ নেয় উভয়ের ক্ষেত্রেই ঐ একই নিষিদ্ধ আবেগ বর্তমান, এ কথা ধরে নেওয়া খুবই সমীচীন।

ধর্মপ্রাণ লোকেরা যে বলে আমরা সকলে একান্তই পাপীর দল, মনঃসমীক্ষণ সে-কথা অনুমোদন করে। কিন্তু তা হলে বায়ুগ্রস্তেরা যে তাদের নিজেদের ভয়ের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে তাদের প্রিয়জনের জন্য এত চিন্তা করে, এ অপ্রত্যাশিত ঔদার্যের ব্যাখ্যা আমরা কি করে করব?

মনঃসমীক্ষণিক (psychoanalytic) গবেষণা থেকে দেখা যায় যে এই ঔদার্য মৌলিক নয়। আসলে, অর্থাৎ রোগের সূত্রপাতে শাস্তির ভয়টা নিজের শরীরেই প্রযুক্ত হ'ত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেরই জীবন নাশের ভয় ছিল। অন্য ব্যক্তি যে প্রিয়পাত্র, তার প্রতি মৃত্যু-ভয়টা পরে অভিক্রান্ত (displacement) হয়েছে। মানসিক ক্রিয়া এ ক্ষেত্রে কিছুটা জটিল হলেও তার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ দখল আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু-কামনা-রূপ একটা দুষ্ট মানসিক আবেগ সব সময়ই যে-কোনও নিষিদ্ধকরণের মূলে বর্তমান থাকে। নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য এটা অবদমিত হয়। তারপর ঐ নিষেধটি একটি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় ; যে-কাজ অভিক্রান্ত হয়ে সাধারণতঃ শত্রুর বদলে প্রিয়পাত্রের প্রতি প্রযুক্ত হয়। এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলেই মৃত্যু-সাজার কোপে পড়তে হয়। এই প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে চলে। প্রিয়পাত্র তৃতীয় ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আদি মৃত্যু-কামনা রূপান্তরিত হয় মৃত্যু-ভয়ে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, উদ্বায়ুর কোমল পরার্থিতা মূলতঃ উলটোমুখি বর্বর অহমিকার ক্ষতিপূরক ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি আমরা সামাজিক ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করি তা হলে এই প্রক্ষোভীয় আবেগগুলি যা যৌনবিষয় বাদ দিয়ে ভিন্ন মানুষের প্রতি সম্মানের মাধ্যমে নির্ণীত হয় সেই সব সামাজিক ব্যবহারের অন্তর্ধান যে উদ্বায়ুর বিশেষ লক্ষণ সে-কথা জোর দিয়েই বলা যায়। এই শেষোক্ত ব্যবহার পরে অতি ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আত্মগোপন করে।

এই সব সামাজিক আবেগের উৎপত্তি ও মানুষের অন্যান্য মৌলিক আবেগের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি তাই নিয়ে আর কালক্ষেপ করব না। তার বদলে আর একটি উদাহরণের সাহায্যে উদ্বায়ুর দ্বিতীয় বিশেষত্বটির সন্ধান আমরা করব। যে রূপ নিয়ে টাবু আত্মপ্রকাশ করে তার সঙ্গে উদ্বায়ুদের স্পর্শভয়ের (touching fobia), *delire de toucher*, সাদৃশ্য আছে সবচেয়ে বেশী। সত্যি বলতে কি কামজ-স্পর্শের (sexual touching) নিষিদ্ধতার সঙ্গে এই উদ্বায়ু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এবং উদ্দিষ্ট শক্তি (motive power) যা উদ্বায়ুর ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অভিক্রান্ত হয়েছে তা যে মূলতঃ কামজ সে-কথা মনঃসমীক্ষণ বেশ নির্বিশেষে প্রমাণ করেছে। ইহা সহজেই বোঝা যায় যে. টাবুর বেলায় স্পর্শ সম্বন্ধে নিষিদ্ধতা শুধু যে যৌনতার দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপুর্ণ তা নয়। বরং আক্রমণ, সংগ্রহণ ও ব্যক্তিগত প্রকাশের দিক থেকে আরও সর্বজনগ্রাহ্য। যদি দলপতিকে বা তার স্পর্শিত কোনও জিনিসকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হয়, তার অর্থ হচ্ছে, এক সময়ে যে-ইচ্ছা বা আবেগ দলপতিকে সন্দেহজনক ভেবে তার পাহারাদারীতে অংশ গ্রহণ করেছে সেই ইচ্ছা বা আবেগটির উপরই এখন নিষেধবিধি জারি করা হচ্ছে। এমন কি এই আবেগটিই দলপতির অভিষেক হবার পুর্বে তার দৈহিক নির্যাতনেও অংশগ্রহণ করেছে (পুর্বোল্লেখ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আবেগের সামাজিক দিকটার উপরে যৌন অংশটির আধিক্যই হচ্ছে বায়ুগ্রস্ততার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সামাজিক মানসাবেগগুলি সৃষ্টি হয়েছে অহমিকা ও কামিতা উভয় অংশেরই সংমিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ সত্তা থেকে।

টাবু ও অনুকর্ষী উদ্বায়ুর মধ্যে এই একটি তুলনা থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, উদ্বায়ুর আকৃতিগত সতন্ত্রতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কি, এবং কি হিসাবে উদ্বায়ুর মানসতার আলোচনা সংস্কৃতির প্রগতিকে বোঝার জন্য প্রয়োজন।

এদিক থেকে উদ্বায়ু চারুকলা, ধর্ম ও দর্শনের মহান সামাজিক সৃষ্টির সঙ্গে খুব চমৎকার ও সুদূরপ্রসারী ঐক্য রক্ষা করছে। অন্যদিকে আবার দেখে শুনে মনে হয় এগুলো ঐ সবের বিকৃতি।

আমরা বলতে পারি যে, হিষ্টিরিয়া হচ্ছে শিল্প সৃষ্টির, অনুকর্ষী উদ্বায়ু ধর্মের এবং ভ্রমবাতুলতার ভ্রান্তি দার্শনিক পদ্ধতির ব্যঙ্গাত্মক অভিব্যক্তি। এই বিচ্যুতির বিশ্লেষণ করে শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, উদ্বায়ুর গঠন অসামাজিক। সমাজে যা সমষ্টিগত চেষ্টায় সাধিত হয়েছে উদ্বায়ুগ্রস্তেরা তা নিজস্ব উপায়ে সাধন করতে চায়। উদ্বায়ুগ্রস্তদের আবেগের বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, যৌনধর্মী চালক শক্তিই তাদের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। অথচ অনুরূপ সাংস্কৃতিক সংগঠন নির্ভর করে সামাজিক আবেগগুলির উপর এবং অহমিকা ও যৌনতার উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত এই ধরনের বিষয়ের উপর। মনে হয়, আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে যেভাবে বাঁধতে পারে, যৌন-চাহিদা মানুষকে সে-ভাবে বাঁধতে পারে না। যৌনতার সন্তুষ্টি মূলতঃ মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

উৎপত্তির ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, উদ্বায়ুগ্রস্তদের অসামাজিক প্রকৃতির সৃষ্টি হচ্ছে আসলে অপ্রিয় বাস্তব থেকে কল্পনা রাজ্যের প্রিয়তর পরিবেশে বিচরণ করার বাসনা থেকে। উদ্বায়ুগ্রস্তেরা যে-বাস্তব জগৎকে পরিত্যাগ করে সেই জগৎ মানুষের সমাজ কর্তৃক এবং তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা শাসিত; অতএব এই বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মানব-সংসর্গ ত্যাগও ঘটে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগী

কনক মজুমদার, এম. এস্‌সি.*

সাধারণতঃ এটা ধ'রে নেওয়া হয় যে, যে-সব ব্যক্তির মনের গোলমাল হয় ও মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার্থে আসে তাদের উপর আর কোনও রকম ভরসা করা যায় না। তারা যেন আলাদা একটা বিশেষ মানুষ-গোষ্ঠীভুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পরিবর্তন কোনও কালে হবে কিনা বলা কঠিন; তবে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ও আরও হবে এ আশা করা যায়।

আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শনে আসছেন। তাঁদের মনোভাব লক্ষ করলে মনে হয় তাঁরা যেন একদল বিশেষ ধরনের প্রাণী দেখতে এসেছেন। পাগলে কামড়ে দেবে, খামচে দেবে, কি জানি কি করবে—এই আশঙ্কা নিয়ে রোগীদের তাঁরা দেখে থাকেন। যখন তাঁরা দেখতে পান যে রোগী বেশ ভালভাবেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে, গল্প করছে, তখন তাঁরা অবাক হন। কোনও পশু পাখীকে কথা বলতে দেখলে মানুষের মনে যে-বিস্ময় জাগে, অনেকটা সেই ধরনের অবাক বিস্ময় ফুটে ওঠে এঁদের চোখে মুখে।

মানুষের কোনও কঠিন শারীরিক ছোঁয়াচে রোগ হ'লে এবং চিকিৎসায় সেরে গেলে, সে-কথা মনে রেখে কেউ তাকে চিরদিন ভয়ে দূরে সরিয়ে রাখে না। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য রকম ঘটে; এইটেই দুঃখের বিষয়। মানসিক রোগী সুস্থ হবার পরও চিরিদিন সকলের চোখে পৃথক হয়ে থাকে এবং সে-দৃষ্টি সহ্য করে তাকে জীবন কাটাতে হয়।

মানসিক রোগ মাত্রেই বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়, এ রকম মনে করা খুব ঠিক নয়। মানসিক রোগের মূলে থাকে প্রক্ষোভজ ভারসাম্যহীনতা। মানসিক রোগীর যত রকম উপসর্গ হয়, প্রায় সে-সবই স্বভাবী (normal) মানুষের মধ্যেও আছে; কেবল মাত্রার তারতম্য থাকে। তাই মানসিক রোগী রোগ সত্ত্বেও বহু কাজকর্ম স্বভাবী মানুষের মতোই করতে পারে। মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু রোগী নানারকম কাজ কর্ম করে রেখে যান, যা দেখে হাসপাতাল পরিদর্শনকারীরা অবাক হন—অথচ এতে অবাক হবার কিছুই নেই।

একজন রোগিণীর রোগলক্ষণ ছিল—স্বামীকে সন্দেহ, শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না-হওয়া, সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝগড়া, মারামারি পর্যন্ত ঘটে যাওয়া, এবং শেষপর্যন্ত বাপের বাড়ী চলে-যাওয়া; আবার সেখানে থাকতে না পেরে স্বামীর কাছে চলে-আসা। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন চলত। এ রকম হয়তো বহু পরিবারেই ঘটে কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা অসুস্থতার পর্যায় পড়ে যায়। প্রথম প্রথম রোগিণী নিজের ব্যবহারকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা করত; কিন্তু

* মনোবিৎ হিন্দী হাই স্কুল, কলিকাতা, এবং লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের মনোরোগ সমাজকর্মী ও সহ-অধিকর্ত্রী।

কিছু দিন পরে তার অন্তর্দৃষ্টি এল যে, বারবার যখন একই রকম ঘটছে তখন এটা রোগই বটে। মহিলাটির অন্যান্য সব কাজকর্ম সাধারণ লোকের মতই; কোনও প্রভেদ নেই বললেই চলে।

যারা সন্দেহ রোগে ভোগে তাদের সব রকম লোকের চরিত্র বিশ্লেষণ করবার ঝোঁক থাকে। তারা খুঁটিয়ে অন্য লোকের ব্যবহার সমালোচনা করতে ভালবাসে ও পারে। তাদের মধ্য থেকেই বহু সমালোচকের সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত মহিলাটিকে বলা হয়েছিল অন্যান্য রোগীদের চরিত্র চিত্রণ করতে। নিম্নে তাঁরই লেখা ডায়েরীর কিছু অংশ দেওয়া হ'ল—যেমন লেখা ঠিক তেমনই তুলে দেওয়া হ'ল; ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন করা ব্যতিরেকে অন্য কোনও রকম সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় নি।

* * * *

"আবার এসেছি লুম্বিনি পার্কে। রাত্রি ৯টায়

"বড় অস্থির আমার মন। কোন কাজে বেশীদিন মন বসে না। মনটা আমার এমন কেন? শরতের প্রকৃতির মতই এলোমেলো! এই সময়েতে চঞ্চলতার কারণ যদিও হোত তাহলেও মনকে বোঝাতে পারতাম। কিন্তু নিজের মনকে ঠকানো যায় না। আমি জানি আমার এই অশান্ত অস্থিরতার অঙ্কুর আছে আমার নিজের ভেতরে। অনেক ভিতরে অনেক গভীরে—সে কোন্ নিভৃতে এই অশান্তির বোধটা জেগে ওঠে রাত্রি দিন। এই অতৃপ্তির বোধ আমি হয়তো নিয়েই জন্মেছিলাম। থেকে থেকেই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি আসে না—তার কারণ এই বোধ। মর্মের কোন্ গভীরে যে মনের এই অশান্ত বীজ লুকিয়ে আছে কে তাকে আবিষ্কার করবে। পারবেন কি কোন ডাক্তার?

"মনে মনে কত যে লিখি তার আর শেষ নেই, কিন্তু হাতে-কলমে নিয়ে শব্দের মালা সাজাতে কেন জানি আজকাল আর ভাল লাগে না। কি যে বিচিত্র এই মন। সব কিছুতেই আজকাল মনে হয় কি হবে কিছু লিখে, কি হবে কিছু ক'রে। পিছনের দশটা বছরের পানে যখন ফিরে তাকাই শুধু ক্রোধ আর ব্যর্থতার বন্যার থৈ থৈ নৃত্য। মনে মনে ভাবি এই দারুণ দুরন্ত ক্রোধ আর বিচিত্র এক বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলরাশিতে আমার ভবিষ্যত, আমার সন্তান, আমার স্বামী সব কিছুকে ডুবিয়ে দেব? ডুবিয়ে আমি দিতে পারি ওদের কিন্তু আমার জীবনের মোড় ফেরান ডাঙ্গার আশ্বাসে ওদের কি আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই আমার এই মনের ওপর। অসহায়, একান্তই অসহায় আমি, আমার এই কাজে। কত বাঁধনে যে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করি আমার এই বল্গাছেঁড়া মনকে, কিন্তু হার স্বীকার করেছি এই রশিছেঁড়া মনের কাছে। কোন্ কবেকার, কোথাকার একটা ব্যর্থতার জ্বালা মনের কোন্ কোণায় লুকিয়ে বসে থেকে আমায় এমন করে ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে জানে। মনটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কুটিকুটি করে দেখতে ইচ্ছে করে কোন্ জ্বালায় আমি জ্বলে যাই। কোন জ্বালা আমাকে এমন ক'রে পাগল করে ছেড়ে দেয়। আমার জীবনের সমস্ত মধুর মুহূর্তগুলোকে কালির কালো দিয়ে ঢেকে দেয় আবার হয়তো স্বপ্নময় দিনগুলো ফিরিয়ে এনেছি, আবার কালোর কালিতে ক্রোধের বহ্নিতে ঢেকে গেল জীবনের সব আলো।

"মানুষ কি পারে বারবার কালির শেষ বিন্দুকে মুছে ফেলতে? কিন্তু আমার স্বভাবের যেটুকু ভাল আছে সেটুকু দিয়েই বারবার মুছেছি আমার জীবনের যত কালোর বিন্দুগুলো, কিন্তু এইবার শেষ। মনে মনে ভাবি স্বভাব যদি এইই হয় তবে কেমন করে কোন পথে আমি ভাল হবো।

ডাক্তারদের আশ্বাস শুধু যেন একটুখানি সান্ত্বনার প্রলেপ বলে মনে হয়। সান্ত্বনার বাণী কি আশ্বাস ভরা জীবনে আমায় ফিরিয়ে দেবে? ভগবানের পায়ে শত শতবার মাথা খুঁড়েছি। মানতের পর মানত করেছি। বাঁদর ভগবান আমার কোন কথাই শোনেন নি। ভগবানের ওপর যেন অবিশ্বাস আসে, এত আকুল ডাক কি ভগবান শোনেন না? না ভগবান বলে কিছু নেই জগতে। তা নয় ভগবান আমায় যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন নিশ্চয়ই। এত ব্যথাতেও আমি তাঁকে ডাকা ভুলি কিনা তাই বোধহয় দেখেন। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। শুধু চোখের জল ফেলেছি আর ভগবানকে ডেকেছি ঠাকুর আমায় মানুষ করো, আমাকে ভাল করো, আমায় দেখে যেন কেউ দুঃখ না পায়। আমার সন্তানেরা আমার গর্ভের সন্তান, তাই কেঁদেছি আর বলেছি ঠাকুর আমার বিকৃতি, ঈর্ষা আর দুরন্ত ক্রোধ থেকে আমার সন্তানদের মুক্ত রেখ। ওরা যেন আমার মত তিক্ত মন নিয়ে আমারই মত কষ্ট না পায়। আমার চোখের জলের তপস্যার কোন ফল কি কোনদিনই পাব না? এইভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে এই চারটি জীবন? কে জানে। কে জানে। রমাদি আমায় বলেন লিখতে। কি লিখি, আর কি-ই বা বলি। যা কিছু লিখবো সব কিছুই হোয়েছে লেখা বহুদিন হতে, বহুতর ভাবে। আর যা কিছু বলবো তা বহুজনের মুখে হয়েছে মুখরিত। আর কি-ই বা হবে কিছু লিখে আর কিছু বলে? জীবনের অর্ধেক দিন ত কেটেই গেছে শুধু বাজে কথায় আর বাজে কাজে। কোটি কোটি জীবনের মাঝে ছোট্ট এই এইটুকু জীবন যে কোন দিন পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশব্দে নিঃশেষ হোয়ে যাবে। যাদের মনে আমার দাগ থাকবে কালের চক্র এসে মুছে দেবে সে দাগ। কোটীকে গোটীক হওয়ার সাধনা সকলের নয়। সাধনা থাকলেও সিদ্ধি শুধু দু'একজনের ভাগ্যে জোটে। তাই সাধনার পিছনে শুধুই মাথা কুটে কি হবে। তার চেয়ে আসল ভাবনার পাখা মেলে দাও। শুধু গান আর শুধু হাসিতে ডুবিয়ে আর ভরিয়ে দাও মনের প্রতিটি অলিগলি।..."

"(Pt*) ঠাকুমার অভিমান

"আয়ারা সুপারী দেয়নি বলে উঠানে একেবারে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আমাদের ঠাকুমা। ৭৫ বছরের ঠাকুমা যেন ছোট্ট অবুঝ চার বছরের একটি দুরন্ত অভিমানিনি মেয়ে। এদিকে টনটনে জ্ঞান আছে,—উনি ৭৫ বছরের ঠাকুমা, কিন্তু কার্যকলাপের বেলায় নিতান্ত শিশুর মত। যখন যাঁর যা কিছু পান তক্ষুনি জানালা গলিয়ে একেবারে বাড়ীর বাইরে ফেলে দেন। শুধু একটুখানি চোখের আড়াল, ব্যাস্ উনি কারুর কিছু না কিছু ফেলবেনই। যদি তাই নিয়ে কেউ বকলো তাহলেই গালাগালির গোলাবর্ষণ চললো। তার মধ্যে হারামজাদী "গুখেকোর বেটী" এই দুটো বেশী। তার মধ্যে রাক্ষসী খোক্কসি মুখপুড়ী ইত্যাদি তো আছেই। যদি জোর করে ধরে কেউ বসিয়ে দেয় তাহলে তাকে লাথি দেখিয়ে, মুখ ভেংচে হাউ মাউ করে কেঁদে একেবারে হাট বাধিয়ে দেন। কত Ptদের কত জিনিস যে উনি ফেলে দিয়েছেন, নষ্ট করেছেন। সব Ptই ওঁর নাতনী আর সবাইকেই হারামজাদী বলে ডাকেন। তবু ওঁকে আয়া, নার্স, পেসেন্ট সবাই ভালবাসে। কারণ ওঁর মধ্যে যে শিশুসুলভ সরলতা সেটাই ওঁর স্বভাবের সৌন্দর্য আর সেইটুকুই সকলকে আকর্ষণ করে, ভালবাসতে বাধ্য করে। কারণ আমার মনে হয়

* Pt—রোগী

সকলের মধ্যেই ছোট্ট একটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। চমৎকার ছড়া বলেন কথায় কথায়। একদিন কি কথায় উনি চুপ করে আছেন, আমি বললাম কথা বলুন। উনি বললেন চুপ কর্—

'কি কথা কহিতে
কি কথা কহিব
কথা কয়ে কি মান খোয়াব
যখন কথার যোগ্য হবো
দাঁড়িয়ে কথার জবাব দেব
এক কথাতে হটিয়ে দেব।'

"একদিন কথায় কথায় ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ঠাকুমা আপনাকে দাদু কি বলে ডাকতেন? উনি তক্ষুনি উত্তর দিলেন "আবদারিণী নাম রেখেছিল শ্যাম।" ঠাকুমার ৭৫ বছর বয়স হলে কি হবে উনি দিব্যি আধুনিক। জিজ্ঞেস করলাম আপনার বরের নাম কি ছিল? ঠাকুমা অম্লান বদনে বললেন……। সার্থক নাম রেখেছিলেন……"আদরিণী" তাই বটে! সার্থক নামটি। এখানের সকলেরই তিনি আদরিণী। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি এই শিশুর মত ছোট্ট মানুষকে কোন্ প্রাণে—বাড়ীতে ওঁকে দেখার মত একটী লোক রেখে বাড়ীতে কি চিকিৎসা করা সম্ভব নয় কিছুতেই! জানিনা কোন সে নিষ্ঠুর পুত্রকন্যা।"

"মিলন

"মস্তবড় অমিল নিয়ে মিলনের জীবন পড়ে আছে ভবিষ্যতের জন্য। কি গভীর হৃদয় ক্ষত বহন করছে ঐ মেয়েটী নিঃশব্দে নীরবে। মেয়েটী যখন হাসে তখন আমার মনে হয় কান্নার চেয়ে হৃদয়বিদারক সে দৃশ্য। হাসছে, তাস খেলছে, পড়ছে; কিন্তু আমার তো মনে হয় দূর আকাশে ওর ছড়িয়ে দেওয়া দৃষ্টি দেখে বড় কঠিন বেদনা ওর হৃদয়কে প্রতিটি মূহূর্তে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ জীবন পরিক্রমার পাথেয় কি তাই শুধু ভাবি। ও নিজেও তাই বলে, কি নিয়ে বাঁচবো, কোন্ খুঁটি ধরে দাঁড়াব। ও নিজে থেকেই মাঝে মাঝে অনেক কথা বলে। চুপ করে শুনে যাই। "ও" যদি ওরকম নিষ্ঠুরের মত একটি মাত্র সন্তানকে নিয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে তার প্রতি আমার এতটুকু মমতাই বা থাকবে কেন। "ও" মানে মিলনদির স্বামী। মিলন বলে "কেন কেন ও ওমনিকরে আমার অতনুকে নিয়ে চলে গেল। আমাকে কেন নিয়ে গেল না আর যদি আমাকেই নিল না তবে বাবুন আমার নারায়ণকে কেন নিল। মাঝে মাঝেই বলে আমিও যদি ওমনি করে চলে যেতে পারি তবেই যেন আমার শান্তি হয়। বারবারই বলে আমায় কেন নিল না। যেদিন "ও" আর অতনু চলে গেল চিরদিনের মত আমার কাছ থেকে তার আগের দিনও আভাসেও আমি জানতে পারি নি আমার জীবনের সব কিছুর অবসান তার পরের দিন। আগের দিন আমার স্বামী বললো চলো মিলন, তুমি যেখানে বেড়াতে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। মিলন বললো চলো দিদির বাড়ী বেরিয়ে আসি। ওরা সোনারপুর থেকে বেহালায় দিদি অমলার বাড়ী বেড়াতে এলো। একদিন থেকে পরের দিন বিকেলে ওরা ফিরে গেল কর্মস্থানে। মিলনের স্বামী ডাক্তার ছিলেন। রাত্রে বাড়ীতে এসে মিলন রান্না টান্না করে, শোবার জন্য বিছানা করলো নিজের হাতে। যে ঘরে স্বামী-পুত্র নিয়ে মিলন শোয় সে ঘরে একটা ছোট্ট খাটে

স্বামী শুতেন আর নীচে বিছানা করে মিলন ছেলে অতনুকে নিয়ে শুতো আর পাশের ঘরে মিলনের ছোট ননদ শুতেন। মিলনের শ্বশুর বাড়ীর বেশীর ভাগ সকলেই তখন মিলনের স্বামীর ওপর নির্ভর করে থাকেন। এজন্য মাঝে মাঝে মিলনের সংসারে অনেক অশান্তি দেখা দিত। যার ফলে দণ্ড দিতে হয়েছে বারবার মিলনকে লুম্বিনীতে এসে। একেই নীরব প্রকৃতির মেয়ে আর সহ্য করে করে আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

"যার ফলে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতো, আরও হয়েছে অতনুর জন্মের পরই মিলন আবার গর্ভবতী হয়েছিল। স্বামী ২ মাসের সময় জোর করে গর্ভপাত করাতে বাধ্য করে মিলনের। ওষুধ দিয়ে নয় নিজের হাতে ওর স্বামী সে কাজ করেন। আরও অনেক অনেক সহ্য করেছে সে মেয়ে, ৫ বছরের বিবাহিত জীবনে। আরেকবার সেবারেও সন্তানকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন মিলনের স্বামী। সেবারে মিলনই বুঝতে পেরে স্বামীর পকেট থেকে ফীনএর সিরিঞ্জ টেনে বের করে হাসপাতাল ষ্টাফদের বলেন, স্বামীকে ধরে ফেলতে। তারপর মিলনই জোর করে একবার স্বামীকে লুম্বিনীতে রেখে যায় স্বামীর সুস্থ হবার অপেক্ষায়। কিন্তু না, লুম্বিনী সুস্থ করতে পারে নি তার স্বামীকে। তারই প্রমাণ সে দিনের সেই রাত্রি শেষের প্রভাত। মিলন কি জানি কি ভেবে সেদিন ননদের ঘরে শুয়েছিল। সকালে উঠে যেমন স্বামীকে চা দেয় তেমনি দিয়েছে সে চা। স্বামী কোন কথা না বলে সেই চা গ্রহণ করলেন, এবং কোন কথা না বলে বাথরুম থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় পরে তৈরী হলেন বাইরে যাবার জন্য। মিলনের চোখে বোবা বিস্ময়। কারণ মিলনকে না নিয়ে স্বামী কোথাও যান না। আর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল তার স্বামীর। ভগবান মানতেন না আর মিলনকে শাঁখা সিঁদুর কিছু ব্যবহার করতে দিতেন না। উনি ডিউটির সময়ও প্রায়ই মিলনকে নিয়ে বেরুতেন। কাজের কয়েক ঘণ্টা বাদে বেশীর ভাগ সময় মিলনকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে রাখতেন, ভীষণ ভালবাসতেন। মিলনকে ছাড়া তাঁর এক মুহূর্তও কাটতো না। কিছু মানতেন না শুধু জানতেন মিলনকে। কিন্তু অন্তিম যাত্রায় কেন মিলনকে ফেলে শুধু পুত্রকে নিয়ে উনি চলে গেলেন সেটাই মিলনের জীবনে পরম বিস্ময়। যে এত ভালবাসত সে কি করে অমন করে পালিয়ে গেল। যেদিন গেলেন ওঁর স্বামী সেদিন মিলনও পিছু নিয়েছিল ওদের সাথে যাবে বলে, আর কি জানি কি ভেবে তার অতনুও বলছিল "না মা আমি বেড়াতে যাব না বাবুর সাথে, আমি তোমার কাছে থাকবো।" মিলনের বিশ্বাস ওর পুত্র বুঝতে পেরেছিল যে হয়তো এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। ওর পুত্রের যেতে না চাওয়ার আকুতিটুকু হাহাকার করে ফেরে মিলনের বুকে। মিলনের জীবনের সবটুকু বলতে গেলে উপন্যাসেও কুলবে না। আজ মিলনের জীবনের আশ্বাস শুধু ওর জীবনের শিক্ষা ক্ষেত্রের ডিগ্রীটুকু। ওটুকুর মাঝে আছে কাজ, আর ঐ ওর সান্ত্বনা।"

"আজ দুপুরের একটু পরে বিকেলের একটু আগে অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়ে মুহুর্মুহু শুনলাম বজ্রের ডম্বরু, আর ঝড়ের শনশনানি। আর কি আরাম যে লাগছিল, ঝড়ের নাচনের আনন্দ শুনতে। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ এসে খুলে দিয়ে গেল বন্ধ দুয়ার জানালা। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলাম প্রকৃতির রূপ দর্শনের আশায়। সঙ্গে সঙ্গে টুকটাক আওয়াজের সাথে সাথে নেমে এল শিলাবৃষ্টি। লুম্বিনীর মাঠ, ঘাট, উঠান সব ভরে গেল শুভ্র শিলায়। আহা মরি কি সেরূপ! যে যেখান থেকে পারলো নার্স, আয়া, পেসেণ্ট ছুটে এলো শিলা কুড়তে। সেই হুড়োহুড়ির মাতন লাগলো সকলের মাঝে। আমিও কুড়োতে কুড়োতে ৫০, ৩০, ২০ বয়সের শিলা গ্রহণে ব্যস্ত প্রতিটি নারীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম নানা বয়সের মেয়েদের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা চিরন্তন শিশুকে।"

(ক্রমশঃ)

সাহায্য-ভিক্ষা

এই পত্রিকার গত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। কায়ক্লেশে লুম্বিনির প্রাণটুকু বাঁচাইয়া রাখা ব্যতিরেকে আর বিশেষ কোনও উন্নতির কথা লিখিবার নাই। হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা প্রারম্ভ হইতে গত ২৪ বৎসরের মধ্যে কোনও দিনই ভাল হইতে পারে নাই। সঞ্চয়ের কথা বলিতেছি না; নিতান্ত প্রয়োজনগুলি সহজভাবে মিটাইতে পারিলেই আমরা স্বস্তি বোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু সে-সুযোগ আজও আসিল না। কবে সে-সুদিন আসিবে, কিংবা আদৌ সেদিন আসিবে কিনা জানি না। তবু দুর্বল সন্তানের প্রতি পিতামাতার সাগ্রহ যত্ন ও মমতার মত মনোভাব লইয়া লুম্বিনির কর্মিগণ দীর্ঘ ২৪ বৎসর এই অতি প্রয়োজনীয় হাসপাতালটিকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—একদিন সে সবল যৌবনের রূপ লইয়া দেখা দিবে এই আশায়।

অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানিয়া ইহার কর্মিগণের প্রশংসা করেন এবং তাহাদের আদর্শনিষ্ঠার জন্য সম্মান দিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার সদা অভাব-অনটনের অবস্থার মধ্যে থাকা ও সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার পথ ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও কাজকর্মে নিজেদের সুখ-সুবিধা অর্জনের উপদেশ দেন। তাঁহাদের মতে এইরূপ ভিক্ষা করিয়া হাসপাতাল পরিচালনা অসম্ভব; ইহা কর্মিদের প্রাণনাশক মাত্র। আমরা জানি ইঁহারাও লুম্বিনির শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রতিষ্ঠানের কর্মিদের প্রতি সহানুভূতি বেশী থাকার ফলেই তাহাদের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া ইঁহারা বিচলিত হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আজও যখন আমরা সহজভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ, এই হাসপাতাল পরিচালনার জন্য পাইলাম না তখন ভিক্ষা ভিন্ন আর উপায় কি? আর আমাদের দেশে ভিক্ষা করার রীতি তো দেবলোকেও প্রচলিত আছে এবং তাহা পুজিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের অন্নপূর্ণার দুয়ারে দেবাদিদেব মহাদেব ভিক্ষা পাত্র লইয়া হাত বাড়াইয়াছেন। এমন ভিখারীই বা আর কোথায় আছে! দেবলোক ছাড়িয়া এই মর্তলোকে নামিয়া আসিলে চারিদিকে তো কেবল ভিক্ষার জন্য ছুটাছুটিই চোখে পড়ে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে স্বাধীন ভারত গড়িয়া তুলিবার নানান পরিকল্পনা সফল করিবার নিমিত্ত আমরা কেবলই কি ভিক্ষার থলি হাতে ঝুলাইয়া অর্থের জন্য, খাদ্যের জন্য, যন্ত্রপাতির জন্য ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য, এমন কি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা উপকরণের সাহায্যের জন্য সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়া এ যুগের ধনকুবেরদের দুয়ারে বড় ছোট নির্বিচারে, ধন্না দিতেছি না! আসল কথা এই যে উদ্দেশ্য শুভ মনে করিলে, সেই শুভ কার্যের জন্য, ভিক্ষা করা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। শুনিতে পাই ভিক্ষায় যাহা মিলিতেছে তাহাতে আমাদের দেশের প্রভূত উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইতেছে। সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। দুই একটা নদীর বাঁধ বা বড় বড় বাড়ী দালান কোঠা যাহা দেখিয়াছি তাহা আমাদের সত্য উন্নতি কতটুকু ও কত ব্যয়ে সাধন করিতে পারিয়াছে, জানি না। কেবল জানি যে এই সমস্তগুলির জন্য আমরা কয়েক হাজার কোটি টাকা বিদেশ হইতে ঋণ ভিক্ষা

করিয়া আনিয়াছি। সংবাদপত্রে রাষ্ট্রনায়কদের ও অর্থবিদ্‌দের যে মত দেখিতে পাই তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, এইরূপ ভিক্ষা কিংবা ঋণ করিতে আপত্তি নাই ; বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আমাদের নাকি আর গতিও নাই।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমরা হাসপাতালের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া আসিতেছি। তখন যদি ইহা করা সম্ভব হইয়া থাকে, এখনই বা সম্ভব হইবে না কেন ? মানসিক হাসপাতাল গড়িয়া তোলা এবং মানসিক রোগীদের যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমরা কল্যাণকর কাজ বলিয়া মনে করি। ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে এই বিশ্বাস করি। পরিবারের মধ্যে মানসিক রোগী থাকিলে তাহার পরিণাম অন্যান্য লোকদিগের পক্ষে, বিশেষ করিয়া শিশুদের পক্ষে কত অশুভ ও ক্ষতিকর, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাই আমরা নিজেদের ও আরও দশজন শুভার্থীদের সহায়তায় সামাজিক এই অসুস্থ অবস্থার যথাসম্ভব প্রতিকারের চেষ্টা করি। এই উদ্দেশ্য লইয়াই লুম্বিনি হাসপাতাল তিনটি মাত্র শয্যা লইয়া আরম্ভ করা হয়। এখন এখানে ১৭৫টি শয্যা আছে। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থাযুক্ত মানসিক হাসপাতাল আর নাই এ কথা বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশে বহু সহস্র মানসিক রোগী আছে। তাহার কিছু অংশও যদি লুম্বিনিতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে, তাহাই আমাদের ২৪ বৎসরের চেষ্টা সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই আমাদের আনন্দ। আবেগের উচ্ছ্বাস বাদ দিয়া কেবল গাণিতিক হিসাবে আমাদের প্রায় ১৫০ কর্মীর মধ্যে মাথাপিছু চারজন করিয়া বিকৃতমনা মানুষকে যদি সুস্থ সামাজিক মানুষ করিয়া পুনরায় গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়া থাকে তবে সমাজের যে-উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা নগণ্য নহে। আমরা জানি এবং যে-হিসাব আমরা এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি তাহা হইতে আপনারাও জানেন যে আজ পর্যন্ত এক হাজারেরও অনেক বেশী রোগী লুম্বিনি হইতে রোগমুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সমাজের ও পরিবারের আর দশজনের মতই সুস্থ ও মূল্যবান জীবনযাপন করিতেছেন। এই সত্যই আর্থিক ও তৎসংযুক্ত নানান সমস্যা প্রতিদিন বহন করিয়া চলিতে আমাদের শক্তি দেয়। আমাদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা কর্মিদের প্রতি সহৃদয়তায় তাহাদের দুঃখকষ্টে বেদনা বোধ করিয়া তাহাদের এই কর্ম হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন তাঁহাদের সমাজ-কল্যাণের উল্লিখিত দিকটা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আবার কেহ কেহ এমন মত প্রকাশ করেন যে স্বাধীন দেশে ঠিকমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য ; সুতরাং হাসপাতালের ব্যবস্থা রাষ্ট্রপরিচালকগণই করিবেন। কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে সত্য, কিন্তু আমাদের কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হইলেও, দেশে অভাব অনটন ও দুর্দশার ভার দশদিক হইতে এমন ভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে অল্প সময়ে বা সাধারণ চেষ্টায় তাহার সর্বমুখী সুব্যবস্থা হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। সুতরাং সমাজের মানুষ কেবলমাত্র রাজ্যদপ্তরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারে না। রাশিয়া প্রভৃতি দুই একটি দেশ ভিন্ন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই অধিক সংখ্যক হাসপাতালই রাজ্যসরকার দ্বারা পরিচালিত নহে। বহু সমাজকল্যাণ সংস্থা এই সকল হাসপাতাল পরিচালনা করিয়া থাকে। অবশ্য প্রয়োজনমত রাজ্যসরকারের সকল রকম সহায়তা এই প্রকার হাসপাতাল প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকে। আমরা পুর্বে এক সংখ্যায় বলিয়াছি যে লুম্বিনির মত হাসপাতাল যে ব্যয়ে যতখানি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছে, সরকারের পক্ষে তাহা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও ইহা স্বীকার করেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেবল একটিমাত্র কথাই মনে হয়, তাহা এই যে লুম্বিনির মত হাসপাতালকে সরকারের তরফ হইতে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা দান করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করা উচিত। সরকার লুম্বিনিকে সময় সময় যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহা আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐ সাহায্য না পাইলে লুম্বিনির এত উন্নতি হওয়া যে সম্ভব হইত না এ কথাও আমরা বলিয়াছি।

আমরা সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মাত্র সাহায্য চাহিয়া আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়টি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি, সরকার লুম্বিনির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এবং দেশের বর্তমান সংকট পরিস্থিতিতেও তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। লুম্বিনি সম্বন্ধে তাঁহাদের উচ্চ ধরণা হাসপাতালের কর্মিদের উৎসাহবর্ধন করে। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সরকারের নিকট হইতে প্রার্থীত সাহায্য পাইব। ঐ টাকা পাইলে আমরা কর্মিদের বেতনের হার কিছু পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারিব। বর্তমানে তাহারা যে সামান্য বেতনে হাসপাতালের কাজ করিতেছে তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের প্রতিটি জিনিস যেভাবে দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই হাসপাতালের কর্মিদের পক্ষে নিজেদের প্রাত্যহিক আহারেরই ব্যয় মিটানো অসম্ভব হইয়াছে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের এই সমস্যায় যথাসাধ্য সাহায্য করিতে একান্ত ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও, আজও অর্থাভাবের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সরকারের সাহায্য পাইলে কর্মিদের এই কষ্টকর অবস্থার কিছুটা প্রশমন সম্ভব হইবে। রোগীদেরও আরও কিছু বিশেষ সুবিধা, আমোদ বিনোদন ইত্যাদি ঐ টাকা পাইলে সম্ভব হইবে। এই সূত্রে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে "পথের পাঁচালী" ছায়াচিত্রখানি একদিন হাসপাতালের পুরুষ রোগীদের এবং অন্য একদিন স্ত্রী-রোগীদের বিনা ব্যয়ে প্রদর্শন করাইয়া রোগীদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। শহরে অনেক সিনেমা ঘর আছে। কিন্তু মানসিক রোগীদের সেই সকল স্থানে লইয়া যাওয়া ও জনসাধারণের সঙ্গে বসাইয়া ছবি দেখানো নানান কারণে নিরাপদ বা সঙ্গত হয় না। তাই সরকার হইতে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হওয়ায় রোগীদের খুবই উপকার হইয়াছে। এখন হইতে মধ্যে মধ্যে সরকারের উক্ত বিভাগ হইতে এইরূপ ছবি দেখানোর ব্যবস্থার আশ্বাস আমরা পাইয়াছি। এইজন্য হাসপাতালের তরফ হইতে সরকারকে আমাদের সাধুবাদ জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা যত দ্রুত গতিতে চলে সরকারের ব্যবস্থাপনার গতি তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। বাহির হইতে দেখিয়া আমাদের ইহাই মনে হয়। স্বাধীন দেশে ইহার পরিবর্তন সম্ভব নহে কি? নানান বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর ও তাহাদের নিয়মের বেড়াজাল পার হইতেই সময় কাটিয়া যায়। সময় মত যে সাহায্য পাইলে উপযুক্ত কাজ হইতে পারিত, সময় পার হইয়া গেলে পরে সাহায্য যাহা আসে তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় না; প্রয়োজন ততদিনে বাড়িয়া যায় এবং যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাহাতে অভাবের সামান্য অংশমাত্র পুরণ করা চলে। সময় মত উপযুক্ত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা সম্ভব। নিয়ম মানুষ গড়ে মানুষেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু সেই কল্যাণের প্রশ্ন আড়াল করিয়া নিয়মের বন্ধনই যখন প্রবল হইয়া সরকারের কর্মে কূর্ম গতি আনিয়া দেয় তখন দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য

সেই সকল বিধি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন একান্ত প্রয়োজন। জনগণ এ সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হইলে ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে। জনসাধারণকে এই দিকে সজাগ হইতে আহ্বান জানাইতেছি।

গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লুম্বিনির আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাস	আয়	ব্যয়
জুলাই	২৭৬৩২'২৯	২৭৩৩৫'১৭
অগস্ট	২৬৭৮২'৯৬	২৭৬৭৬'৮৬
সেপ্টেম্বর	২৪৬২৭'৩৫	২৭৬৭৬'৮৬

রোগী ভরতি ও নির্গম

মাস	ভরতি	নির্গম	মোট
জুলাই	৪৮	৩২	৮০
অগস্ট	৩৩	৩৬	৬৯
সেপ্টেম্বর	৩৪	৪৯	৮৩

চিকিৎসার ফলাফল

মাস	আরোগ্য	উন্নতি	অপরিবর্তিত	মৃত্যু	মোট
জুলাই	১৬	১৮	—	—	৩৪
অগস্ট	২০	১৪	২	—	৩৬
সেপ্টেম্বর	২৮	১৫	৬	১	৫০

বহির্বিভাগে মানসিক রোগী

মাস	নূতন রোগী	পুরাতন রোগী	মোট
জুলাই	৬৭	২১০	২৭৭
অগস্ট	৬১	১৯৬	২৫৬
সেপ্টেম্বর	৪৯	১৬৩	২১২

বহির্বিভাগে সাধারণ রোগী

মাস	নূতন রোগী	পুরাতন রোগী	মোট
জুলাই	১২০	৫১	১৭১
অগস্ট	১৪৯	৭৯	২২৮
সেপ্টেম্বর	৬৪	৫০	১১৪

—তরুণচন্দ্র সিংহ

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha. D.Sc., for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9.29.1.

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

তরুণচন্দ্র সিংহ

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

চিন্ত

সূচীপত্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া এবং তাহার সাহায্যে সমাজের নানান সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজের বা অপর কাহারও মতামত সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বক্তব্য মাত্র। এই পত্রিকায় ছাপা হইলেই প্রকাশিত মতবাদ সম্পাদকীয় বা পত্রিকার পরিচালক ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির অনুসৃত মতামত বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না।

চিত্ত

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ॥

মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০ ॥

আমি কি আমার?

বিশ্বনাথ রায়, এম. এসসি., বি. টি.*

"আমি কি আমার"? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ মনে হলেও, প্রশ্নটিকে যদি চিন্তার দ্বারা কিংবা বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে আমরা উত্তরে অনেক কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পেয়ে যেতে পারি।

কেউ কেউ বলবেন যত জীব তত শিব, কিংবা পুরোপুরি "সোহং" মতবাদের সমর্থন করবেন। তাঁরা বলবেন 'আমি চিন্তা করছি, আমি ভাবছি, আমি দেখছি, আমি শুনছি' —সব কিছু করছি; সুতরাং আমিই সব কিছু। আমি যদি না থাকি তা হলে আমার বলা, শোনা, চিন্তা করা সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে; আমার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমিই ঈশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ত্রিগুণান্বিত উত্তম পুরুষ। শঙ্করাচার্য কিংবা ডেকার্টে এর সমর্থন করলেন। আমি চিন্তা করছি সুতরাং আমি বেঁচে আছি, আমার অস্তিত্বও টিঁকে আছে। আমি আছি বলেই ঈশ্বর আছেন, কিংবা ভক্ত আছে বলেই ভগবান আছেন—আমিত্ব-বোধের চরমতম উপলব্ধি। অবশ্য এর বিপরীতও ধর্তব্য। অর্থাৎ ভগবান আছে বলেই আমি আছি ইত্যাদি। এই যুক্তি-তর্কের আবর্ত আজও এক দুর্গম প্রান্তর। এই আবর্ত থেকে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সীমাহীনের চিন্তার উৎসাহ এবং স্পর্ধা মানুষের চিরকালের এক স্বপ্নের ও সাধনার বস্তু।

সমাজ-মনোবিদ্‌রা বললেন, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একা একা থাকতে ভালবাসে না। সুতরাং গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে বাস করার এই যে এক চিরন্তন স্পৃহা মানুষ একেই বরাবর চালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। মানুষ বার বার এই সমাজকে ভেঙেছে এবং নতুন করে আবার গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। নতুন নতুন সমাজ-চেতনার দ্বারা মানুষের মনকে প্রগতিশীলতার উপকণ্ঠে নিয়ে গিয়ে নতুন

* বৃত্তিধারী গবেষণকারী (Research Scholar), মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। মানুষকে সমাজের আবর্তের মধ্যে বাস করতে হলে সমাজের তৎকালীন নিয়ম-কানুন তাকে মানতে হয়। অবশ্য যাঁরা প্রগতিশীল এবং সমাজের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলতে চান, যেমন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বুঝতে পারেন এই সংস্কারের বেড়াজালের অসারতা এবং অযৌক্তিক অবস্থান।

ব্যক্তি এক পরস্পর-নির্ভরশীল সমাজের অংশ। ব্যক্তি শুধুমাত্র এক একক সত্তা নয়। তার পিতামাতা, ঘরসংসার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সাফল্যতা, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এই ব্যক্তির উদ্ভাবনা। এর জন্য ব্যক্তিকে যে-পরিশ্রম করতে হয় তার জন্যই প্রশ্ন ওঠে 'আমি কি আমার'? মনে হয় আমি একটি মানুষ যাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে নিকটতম পরিচিতেরা কিংবা দূরের অপরিচিতেরা, যারা আমার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত, আমার কার্যকলাপের উপর যারা আস্থাশীল এবং নির্ভরশীল। আমাকে শুধুমাত্র আমার বলা যায় না, আমি আমার জন্য এবং আমার আশেপাশে সবাই-এর জন্যও।

কিন্তু উইলিয়ম্ জেমসের কথা ধরা যাক্। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এই দুইটির মধ্যে এক সূক্ষ্ম, শব্দগত এবং ভাবগত প্রভেদ বর্তমান। আমরা অনুভব করি, উপভোগ করি, বোঝবার চেষ্টা করি, আমাদের সর্বপ্রকার কার্যপ্রকারকে। আমাদের যশপ্রতিপত্তি, স্ত্রীপুত্র, কার্যপ্রকার প্রভৃতি সব কিছু আমাদের কাছে সমানভাবে প্রিয় এবং যেকোনও একটির প্রতি আঘাত অন্যত্র সমান সমান ব্যাথার উদ্ভাবনকারী হয়ে ওঠে। আবার কখনও আমরা দেহটাকে একটা মাটির মন্দির মনে করি ; যার মধ্যেকার দেবতা যে কোনওদিন হারিয়ে যেতে পারে বিস্মৃতির কিংবা ধ্বংসের আড়ালে। জেমস্ সেইজন্য 'আমি'কে তিন ভাগে ভাগ করলেন : (১) বস্তুগত আমি (the material self), (২) সামাজিক আমি (the social self), (৩) ধার্মিক আমি (tho spiritual self)। তিনটি বিষয়ই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

আমার কাছে আমার দেহটাই সর্বপ্রথম বস্তু। বস্তুগত আমি-র মধ্যে আমার দেহ ও দেহের বিভিন্ন অংশও আমার নিকটতম প্রিয় বস্তু। তারপরই আসে দেহাচ্ছাদন অর্থাৎ জামাকাপড়। প্রবাদ-বাক্যে বলে মানুষ তিনটি জিনিস দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গঠিত—আত্মা, দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ। দেহ কুরূপ অথবা সুরূপ সম্পন্ন যাই হ'ক না কেন, আমাদের স্বভাব হচ্ছে তাকে পরিষ্কার জামাকাপড় দ্বারা সাজিয়ে রাখা এবং নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা। তারপরই আসে, আমি যে-সংসারে বাস করি। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী সবই আমার রক্ত-মাংসের সম্বন্ধে বিজড়ীত। তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তারপর আমরা যে-গৃহে বাস করি। গৃহকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যুদ্ধের জন্য দুর্গের দরকার হয় এবং সমাজ-জীবনে যুদ্ধের জন্য চাই উত্তম একখানি গৃহ। বাইরের লোকেরা বলবে, "বাঃ, আপনার ঘরটি বেশ সাজানো তো! কিংবা বেশ চমৎকার বাড়ীটা করেছেন তো!" এবং এতেই বস্তুগত আমির আনন্দ। কেউ কেউ কৃপণ হয়ে ওঠে ; তারা তাদের অর্থলিপ্সা কিংবা সোনা জমিয়ে রাখার লিপ্সাকে একটু অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে তোলে। সম্পত্তি বাড়ানো কিংবা অর্থ বৃদ্ধি করা আজকের দিনের মানুষের বস্তুগত আমিত্বের অন্যতম এক প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য। এর সব কিছুর একটিতে আঘাত লাগলে আমার 'বস্তুগত আমি-ই' আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তারজন্য মান-সম্মান প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে তোলে।

বস্তুগত আমি-র পরেই সামাজিক আমি-র কথা ওঠে। একজন তার সহচর, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কতটা সম্মান অথবা প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সেইটাই তার সামাজিক আমিত্বের মাপ।

দলগতভাবে থাকতে প্রায় সবাই ভালবাসে। তার মধ্যে হয়তো একজন চায় যে কয় জন তাকে লক্ষ্য করল, কয় জন তার প্রশংসা করল, কয় জন তার কাছে এসে তাকে স্তুতি করল প্রভৃতির প্রতি নজর রাখতে। কাউকে যদি নির্জনে, নির্বাসনে পাঠানো যায় তা হলে সেইটাই তার সামাজিক অস্তিত্বের প্রতি বড় শাস্তি হবে। অবশ্য সাধুব্যক্তিরা এবং আলেকজাণ্ডার' সেলকার্ক (oh solitude where are thy charms !) এর ব্যতিক্রম ; তবে সব নিয়মের মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। সত্যি কথা কি একজন মানুষের যতজন সঙ্গীসহচর আছে, তার ততগুলি সামাজিক আমি আছে। আবার কিছু লোক যদি এক দলের হয় ও অন্যরা অন্য দলের, তা হলে আবার সামাজিক আমি, দলের মধ্যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। আমরা বাড়ীর লোকের কাছে যে রকম ব্যবহার করি, ক্লাবের বন্ধুদের কাছে কিংবা দোকানের খরিদ্দারের কাছে, কিংবা শ্রমিকের কাছে, প্রভুর কাছে কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে হয়তো তেমন ব্যবহার করি না। সেইজন্য একজনের সামাজিক আমিত্বের বহুভাগ দেখা যায়। মজার কথা হচ্ছে যে সামাজিক আমিটা তখনই বেঘোরে পড়ে যখন সে, কাউকে ভালবাসে কিংবা প্রেমে পড়ে। অন্যান্য ক্ষেত্রের বেলাতেও প্রায়ই শোনা যায় এক জন অপর জনকে বলছে: "মানুষ হিসাবে তোমার কথা শুনতে হয় কিন্তু একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে কিছুই করতে পারি না" ; নীতিগত দিক থেকে নিঃস্বার্থভাবে দুঃস্থকে সেবা করা উচিত কিন্তু ডাক্তার হিসাবে যদি অর্থ না নিই তা হলে আমি বাঁচি কি করে ; ইত্যাদি"।

ধার্মিক আমি-র ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। ধার্মিক আমি বলতে বোঝায় একজনের ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত সত্তাকে। তার গুণ, তার চেতনা, তার প্রকাশ, শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু এই ধার্মিক আমিত্বের ধর্মকে গড়ে তোলে। মানবিক সত্তা, চেতনতা সব কিছু মিলে আমি-র মধ্যকার ভাব, ভাষা, আবেগ, উৎকণ্ঠাকে প্রকাশ করে। সবার মধ্য থেকে আমরা অনুভব করি আমাদের অস্তিত্বকে এবং তার উদ্দেশ্যকে। জন্ম সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। 'আমি' জন্মেছি এবং 'আমার' জন্মের মত প্রতিটি মানব-জন্ম এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। চার্বাক বলবেন, 'যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, প্রয়োজন হলে ধার করেও ঘৃত পান করবে"। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন, 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য সেই আদিমতম মহাপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনা করে কাটান। কিংবা বিবেকানন্দ বললেন, 'কর্মেই জীবনের মুক্তি', মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আমাদের ব্যক্তিগত আশা প্রত্যাশাকে পরিপূর্ণতার পথের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি। এবং আমরা জন্মের মত মৃত্যুকেও অভ্রান্ত বলি। কেউ কেউ মনে করেন অধিকাংশ দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যু-আতঙ্ক থেকে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং কোথাও অবলম্বন না পেয়ে পরমেশ্বরের হাত-পা ধরবার চেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি ঈশ্বর-তত্ত্বে, জন্মান্তরবাদে এবং সর্বপ্রকার ধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে। এর থেকেই সেই ধার্মিক আমি-র উৎপত্তি এবং পরিণতির মধ্যে পরিপূর্ণতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা তার ব্যক্তিগত 'আমি' এবং 'আমিত্ব'-কেই ঘিরে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ অবশ্য এই ধারণাকে পালটিয়ে কতকগুলি বিবাদ সংবদ্ধ নাম এবং তার পরিচয় আমাদের দিয়েছেন। যেমন, রুসো-র "General Will", মার্ক্স-র "Communism, Communed for the Community", প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গড়া—"Democracy—by, for, of (the people), অথবা কামু-র 'Secular Humanism'। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য 'Standard of Living'-কে

উর্ধ্বমুখী করা অথবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সর্ববিধ, সুসামঞ্জস্য প্রণোদিত ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ এক 'আমি' থেকে বহু আমিত্বে পৌছান।

কিন্তু মানুষের জীবনের এই 'আমি' নানাবিধ যাতনা (anguish), অসহায়তা (forlornness) এবং নিরাশয় (despair) পরিপুর্ণ। প্রতিটি মানুষের জীবন এক অতি অসহায়, অর্থহীন এবং এক পণ্ডশ্রম করে বেড়ানোর ইতিহাস। বর্তমান সময় মানুষের জীবন একটা নিদারুণ হতাশা তথা অবিশ্বাসের স্রোতের মধ্যে উজান ভেঙে চলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না—এটা পারবার নয়; এবং এই যে অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা যার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে খুন-জখম-নরহত্যা ও তার ব্যাপকতর রূপ—যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের জন্য ও তার সমর্থনে মতবাদ গড়ে তোলা। বিদ্রোহ বা বিপ্লব যখন চরম রূপ নেয় তখন কার্যতঃ সেই স্বাধীনতাকেই সে খর্ব করে ফেলে বা এমন কি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেও ফেলে যা অর্জন করা শুরুতে লক্ষ্য ছিল বা থাকে।

সুতরাং পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রচেষ্টা তার বস্তুগত আমি, সামাজিক আমি কিংবা ধার্মিক আমিকে কেন্দ্র করে (যে কোনও একটাকেও ধরা যেতে পারে) চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। তবুও সেই 'আমি' তার নিজের এবং আর একজনের কাজ একসঙ্গে করে চলেছে। সেইজন্য, 'আমি কি আমার' প্রশ্নের উত্তর: 'কখনও আমি আমার, কখনও আমি সবার'।

সংবেশন

তুষারকান্তি সরকার*

সংবেশন বা হিপ্নটিজ্‌ম্ (hypnotism) কথাটার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই প্রায় অল্পবিস্তর পরিচিত ; অথচ সংবেশন বস্তুটি ঠিক যে কি অথবা ঐ সংবেশন শক্তির সীমাই বা কতটা এ সম্বন্ধে অনেকেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। সাধারণ লোকের ধারণা যে যিনি সংবেশন শক্তির অধিকারী, তিনি তাঁর সেই শক্তিবলে বোধ হয় যে কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত যে কোনও কাজ করিয়ে নিতে পারেন। অনেকের ধারণা যে জাদুকরেরা খেলা দেখানোব সময় সমস্ত দর্শককে সংবিষ্ট করেন বলেই তাঁদের দেখানো অসম্ভব খেলাগুলোও দর্শকদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। জাদুবিদ্যায় সংবেশনের স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ বিচার না করেও, আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে ম্যাজিকের অধিকাংশ খেলাই দেখানো হয় বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ- ও হস্ত-কৌশলের মাধ্যমে—সংবেশন শক্তির সাহায্যে নয়।

সংবেশন সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে এত ভুল ধারণা জমে থাকার কারণ হ'ল এই যে সাম্প্রতিক কালের আগে পর্যন্ত মনোবিদ্যার আলোচনায় সংবেশনের বিষয়-বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। বর্তমান মনোবিৎগণ অবশ্য এখন এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং তার ফলে সংবেশন সম্বন্ধে অনেক নতুন ও মনোবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা আজ আমরা জানতে পেরেছি।

সাধারণ ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, সংবেশন হ'ল সংবেশক (hypnotist) দ্বারা সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত ঘুমের অনুরূপ একটা অবস্থা—যে-অবস্থায় সংবেশক ও সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে একটা মানসিক অন্তরঙ্গতা (rapport) স্থাপিত হয়, যার ফলে সংবিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত বেশীমাত্রায় সংবেশকের ইচ্ছাশক্তির অনুগত হয়ে তার নির্দেশ মেনে চলে।

সংবেশনের মাধ্যমে সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উৎপাদিত অর্ধ-চেতন ভাব এবং সংবেশকের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের প্রথম সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন ডাঃ মেস্‌মার্, যাঁর নাম অনুসারে সংবেশনের অন্য নাম দেওয়া হয়েছে 'মেস্‌মেরিজ্‌ম্'। ডাঃ মেস্‌মার মনে করতেন যে সংবেশন করার সময় একটা অদৃশ্য শক্তি সংবেশক থেকে সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং এর ফলেই এ-দুজনের মধ্যে এক মানসিক অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে ওঠে। এই জন্যই সংবিষ্ট ব্যক্তি সংবেশকের অনুগত হয়ে পড়ে। ডাঃ মেস্‌মার্ এই অদৃশ্য শক্তির নাম দিয়েছিলেন জৈব-চুম্বকত্ব (animal magnetism)। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর এই ব্যাখ্যা মনোবিদ্যাসম্মত পরীক্ষণ দ্বারা সমর্থনের অভাবে পরিত্যক্ত হয়।

এর পর ডাঃ চারকট্ যে-ব্যাখ্যা দেন তা মেস্‌মারের ব্যাখ্যার চেয়ে উন্নততর এবং কিছুটা মনোবিদ্যাসম্মত হলেও, অসম্পূর্ণ ও যান্ত্রিক বলে পরিত্যক্ত হয়।

*বৃত্তিধারী গবেষণকারী (Research Scholar), ভারতীয় দর্শন-পরিষদ্ (Indian Academy of Philosophy) ।

Dr. Liébaut-র মতে সংবেশন-জনিত ঘুম বা অর্ধ-চেতনতা (hypnotic sleep) কেবল মানসিক-রোগপ্রবণতা-গ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই কৃত্রিম ভাবে উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু Bernheim এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে এ প্রকার ঘুম সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যেও আনানো যায়। যদিও Bernheim সংবেশন-জনিত ঘুম বা তজ্জনিত আনুগত্যের কোনও কারণ বিশ্লেষণ করে দেখান নি, পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ তাঁর মতবাদকেই সমর্থন করে।

এখন অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি আলোচনা করার আগে, ফ্রয়েডের সংবেশন-বিষয়ক মতবাদ আলোচনা করা যাক।

এ কথা আজ অনেকেরই জানা যে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের (psycho-analysis) মূলে আছে আমাদের 'নির্জ্ঞান (unconcious) মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত অবদমিত কামপ্রবৃত্তি'-র ধারণা। তাঁর মতে প্রবৃত্তির বশে প্রত্যেক পুরুষই নারীদের প্রতি এবং প্রত্যেক নারীই পুরুষদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হয়। ফ্রয়েডের ধারণা যে কাম প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতে আমাদের সকল রকম মানসিক গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাই সংবেশনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও তিনি তাঁর উপরোক্ত দুই মূলধারণার সাহায্য নিলেন। তাঁর মতে একজন অন্য আর একজনকে সংবিষ্ট করতে পারে এই কারণে যে সংবেশনের ফলে সংবিষ্ট ব্যক্তির অবদমিত কাম-প্রবৃত্তি বা 'লিবিডো' (libido) নির্জ্ঞাতভাবে (unconciously) সংবেশকের উপর নিবদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের বাস্তব-জীবন থেকে একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সুবিধে হবে। ধরা যাক একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পরস্পরকে খুব গভীর ভাবে ভালবাসে। এ ক্ষেত্রে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে যদি এদের একজন অন্যজনকে কোনও একটা কিছু করতে অনুরোধ করে বা নিষেধ করে, তা হলে অন্যজনে তার সেই কথা প্রায় কোনও মতেই অমান্য করতে চাইবে না—বা ভালবাসার আকর্ষণ হেতু সে কথাটাকে না মেনেই পারবে না। এখন এই যে একজনের কথা বা ইচ্ছার প্রতি অন্যজনের আনুগত্য, এর কারণ কী? নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে এর কারণ পারস্পরিক ভালবাসা; এবং এই ভালবাসার পিছনে যে একটা সুপ্ত বা অস্পষ্ট কামপ্রবৃত্তি কাজ করছে এটাও অনস্বীকার্য। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে এ ক্ষেত্রে আদেশমান্যকারী আদেশকারীর কথা মেনেছে, কেন না প্রথমোক্ত ব্যক্তির সুপ্ত কামপ্রবৃত্তি ভালবাসার মাধ্যমে আদেশকারীর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। সংবেশনের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ভাবেই সংবিষ্ট ব্যক্তির 'লিবিডো' সংবেশকের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং এই কারণেই সংবিষ্ট ব্যক্তি সংবেশকের ইচ্ছা বা আদেশের অনুগত হয়ে পড়ে। (অবশ্য 'লিবিডো' কথাটা ফ্রয়েড্ আমরা সাধারণ অর্থে কামপ্রবৃত্তি বলতে যা বুঝি তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাই সংবেশক ও সংবিষ্ট ব্যক্তি বিপরীত যৌনধর্মী না হলেও শেষোক্ত ব্যক্তির 'লিবিডো' প্রথমোক্ত ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ হতে পারে। এই জন্যেই আমি উপরে সংবিষ্ট ব্যক্তির 'কামপ্রবৃত্তি' না বলে 'লিবিডো' নিবদ্ধ হয় বলেছি।)

কিন্তু এই ফ্রয়েডীয় মতবাদও বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এই মতের প্রধান দোষ হ'ল এই যে ফ্রয়েড্ নির্জ্ঞান- ও যৌনপ্রবৃত্তি-কৈন্দ্রিক গোটাকতক ধারণার সাহায্যে কিছুটা যেন জোর করে সব কিছুরই একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, আর তার ফলে তাঁর অধিকাংশ মতই হয় সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট। মাত্র সামান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে (যেমন প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি) যৌনপ্রবৃত্তি ও

পারস্পরিক আনুগত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে দেখে যে কোনও আনুগত্যের ক্ষেত্রেই লিবিডো-সংবন্ধনের ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, ফ্রয়েডের এ সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই অযৌক্তিক। কারণ, এখানে তিনি বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত-লব্ধ-জ্ঞান (যথা, প্রেম) থেকে অবৈধ সামান্যীকরণের মাধ্যমে 'সমস্ত' সম্ভাব্যক্ষেত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

Ferenczi অবশ্য ফ্রয়েডীয় কামপ্রবৃত্তি-কৈন্দ্রিক মতবাদকেই সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "hypnotic credulity and pliancy take their root in the masochistic component of the sex desire." তাঁর মতে সংবিষ্ট ব্যক্তির উপর সংবেশকের প্রভাব, কোনও শিশুর উপর তার অত্যন্ত 'কড়া-প্রকৃতির' পিতার কর্তৃত্বমূলক প্রভাবের অনুরূপ ; যে-প্রভাবের ফলে শিশু মাত্রেরই লক্ষ্য হয় সেই পিতাকে মান্য করা। এই কারণে Ferenczi মনে করেন যে সংবিষ্ট ব্যক্তি যখন সংবেশকের অনুগত হয়ে পড়ে তখন তার মূলে থাকে নিজের বিপরীত যৌন-ধর্মী পিতা অথবা মাতার প্রতি শৈশব-মনোবৃত্তি-প্রসূত প্রত্যাবৃত্তি (regression toward his (or her) infantile attitude directed to the parent of opposite sex.)। অর্থাৎ সংবেশনজনিত অভিভাব (suggestion) কালে সংবিষ্ট ও সংবেশক এই দু'জনের যথাক্রমে 'শাসিত শিশু' ও 'কর্তৃত্বময় পিতার' ভূমিকা গ্রহণ করাটাই অভিভাব্যতা (suggestibility)-র কারণ।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আপত্তির কথা বাদ দিয়ে একটা কথা বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে আনীত Ferenczi-র মতবাদ ফ্রয়েডের নিজের কাছেই 'লিবিডো-তত্ত্বের' অতিরঞ্জনতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ মন্তব্য করেছেন যে, "In this work, [ফ্রয়েডের *Group Psychology and Analysis of the Ego* দ্রষ্টব্য।] which is essentially a transformation and elaboration of the libido theory of suggestion, Freud shows that the unsatisfactory features of the theory as propounded by Ferenczi have not escaped his attention ; he sets out in quest of an improved form of the theory, taking the mass-suggestion of the group as his point of departure."[১]

অতএব এখন আমরা ফ্রয়েডের 'mass-suggestion of the group' বা 'যৌথ-অভিভাব'-মূলক মতবাদ বা তত্ত্বটি আলোচনা করতে পারি। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, কোনও একটি দলের লোকেদের দলপতি বা যূথপতির নির্দেশ মেনে চলা এবং অভিভাব্যতা হেতু সংবিষ্ট ব্যক্তির সংবেশকের নির্দেশ মেনে চলা, এ দুয়ের মধ্যে মূলগত বিশেষ প্রভেদ নেই। সেইজন্য ফ্রয়েড তাঁর 'যৌথ-অভিভাব'-মূলক তত্ত্বে, আদিম মানুষের দলপতির নির্দেশ মেনে চলার প্রবণতার ভিত্তিতে সংবেশনোত্তর অভিভাব্যতার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী আদিম যুগে মানুষ যৌথভাবে কোনও এক দলপতির অধীনে বাস করত। এই সব দলপতিরা প্রত্যেকেই দলভুক্ত স্ত্রীলোকদের উপরে তার নিজের যৌন-অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ও সচেতন থাকত ('fiercely jealous of his sexual rights over all the women') এবং তাই তারা দলস্থ অন্যান্য পুরুষদের যৌনচেতনাকে অবদমিত (repress) করে রাখত ; যার ফলে ঐ সব বঞ্চিত পুরুষদের অবদমিত 'লিবিডো' বা কামপ্রবৃত্তি তাদের দলনেতার উপর

১ McDougall—*Outlines of Abnormal Psychology.*

নিবদ্ধ হ'ত। সেইজন্য দলপতির প্রতি তাদের একটা ভয়-মিশ্রিত ভালবাসা গ'ড়ে উঠত এবং তারা সকলেই যৌথভাবে দলপতির নির্দেশ মেনে চলত। বহু যুগ ধ'রে এটা চলার ফলে ঐ ধরনের নির্দেশ গ্রহণের প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে গেছে ; সংবেশনের সময় সংবিষ্ট ব্যক্তি ও সংবেশকের মধ্যে ঐ 'ব্যক্তি-দলপতি' সম্বন্ধের অনুরূপ একটা সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে বলেই সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে অভিভাব্যতা দেখা দেয়।

নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ ফ্রয়েডের এ যৌথ-অভিভাব-মূলক তত্ত্বটিও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না :—

(১) এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের সংবেশনোত্তর অভিভাব্যতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না ; কেন না যে সহজাত আনুগত্য প্রবণতার ভিত্তিতে তিনি পুরুষদের অভিভাব্যতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর মতে সেইরকম কোনও সহজাত প্রবণতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে নেই।

(২) এই মতবাদ মানুষের সমস্ত উন্নত সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধকে ব্যাখ্যা করে একটা পূর্বগামুকৃত প্রত্যাবৃত্তির (atavistic regression) মাধ্যমে। ম্যাগ্‌ডুগালের ভাষায় বলতে গেলে :—

"Finally, it reduces all the social life of man, including all team work··· all discipline,···to the working of an atavistic regression, to a return to the behaviour proper to the (very hypothetical) remote age in which the violence of a bully, armed with a club and promted by sexual jealousy was the only controlling force in human society."[২]

এরপরে ডাঃ ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ বলেন যে সংবেশন সম্বন্ধে কোনও মতবাদ গ্রহণযোগ্য হতে গেলে সেই মতবাদের সাহায্যে কয়েকটা প্রশ্নের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। প্রথমতঃ, সংবিষ্ট অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলির অবস্থা কেমন থাকে, যার জন্যে সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে একটা অর্ধচেতন ঘুম ঘুম ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সংবেশক ও সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয় কি করে? তৃতীয়তঃ, সংবেশকের প্রতি সংবিষ্ট ব্যক্তির অভিভাব্যতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কি করে?

ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ তাঁর সংবেশন সম্বন্ধীয় তত্ত্বে এই সমস্ত প্রশ্নেরই সুষ্ঠু এবং মনোবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন যে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর স্নায়ুতন্তুগুলি এক একটি সম্ভাব্য শক্তির আধার ; এবং এই স্নায়বিক শক্তির উৎস হ'ল স্নায়ুতন্তুতে সঞ্চিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার নাম তিনি দিয়েছেন 'নিউরোকাইম্‌'। এখন এই স্নায়বিক শক্তি (neural energy) আমাদের সংবেদনশীল স্নায়ুগুচ্ছের থেকে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়ে সেখানকার কর্ম-কেন্দ্রের স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপিত করে, আর তার ফলেই আমরা চেতন থাকি বা জাগ্রত অবস্থায় থাকি। যদি কোনও কারণে ঐ স্নায়বিক-শক্তি উৎপাদনকারী নিউরোকাইমের প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পায়, তা হলেই আমাদের ঘুম পায় এবং মনের চেতন অবস্থা ব্যাহত হয়। আর যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত অথবা অন্যান্য সমস্ত

২ McDougall—*Outlines of Abnormal Psychology.*

সংবেদনশীল স্নায়ুতন্তুর উদ্দীপনা একেবারে কমে যায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই স্নায়ুতন্তু থেকে মস্তিষ্কের দিকে নিউরোকাইমের প্রবাহের পরিমাণও অনুরূপ ভাবে কমে যায়। এইজন্যে ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ মনে করেন যে, সংবেশনের সময় যাকে সংবিষ্ট করা হবে তাকে ঘুম পাড়ানোর অনুকূল একটা অবস্থার মধ্যে রাখা হয় বলে এবং একই রকমভাবে 'আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন' বা ঐ ধরনের কোনও আদেশ-বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয় বলে সংবিষ্ট ব্যক্তির সংবেদনশীল স্নায়ুমণ্ডলীর একটা খুব অল্প অংশই উদ্দীপিত হয়, যার ফলে নিউরোকাইম্‌ প্রবাহ কমে যায় এবং সংবিষ্ট ব্যক্তি সংবেশনজনিত ঘুমে (hypnotic sleep) আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যেহেতু সংবিষ্ট ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়তে থাকার সময়ও সংবেশক তার আদেশের পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকে, সংবিষ্ট ব্যক্তির সংবেদনশীল স্নায়ুমণ্ডলীর একটা অংশ সেই অবস্থায়ও উদ্দীপিত হয় ও সজাগ থাকে। সুতরাং সংবিষ্ট ব্যক্তি সংবেশক সম্বন্ধেই কেবলমাত্র সজাগ থাকে; অন্য আর কোনও কিছু বা অন্য কারও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকে। কাজেই এ অবস্থায় কেবল সংবেশকের কথাই সে শোনে এবং নির্বিবাদে তা মেনে চলে। এই সময়ে তার নিজের ভিতর কোনও রকমের বিরুদ্ধ চিন্তা বা তজ্জনিত মানসিক প্রতিরোধের সম্ভাবনাই থাকে না। এই কারণেই সংবিষ্ট ব্যক্তি সংবেশকের প্রতি অভিভাব্য (suggestible) হয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আরও দুটো উল্লেখযোগ্য মানসিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সে দুটো হ'ল যথাক্রমে সংবেশনোত্তর অস্মার (post-hypnotic amnesia) ও অভিভাবন (post-hypnotic suggestion)। জেগে ওঠার পর সংবিষ্ট ব্যক্তি তার সংবেশন-কালের সব কথা ভুলে যায়; একেই বলা হয় সংবেশনোত্তর অস্মার। ডাঃ ম্যাগ্‌ডুগাল্‌ তাঁর সংবেশন তত্ত্বের সাহায্যে এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে সংবিষ্ট অবস্থায় আমাদের দেহের একটিমাত্র নির্দিষ্ট সংবেদনশীল স্নায়ুগুচ্ছই উদ্দীপিত হয় যার ফলে ঐ একটিমাত্র স্নায়ুগুচ্ছের মাধ্যমেই তখন 'নিউরোকাইম্‌' প্রবাহিত হয়। এই কারণে সংবিষ্ট অবস্থায় আমাদের চেতনা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমিত অবস্থায় থাকে—আমাদের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে এটার কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে না। আর সংবিষ্ট অবস্থার সীমিত চেতনা এইভাবে সংবিষ্ট ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থার সামগ্রিক চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বলেই, জেগে-ওঠার পর সংবেশনকালীন মানসিক দশা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

অনেক সময় মনোবিদেরা কোনও একজন ব্যক্তিকে সংবিষ্ট করে আদেশ দিয়েছেন যে সংবিষ্ট অবস্থা থেকে জেগে ওঠার পর একটি নির্দিষ্ট দিনে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংবিষ্ট ব্যক্তি যেন আদেশকারীর সঙ্গে দেখা করেন। আদেশকারী নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত থেকে দেখেছেন যে, আদিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তিনি কেন সেখানে দেখা করতে এসেছেন, তখন তিনি কোনও সঙ্গত কারণ বলতে পারেন নি। সংবেশন থেকে জেগে ওঠার পরও এইভাবে সংবেশকের আদেশ পালন করার নামই হ'ল সংবেশনোত্তর অভিভাব। ম্যাগ্‌ডুগালের তত্ত্বের সাহায্যে এটার ব্যাখ্যা খুব সহজেই দেওয়া যায়। তিনি আগেই দেখিয়েছেন যে সংবেশনের সময় সংবিষ্ট ও সংবেশকের মধ্যে মানসিক অন্তরঙ্গতা কি করে স্থাপিত হয়। এখন এই মানসিক অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির ফলে সংবেশকের প্রতিটি অভিভাব সংবিষ্ট ব্যক্তির নির্জ্ঞানের গভীরেও দাগ কাটে; আর তার ফলে সংবিষ্ট অবস্থা থেকে জেগে ওঠার পরও সে-ব্যক্তির নির্জ্ঞান মন সমান ভাবেই তার সংজ্ঞানে

মনকে নির্দিষ্ট সময়ে সংবেশকের আদেশ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করে। সেইজন্যেই সংবেশক সংবিষ্ট ব্যক্তিকে জেগে-ওঠার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললে সেই ব্যক্তি তা না করেই পারে না— যদিও তার এই কাজের কারণ তার সংজ্ঞান মনের কাছে সম্পূর্ণই অজানা বা অস্পষ্ট থেকে যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত সংবেশন, সংবিষ্ট ব্যক্তি ও সংবেশকের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলা হ'ল তার থেকে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে সংবেশক ইচ্ছে করলে সংবিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে যে কোনও কাজ বা অপরাধ সঙ্ঘটিত করাতে পারে। Delboeuf এবং Liègeois নামে দুজন অভিজ্ঞ মনোবিদ্‌ও এই মতবাদ সমর্থন করেন। দু'একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করলে এই ধারণা অভ্রান্ত বলেই মনে হবে। যেমন, ১৯৪০ সালের ১১ই অগস্টের 'সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ অফ্‌ ম্যাড্রাস্‌' পত্রিকায় একটা খবর বেরোয় তাতে দেখা যায় যে ইডা রেষ্টন নামে এক আমেরিকান তরুণীকে মার্সেলী নামে একজন সংবেশক ও মনোচিকিৎসক চিকিৎসা করার সুযোগে সংবিষ্ট করে বিয়ে করে। এই তথ্য প্রকাশ পায় যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার পর নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রেষ্টন মার্সেলীর বিরুদ্ধে লস্‌এঞ্জেল্‌স্‌ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনে।

কিন্তু অন্যদিকে Prof. Janet একটি সত্য ঘটনার কথা বলেছেন যেখানে একজন বিখ্যাত সংবেশক জনৈক ভদ্রমহিলাকে সংবিষ্ট করে যে কোনও আদেশ দিলে সেই মহিলা তা পালন করতেন। একদিন সেই সংবেশক কিছু অধ্যাপক ও ছাত্রের সঙ্গে একযোগে সংবেশনোত্তর অভিভাবনের ক্ষমতা দেখার উদ্দেশ্যে সেই মহিলাকে সংবিষ্ট করে কিছু কাজ করতে আদেশ দিলে তিনি তা সংবিষ্ট অবস্থায় পালন করলেন। কিন্তু একবার বিবস্ত্র হবার আদেশ দিতেই, তাঁর সংবেশনের ঘোর কেটে গেল এবং তিনি অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় সেখান থেকে চলে গেলেন।

এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে মোটামুটি ভাবে সংবেশক সংবিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে সব কিছু করাতে পারলেও, গভীর নীতিবোধের পরিপন্থী কোনও কাজ সংবেশনের সুযোগে তাকে দিয়ে করানো অত্যন্ত কঠিন—বরং বলা চলে অসম্ভব। সংবেশনের সময় সংবিষ্ট ব্যক্তির অভিভাব্যতার দরুন শুধু নানা ধরনের আদেশ পালন করানোই নয়, অনেক রকমের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ও নিরাময় করাও সম্ভব হয়।

তবে এ কথা আমাদের অসঙ্কোচে স্বীকার করতে হবে যে সংবেশন সম্বন্ধে আমাদের যত কিছু জানবার আছে তার তুলনায় আমরা যতটুকু জেনেছি তা অত্যন্ত নগণ্য। আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও ত্রুটীমুক্ত কোনও সংবেশন-তত্ত্ব কেউ দিতে পারেন নি। ডাঃ মাগ্‌ডুগালের তত্ত্ব সংবেশনের অনেক কিছু ব্যাখ্যা করলেও সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে নি ; এবং এ কথা ম্যাগ্‌ডুগাল নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর সংবেশন সম্বন্ধীয় তত্ত্বের সাহায্যে যে 'নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষ' (negative hallucination) এবং ঐ ধরনের আরও দু'একটা সংবেশন-প্রসূত অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, সেটা ম্যাগডুগাল্‌ নিজেই নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখিয়েছেন। এখন নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষ কাকে বলে দেখা যাক। ধরা যাক, একটা কাগজের উপর দশটা ডাক-টিকিট বসানো আছে, তার মধ্যে ন'টা নীল রঙের ও একটা লাল। এখন যদি কোনও সংবেশক তার দ্বারা সংবিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ দেয় যে 'তুমি লাল ডাক-টিকিটটা দেখতে পাবে না' এবং তার পরে তাকে ঐ কাগজের উপরের টিকিটের সংখ্যা গুনতে বলে তা হলে দেখা যাবে

যে সেই ব্যক্তি প্রতিবারই আশ্চর্যজনক ভাবে লাল টিকিটটাকে বাদ দিয়ে দশ-এর জায়গায় মোট ন'টা টিকিট গুনছে—যেন লাল টিকিটের অবস্থিতি সে প্রত্যক্ষই করতে পারছে না। এই ধরনের প্রত্যক্ষ অক্ষমতার (perceptual inability) নামই হ'ল নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষ বা negative hallucination। সংবেশনের সময় কেন অথবা কেমন ভাবে সংবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ঐ রকম নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষণের অবস্থা উদ্ভূত হয় তার কোনও ব্যাখ্যা ম্যাগ্‌ডুগালের তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া যায় না। এই ধরনের সংবেশন-প্রসূত অবস্থা সমূহের উল্লেখ করে, সংবেশন সম্বন্ধীয় তাঁর নিজস্ব তত্ত্বের সম্পর্কেই তাই ম্যাগ্‌ডুগাল বলেছেন যে, "·· ······the principle is not in itself adequate to shadow forth an explanation of them ; some further principle is implied."

বর্তমানে সম্পূর্ণ ত্রুটীমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য সংবেশন-সম্বন্ধীয় কোনও তত্ত্ব দেওয়া সম্ভব না হয়ে থাকলেও, আমরা এ আশা পোষণ করতে পারি যে মনোবিদ্যার গবেষণা দ্বারা এ বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে আরও পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করতে পারব।

বিবাহ

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি *

(২)

বিবাহ প্রথার মূলে যে আমাদের যৌন-কামনার চরিতার্থতার ফলঃস্বরূপ সন্তান-প্রজনন, পিতৃত্ব-নির্ণয়ন ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব স্থিরীকরণ এবং কাম-প্রবৃত্তির বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনবোধ মিলিতভাবে কাজ করে তাহা এই প্রবন্ধের পূর্ব-প্রকাশিত অংশে বলিয়াছি। ঐ প্রথা কবে হইতে ও কোন দেশের কোন সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রাচীন সমাজের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীতে যত প্রকারের বিবাহ প্রথা ও রীতির সন্ধান পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিব না। কেবল ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, নানা দেশে এমন কি একই দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ-পদ্ধতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাহা বাদ দিলেও একই শ্রেণীর বিবাহ-পদ্ধতির নানা পরিবর্তন সময়ের প্রভাবে ও প্রয়োজনের তাগিদে ঘটিয়া থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনও না কোনও রকম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ ব্যতীত যৌনমিলন সমাজবিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ গণ্য হইলেও সর্বদেশেই ঐরূপ ব্যবহার চলিতেছে; প্রাচীনকালেও চলিত। নীতি সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

বিবাহিত জীবনে মানুষ, সমাজের দাবি মানিয়া লইয়া কামপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহার সহজাত এই প্রবল প্রবৃত্তির পীড়ন কতটা মানিয়া লইতে পারিয়াছে সে-আলোচনাও এখানে করিব না। বিবাহিত জীবনের সীমারেখার মধ্যে জীবনযাপন করিয়া মানুষ কতটা সুখী হইতে পারিয়াছে এবং বিবাহিত জীবনে অসুখী হইবার কি কি মানসিক কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

বিদেশের বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বেশ কিছু বিবাহিত ব্যক্তি এই জীবনে সুখী হইতে পারে না। আমাদের দেশেও সম্প্রতি বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা আইনসম্মত হওয়ায় কিছু সংখ্যক বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অসুখী বিবাহ হইতেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি উঠে। অবশ্য এ কথা বলা চলে না যে, বিবাহ সুখকর না হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের দরবারে খুব কম সংখ্যক অসুখী বিবাহিত পরিবার বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন পেশ করেন। যে সামান্য অংশ আইনের আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহার চাইতে অনেক বেশী অসুখী বিবাহিত পরিবার কোনও রকমে বিবাহিত জীবন টানিয়া লইয়া চলে। বর্তমান প্রবন্ধে বিবাহে মানুষ অসুখী হয় কেন কেবল তাহারই কারণ সন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

* ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতি, লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের অধিকর্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

মোটামুটিভাবে দেখিলে এই অসুখী হইবার দুই রকম কারণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বস্তুগত; দ্বিতীয়তঃ মানসিক। বস্তুগত পর্যায়ের মধ্যে আর্থিক অবস্থা, শরীরের পীড়া বা কর্মহীনতা, রূপ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা বিষয় বিচারের মধ্যে আসে। মানসিক কারণের মধ্যে মানসিক শিক্ষা, আদর্শ, কামনা-বাসনার প্রকৃতি, মেজাজ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিশেষ প্রবণতা ইত্যাদি নানা কথা আসিয়া পড়ে। বিশেষ সংক্রামক রোগ ও শারীরিক অক্ষমতা হেতু কতকগুলি অসুবিধা ছাড়া আর্থিক ইত্যাদি অন্যান্য আপাতদৃষ্টিতে যাহা বাস্তব কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় তাহাও প্রধানতঃ মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। তেমন গোঁড়ামি রকমের হিসাব করিলে সকল কারণকেই মানসিক কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়। সে-তর্ক থাকুক। তবু এইটুকুমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখিবার দরকার আছে যে, বস্তুজগতের প্রতি অবস্থা আমাদের মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহারই প্রভাবে আমাদের মন সে-অবস্থা সম্বন্ধে রায় দিয়া থাকে। অর্থের অভাব আমার মন যদি সহিতে না পারে তবেই দুঃখী বা অসুখী হইবার কারণ হইতে পারে। আমাদের দেশে দুইবেলা ভাল করিয়া ডাল-ভাত বা নুন-ভাতও খাইতে পারে না এমনও বহু লোক আছে। সেজন্য তাহারা সকলে আত্মহত্যা করে না, বিবাহ-বিচ্ছেদ করে না, জীবনের হাসি-আনন্দ তাহাদের নিঃশেষে মুছিয়া যায় না। আবার ইহাও সত্য যে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহিত স্ত্রী বা স্বামীকে ছাড়িয়া যায়, কেহ আত্মহত্যাও করে। কলিকাতা শহরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সব দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সহস্র নরনারী ও শিশু রাস্তায় দিনের পর দিন অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয় জন আত্মহত্যা করিয়াছে? কলিকাতায় যানবাহনের অভাব নাই; ইচ্ছা করলেই জীবন শেষ করিয়া দেওয়ার উপায়ের অভাব হয় না। তখনকার অবস্থার সুযোগ লইয়া কোনও কোনও কামলিপ্সু সামান্য খরচে নিজেদের কাম চরিতার্থ করিয়াছে তাহাও জানি। কিন্তু এই সব থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে এই কথাই বলা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ ঐ অতি দুরবস্থায় পড়িয়াও নিজেদের পরিবারকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। সামান্য সংখ্যক মানুষ তাহা করে। কেন করে তাহা বুঝিতে হইলে তাহাদের মানসিক গঠনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। সমাজ-ব্যবস্থাকে আমরা যেভাবে সকল অবস্থার জন্য দায়ী করিয়া থাকি, প্রকৃত বিচারে তাহা করা যায় কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কারণ আছে। এক শ্রেণীর চরম-পন্থী সমাজবাদী মানুষের সকল সুখ-দুঃখের জন্য সমাজ-ব্যবস্থাকে এবং বিশেষ করিয়া আর্থিক অবস্থাকে দায়ী করেন। তাঁহারা নিজেদের আন্তরিক শূন্যতার দিকে নজর না দিয়া বস্তু উপকরণের সাহায্যে নিজেদের মানসিক অভাববোধ ঢাকিবার চেষ্টা করেন। আমাদের খাদ্য, বাসস্থান ও দেহরক্ষার উপকরণ ও আয়োজনের প্রয়োজন নাই এ কথা আদৌ বলিতেছি না। উন্নতি যত করা সম্ভব তাহা করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু বস্তুর বোঝা বাড়াইয়াই যে মানুষ সুখী হইতে পারে না, সুখী হইবার জন্য যে তাহার বিশেষ মানসিক শিক্ষার দরকার এ কথা না বুঝিলে কেহ সুখী হইতে পারে না। শুনিয়াছি পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশেই, বিশেষ করিয়া মার্কিন দেশে খাওয়া-পরার অভাব নাই; দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনের সামগ্রি তাহাদের সকলেরই কম-বেশী আছে। তবু সেখানের মানুষ সুখী হইতে পারিতেছে না, সেখানে অনেক বিবাহিত জীবনই সুখের হইতেছে না, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাও কমিতেছে না। শুনিয়াছি স্কান্‌ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দের ও সহজ শান্তিকর পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সেখানে আত্মহত্যার সংখ্যা খুব বেশী; বিবাহ-বিচ্ছেদও কম হয় না। এই অবস্থায় অসুখী হইবার কারণ খুঁজিতে গেলে কেবল অবস্থা বা নিয়মের বাঁধনের দিকে তাকাইলে উত্তর পাওয়া যাইবে না। মানসিক শিক্ষার,

বিশেষ করিয়া সহনশীলতার অভাব মানুষকে এমনই চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে যে, এই অসহনীয় প্রকৃতির সংস্কার করিতে না পারিলে রোগ সারিবে না। উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। মনের খোঁজ মনই জানে। সেই দিকে মানুষের মন চালনা করাইবার শিক্ষা না দিতে পারিলে, সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রশ্ন ও তর্ক আর বাড়াইয়া লাভ নাই। আবার আমাদের বিবেচ্য বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাউক।

বিবাহিত জীবন সকলের সুখের হয় না। কেন হয় না, তাহার কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়াই উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিড় জমাইয়া আসিয়া গিয়াছিল। সে-ভিড় বাহিরে রাখিয়া আবার আমরা মনের মন্দিরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি। বিবাহ মূলতঃ দুই রকম প্রথায় ঠিক হয়। পিতামাতা, অভিভাবক বা বন্ধু-বান্ধব বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দেয় অথবা পাত্রপাত্রী নিজেরাই মনোমত বিবাহ স্থির করিয়া লয়। প্রথম ক্ষেত্রে অপরের বিচারের প্রাধান্য থাকে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর নিজেদের বিচারই প্রধান হয়। মানুষ নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে প্রবৃত্তির তাগিদে লক্ষণ মিলাইয়া বিচার করিয়া চলে। আসল কথা বিচার করিতে হইলে, নিজেদের কোন প্রবৃত্তির দাবিকে কতটা স্বীকার করিয়া বাস্তবের সহিত তাহার সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারিব ইহাই বিচারের বিষয় হইতে পারে। আমরা নিজেদের অজানিত ভাবেই প্রবৃত্তির তাড়নায় মনের গতি একদিকে চালনা করি। বুদ্ধি অভিজ্ঞতা তাহার সহিত যথাসম্ভব তাল মিলাইতে চেষ্টা করে এবং সেই প্রবৃত্তির তাগিদ মিটাইতে সহায়তা করে। যে ক্ষেত্রে তাহা একান্ত বাস্তববিরোধী হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির বিচার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করে। এই যুদ্ধে—প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির বিচারের যুদ্ধে—কে জয়ী হইবে তাহা সেই সময়ে উভয় শক্তির মধ্যে কোন শক্তি বেশী প্রবল থাকে তাহার উপর নির্ভর করে। একই মানুষের একই প্রবৃত্তি সকল সময় সমানভাবে সতেজ থাকে না। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি সকল সময় তাহাদের পুরণের জন্য তৎপর হইলেও, সবগুলি সকল সময় সমান সতেজ বা মনের উপরিভাগে থাকে না, এবং সেইজন্য সকল সময় তাহাদের সমান শক্তি দেখা যায় না। কোনও বাসনার আংশিক পুরণ হইলেও তখনকার মত তাহা কিছু পরিমাণে শান্ত হয় ; অন্য বাসনা তখন আসর জুড়িয়া বসে। কিন্তু আবার সময় মত সেই বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। এই আমাদের মনের প্রকৃতি।

মন শীর্ষক পূর্ব এক প্রবন্ধে মনের বিকাশের কয়েকটি বিভিন্ন স্তর ও তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বুঝিবার জন্য উপরোক্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার হইবে। যাঁহারা পূর্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়েন নাই বা সে-বিষয় স্পষ্ট মনে নাই, তাঁহাদের সুবিধার জন্য অতি সংক্ষেপে আবার মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া মূল আলোচনায় ফিরিয়া যাইব।

ফ্রয়েড শিশুর জন্মের প্রথমাবস্থা হইতে শুরু করিয়া মনের বিকাশের যে কয়টি স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আদি অবস্থার নাম দিয়াছেন স্বতঃকামী (auto-erotic)। এই অবস্থায় শিশু একটা প্রায় মোহগ্রস্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। সেই সময় তাহার কেবলমাত্র ভাল-লাগা বা খারাপ-লাগার সামান্য সাধারণ অনুভূতি মাত্র থাকে। অর্থাৎ কোথা হইতে কী ভাবে বা শরীরের কোন অংশে সুখকর বা দুঃখকর অনুভূতি হইতেছে তাহা শিশু বুঝিতে পারে না। প্রায় একটা আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির অবস্থার মধ্যে শিশু তখন বাস করে। ইহার পরের অবস্থায় শিশু নিজের দেহের সহিত

কিছু পরিচয় লাভ করিয়া, অঙ্গ বিশেষের নাম না জানিয়াও, কোন অংশে সুখ বা কষ্টের কারণ তাহা বুঝিতে পারে এবং নিজের দেহকে সে তখন সুখের প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য করে। এই অবস্থাকে স্বকাম (narcissism) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায়ও শিশু নিজ ভিন্ন অপরের দিকে তত বেশী নজর দেয় না। ইহার পরের অবস্থায় শিশু বাহিরের জগতের দিকে দৃষ্টি দেয়। তখন যে-বস্তু বা যে-মানুষ হইতে সে সুখ পায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; ক্রমে সে তাহা পাইতে চায় ও তাহাকে ভালবাসে। তেমনই যাহা হইতে তাহার কষ্ট হয় তাহা ত্যাগ করিতে ও এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে ভাল-লাগার তথা ভালবাসার বস্তু বা পাত্রের দিকে তাহার আকর্ষণ ও ভাল না-লাগার বা কষ্টকর পাত্রের প্রতি তাহার বিকর্ষণ দেখা দিতে থাকে। ফলে ভাল মন্দ এই দুই শ্রেণীতে সকল অভিজ্ঞতা ভাগ হইয়া যাইতে থাকে। শিশুর প্রাথমিক চাহিদা মা মিটাইয়া থাকেন। তাহার ক্ষুধার কষ্ট, মাতৃস্তন্য হইতে দুধ পাইয়া দূর হয় বলিয়া সেই স্তনের প্রতি এবং মাতার প্রতি তাহার আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। মা আদর করেন, যত্ন করেন ও অস্বস্তিকর সকল অবস্থা দূর করিয়া শিশুকে আরাম দেন বলিয়াই ক্রমে সে মায়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। বড় হইতে থাকিলে ক্রমে তাহার মাকে সামগ্রিকভাবে লাভ করিবার চাহিদা জাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সকলের, বিশেষ করিয়া পিতা বা পরিবারের কর্তার, দাবি মিটাইতে মাতার যে সময় দিতে হয় তাহাতে শিশু নিজের প্রয়োজনমত মাকে না পাওয়ায় নিজের ভাগে ভালবাসা ও আদর-যত্ন কম পড়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইতে থাকে ; এবং যাহাদের জন্য তাহার সুখের ব্যাঘাত ঘটে তাহার বা তাহাদের প্রতি শিশুর বিদ্বেষ দেখা দেয়। ইহার ফলে মাতার প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি মাতাকে পাওয়ার বিষয়ে বিদ্বেষভাব শিশুর মনে দেখা দেয় ; গ্রীক পুরাণের ঘটনা অনুসারে এই অবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে ইডিপস (Oedipus) স্তর। আর একটি দশার নাম দেওয়া হইয়াছে সমকাম (homosexuality)। এই দশায় মানুষ প্রথমে অপরকে নিজের সম দেহাঙ্গযুক্ত মনে করে ; অর্থাৎ পুরুষ অপরকেও পুরুষ এবং মেয়ে অপরকেও মেয়ে বলিয়া গণ্য করে। এই অবস্থায় ভিন্ন লিঙ্গবোধ জন্মায় না। কয়েক বছর অনুপক্রম কাল (latency) যাপনের পর ক্রমে বিপরীত-লিঙ্গ পাত্রের প্রতি আসক্তি প্রবল হইতে থাকে। ইহাই মানুষের মনের ক্রমবিকাশের ধারা বলিয়া মনঃসমীক্ষকগণ দেখাইয়াছেন। মনের এই বিকাশের পরিক্রমণ কালোচিত না হইলে যে নানা প্রকারের অসুবিধা ও মানসিক রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে সে-কথা পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।

মনোবিকাশের যে ধারা ও দশাগুলির কথা সংক্ষেপে বলা হইল তাহা মনে রাখিলে আমাদের মূল আলোচনায় অগ্রসর হইতে আর অসুবিধা হইবে না। যে কয়টি স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি সেই সমস্তের মধ্যে দিয়া সকল মানুষকেই যাইতে হয়। পুর্বের স্তরগুলি পার হইয়া না আসিলে শেষোক্ত স্বাভাবিক পরিণত স্তরে পৌছান যায় না। আমাদের সকলের জীবনেই এই দশা ঘটে। সাধারণ স্বাভাবিক জীবন যাঁহারা যাপন করেন তাঁহারা অনেকেই এই সব কথা সহজে স্বীকার করিতে পারেন না। আলোচনা ও সমীক্ষা করিতে বসিয়া এই অভিজ্ঞতাই হয়। অস্বীকার করিলেও ইহা পরীক্ষিত সত্য। অসামাজিক বোধ হওয়ায় সমকাম (homosexuality) ও ইডিপস গূঢ়ৈষা (oedipus complex) সম্বন্ধে আপত্তি বেশী দেখা দেয়। তথাপি উল্লিখিত আমাদের মনের কামনার স্তরগুলি একদিকে আমাদের জীবনকে যেমন সুখের ও মধুময় করিতে পারে, অপর দিকে তেমনই জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশ বিপন্নও করিতে

পারে। বিবাহিত জীবন অসুখী হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইবার কিছু আলোচনা করিব।

২

নিজের পছন্দে বা অপরের পছন্দে যে-বিবাহ হয় তাহার মধ্যে শিক্ষিত সমাজে পাত্রী-পছন্দের বেলায় প্রথমে রূপ ও পরে গুণের মধ্যে বর্তমানে লেখাপড়া ও গানবাজনার দাবিই প্রধান বিচার্য গণ্য হইতেছে। অবশ্য স্বভাব ও ব্যবহার দেখা হয় না এমন নহে। পাত্র-পছন্দের বেলায় রূপের তুলনায় উপার্জন, চরিত্রের কর্মদক্ষতা, বা পরিবারের আর্থিক অবস্থা, গৌরব ইত্যাদির বিচারই প্রাধান্য লাভ করে। ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না এমন নহে। কেহ কেহ রূপের চেয়ে গুণের দিকেই বেশী মূল্য দিয়া থাকেন। অবশ্য এক এক জনের নিকট এক এক গুণ অধিক মূল্য পাইতে পারে। একের বিচারে যাহা গুণ অপরের বিচারে তাহার মূল্য বিশেষ কিছু নাও থাকিতে পারে। তেমনই রূপ বলিতে যাহা একজনকে আকর্ষণ করিবে অপরের নিকট তাহা আদৌ আকর্ষণীয় না হইতে পারে। ভাল-লাগা-বোধ বড় জটিল কুয়াশাচ্ছন্ন পথে চলাফেরা করে। কথায় বলে "যার পরে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম"। কেন এমন হয় তাহা সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে আমাদের চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলি আমাদের মনে এক বিশেষ ভাব (idea) জাগায়। প্রত্যেকের মধ্যে একই পাত্র হইতে একই ভাব জাগে না। অতীতের পুঞ্জীভূত নানা অভিজ্ঞতা হইতে এই ভাব ধীরে ধীরে জীবনে গড়িয়া উঠে। সুতরাং আমার মনের যাহা চাহিদা পাত্রের রূপ ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে পাওয়া ভাব যদি তাহার অনুকূল অর্থাৎ সেই চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আমার মনে না হয়, তবে তেমন মানুষ আমার পছন্দ হইবে না। রূপ একটা কথা মাত্র। সকল রূপ একই বোধ জাগায় না। সুতরাং একের পক্ষে যাহা অপরূপ অপরের নিকট তাহা গ্রাহ্য নাও হইতে পারে, এমন কি কুরূপ বলিয়াও বোধ হইতে পারে। এমন যে হয় তাহা দেখিয়াছি। তেমনই একই ব্যক্তির এক সময় যাহা ভাল লাগে অন্য এক সময় তাহাই যে ভাল লাগে না তাহা তো একটু মন দিয়া নজর করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এত বিভিন্ন রকমের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও যে, মানুষ মোটামুটি ভাবে বিবাহিত-জীবন যাপন করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। প্রথম যাহাকে ভাল লাগিল হঠাৎ কোনও ঘটনার ফলে, তাহার স্বভাবের এক অপরিচিত দিক প্রকাশ পাইলে তাহাকেই আর ভাল লাগে না; আবার প্রথম ভাল-না-লাগা মানুষকে বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে নূতন করিয়া পরিচয় পাওয়ায় বা অনেক দিন ধরিয়া কাছাকাছি বাস করিয়া বহুবার দেখাশুনার ফলে ভাল লাগিয়া যাইতে পারে। দেখিতে দেখিতে বা শুনিতে শুনিতে যেমন ভাল-লাগা বাড়িতে পারে, তেমনই আবার একই জিনিস বহুবার ঘুরপাক খাইতে থাকিলে তাহার প্রতি আকর্ষণ কমিয়াও যাইতে পারে। কেন তাহা হয় সে সকল জটিলতা এ প্রবন্ধে আর টানিয়া আনিব না। যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

যেমন করিয়াই হউক, পছন্দ করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। সবই মোটামুটি হয়তো চলনসই হইল, কিন্তু তবু মন সায় দেয় না। স্বতঃকাম স্তরে যাহার মন বাঁধা পড়িয়া আছে তাহার কথা বিবাহ প্রসঙ্গে উঠিতেই পারে না। কারণ সে বাস্তব কোনও অবস্থার সহিতই মনকে যুক্ত করিয়া চলিতে চায় না; আপন মনে ডুবিয়া থাকে। তাহার পক্ষে দুইজনের মিলিত জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন। এই ধরনের মানসতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবাহ দেওয়া কোন রকমেই যুক্তিযুক্ত নহে। বস্তুতঃ অতি মাত্রায় এই ভাব প্রকাশিত হইলে তাহা গুরুতর রোগলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু কোনও কোনও পিতামাতা, এমন কি

চিকিৎসকও, বিবাহ দিলে এই অবস্থা দুর হইয়া যাইবে মনে করিয়া এই ধরনের ব্যক্তির বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন। এবং এমন বিবাহ হইয়াও যায়। এই মানসিক অবস্থা যে এক প্রকার কঠিন মানসিক রোগ, সমাজে তাহা চিনিয়া বুঝিয়া চলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যাহার চরিত্রে স্বকাম প্রবণতা বেশী তাহার পক্ষেও বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া কঠিন। নিজেকে লইয়াই সে ব্যস্ত থাকে। নিজের সুখ, নিজের সুবিধা, নিজের মূল্য ইত্যাদিই তাহার জীবনের প্রধান কাম্য মনে হয়। এই রকম কোনও নারীর বিবাহ হইলে সে স্ত্রী হিসাবে স্বামীর নিকট হইতে তাহার নিজের রূপ-গুণের প্রশংসা পাইতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিবে, এবং তাহা না পাইলেই সে অসুখী হইবে। নিজের রূপচর্চায় তাহার সময় বেশী কাটিবে; দিনে বহুবার করিয়া বেশভূষা ও অন্যান্য সজ্জা পরিবর্তন করা, আয়নায় নিজের চেহারা বারে বারে দেখা, চুল বারে বারে ঠিক করা ইত্যাদি লইয়াই তাহার সময় কাটে। মনের টান এইদিকে বেশী থাকায় স্বামীর প্রয়োজন ও পরিবারের প্রয়োজনের দিকে তাহার নজর থাকিতে পারে না। ফলে অল্পদিনেই স্বামী নিজের চাহিদা পুরণের অভাব হেতু অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পূজা দিতে থাকে; ইহাদের মানসিক অবস্থা একদিক দিয়ে শিশুর মনে মাতার প্রতি যে-ভাববিমুগ্ধতা দেখা দেয় সেই স্তরে থাকিয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষ স্ত্রীকে ঐ পূজার বেদীতে বসাইয়া বিহ্বল মুগ্ধ অবস্থায় দিন যাপন করিয়া সুখী হয়। ভাগ্যক্রমে এই প্রকার স্বামী না পাইলে উক্ত ধরনের স্ত্রী বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারে না। তদুপরি, যে নিজেকেই প্রধানতঃ বেশী ভালবাসে তাহার পক্ষে অপরকে স্বাভাবিক মাত্রায় ভালবাসা সম্ভব হয় না; নিজের দিকেই মানসিক ভালবাসার অধিকাংশ আবেগ ন্যস্ত থাকিলে অপরের ভাগে সে-ভালবাসা কম পড়িয়া যায়। সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ এমন ভাবে পূজা দিয়া দিন কাটাইতে পারে না। পূজায় আন্তরিকতা হ্রাস পায়; তাহার ফলে স্বকামী স্ত্রী স্বামীকে আর আপন বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিতে পারে না। পূজোপকরণ কমিলেই ঐ শ্রেণীর স্ত্রী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হইতে থাকে এবং অচিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিরোধ দেখা দেয়। স্বকামী পুরুষ ব্যক্তিরও একই কারণে বিবাহিত জীবন সুখকর হয় না। এরূপ নারী যেমন ভাল স্ত্রী হইতে পারে না তেমনই ভাল মা-ও হইতে পারে না। নিজের রূপলাবণ্য ও দেহের প্রতি ঠিকমত নজর দিতে না পারার বা সন্তান-প্রজনন হেতু দেহের গঠন পরিবর্তিত হওয়ার অবস্থা সে সহ্য করিতে পারে না। সন্তান-পালনের নিমিত্ত যে অবশ্য অনিয়ম ও সন্তানের জন্য যে সময় দিতে হয় তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য সন্তানকে এবং সন্তান-জন্মের কারণ বলিয়া স্বামীকেও সে বিদ্বেষ করিতে শুরু করে। স্বামী, স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক মনোভাবের ফলে সন্তানের অযত্ন ও অযথা দোষারোপ অন্যায়- মনে করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন; উভয়ের মধ্যে এই লইয়া দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। কোনও কোনও সময় নিজের কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ায় নিজের মূল্য ও প্রতিষ্ঠা কমিয়া গিয়াছে মনে করিয়া এই মূল্যহীনতার জন্য স্বামীকে দোষী করে। এই মনোভাব বাহিরে প্রকাশ না করিলেও মনের গোপনে তাহা বিষক্রিয়া করিতে থাকে। একদিন সেই বিষ পারিবারিক জীবনে ছড়াইয়া পড়িয়া জীবন অসুখী করিয়া দেয়। যে-পুরুষ নিজের কৌমার্যের অতিমূল্য দেয় অথবা যৌনমিলনে নিজের দৈহিক ও আত্মীক ক্ষয়-ক্ষতি হয় মনে করে তাহার এই মনোভাবের অন্তরালে নিহিত থাকে নিজের প্রতি অতিদৃষ্টি ও নিজের অতি মূল্যবোধ; এবং এই ক্ষতি সম্বন্ধে অতিকাতরতার একটি কারণ হইল স্বকাম। পূর্বে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে

আমি এই প্রকারের স্বকাম যে সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে তাহা বলিয়াছি। নিজেকে প্রকৃত ভালবাসিলে প্রতি মুহূর্তে নিজের ক্ষতি ও মূল্যহীনতার সম্ভাবনা এমন করিয়া মানুষকে পীড়িত করে না। নিজের মূল্যবোধ সম্বন্ধে নিজের মনেই সন্দেহ ও দ্বিধা থাকে বলিয়াই এই বিকৃত স্বকাম অর্থাৎ এই অতি উগ্র 'আমি' ও 'আমার' বোধ জাগে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে স্বকামে অতিমাত্রায় আবদ্ধ ব্যক্তির বিবাহিত জীবন কেন সুখকর হইতে পারে না তাহা কিছুটা বুঝিতে পারা যাইবে। বিষয়টি জটিল। কিন্তু বহু বিস্তারিত ও জটিলতর প্রশ্নগুলি উত্থাপন না করিয়া সহজে কিছু বলা হইল মাত্র। স্বাভাবিক স্বকাম প্রত্যেকেরই থাকা প্রয়োজন ; ইহা না থাকিলে বাঁচিয়া থাকিবার উৎসাহ থাকে না। সুখের ইচ্ছা কিছুমাত্র না থাকিলে মানুষ বাঁচে না। স্বাভাবিক স্বকামের পরিণতি আনন্দদায়ক ও সুখকর। বিকার দেখা দিলে নানা সমস্যা ঘনাইয়া আসে। এই স্বকামের সহিত বিশেষ রকমের সমকাম যুক্ত হইলে যে-দুরারোগ্য মানসিক বাতুলতা দেখা দেয় তাহার ফলে বিবাহিত জীবন সুখী হইতে পারে না।

এইবার ইডিপস স্তরে আবদ্ধ ব্যক্তির বিবাহিত জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই শ্রেণীর পুরুষ-ব্যক্তি, নিজের মায়ের যে বিশেষ রূপ গুণ বা ভঙ্গী ভাল লাগে বা আকাঙ্খা করে সেইপ্রকার রূপ ইত্যাদি স্ত্রীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ায় এবং তাহা না পাইলে সে নিরাশ হয় ও বিবাহিত জীবন বিফলতাময় বলিয়া মনে করে। শিশু যেমন মাকে আঁকড়াইয়া আগলাইয়া চলিতে চায় এবং মাতার নিকট হইতেও তাহার প্রয়োজন মত আগলানো চাহে, বিবাহিত জীবনে এই শ্রেণীর বয়স্থ পুরুষও তেমনই স্ত্রীর উপর একান্ত নির্ভরশীল ও আশ্রয়প্রার্থীর মত মনোভাব লইয়া চলিতে চায়। তাহার খাওয়া, স্নান করা, জিনিস দেখিয়া রাখা, জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা, সব কিছুরই ভার স্ত্রী না লইলে সে চলিতে পারে না—বিব্রত বোধ করে, বিপদে পড়ে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে খোকনটিই থাকিয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে সে স্ত্রীর পরামর্শ ভিন্ন চলিতে পারে না ; অন্ততঃ পক্ষে তাহার কাজের সমর্থন সে স্ত্রীর নিকট আশা করে। অনেক স্বামী স্ত্রীর আঁচল-ধরা হইয়া থাকেন। সাধারণ ব্যবহারেও তাহার খোকাপনা যায় না। বিশেষ অবস্থায় এই শ্রেণীর স্বামীকে স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিতেও শোনা যায়। কোনও কোনও মানসিক রোগীর চিকিৎসা করিবার সময় জানিয়াছি যে, তাহারা যৌনসঙ্গমের সময় স্ত্রীকে মা না ডাকিলে বা ঐ সময় মায়ের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা কথা না বলিলে ঠিকমত যৌনসঙ্গমে কৃতকার্য হয় না। তাহারা সঙ্গমের সময় জোর করিয়া নিজের স্ত্রীকে দিয়া 'মা' শব্দ উচ্চারণ করায়। ইহা না হইলে তাহাদের যৌন-উত্তেজনা ঠিক মত হয় না ও যৌনতৃপ্তি তাহারা পায় না। সামান্যমাত্র অসুখ হইলে মা, মা, করিতে থাকে এবং স্ত্রীকে সর্বদা কাছে বসাইয়া তাহার নিকট হইতে নানা ভরসার কথা, সমবেদনার কথা শুনিতে চাহে। এরূপ ব্যক্তির স্ত্রী যদি অধিকার-প্রবণ, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আশ্রয়দাত্রী মাতৃস্বভাবা না হয় তবে তাহাদের বিবাহ সুখের হইতে পারে না। অনেকে বেশী বয়সের নারী না হইলে বিবাহ করিতে চাহে না, বা বিবাহ করিয়া সুখী হয় না। অন্য রকমের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এমন ব্যক্তি যাহারা অপরের বিবাহিত স্ত্রী ব্যতিরেকে কোনও কুমারীর প্রতি যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না। এক জনের কথা জানি যিনি যৌনসঙ্গমের পূর্বে ও ঐ সময় স্ত্রীকে অধিক বয়স্ক অথবা তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অনেক কম বয়সের পরিচিত লোকের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের সহিত যৌনক্রিয়ার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে বাধ্য করেন। ঐ সব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার

যৌন-ইচ্ছা জাগে, তাহা না হইলে রতিক্রিয়া তাঁহার সফল হয় না। অপর একজন তাঁহার স্ত্রী অমুকের মা, তমুকের মা, ইত্যাদি নানা জনের মা বলাইয়া পরে নিজে রতিক্রিয়ায় রত হইতে পারিতেন। নিজের স্ত্রীকে বড় না মনে করিতে পারিলে ইহারা বিবাহিত জীবন সুখে যাপন করিতে পারে না। ভিতরকার এই মনোভাব সামাজিকভাবে অপ্রশংসনীয় হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও লোক জবরদস্তিতে নিজেকে প্রধান করিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হয়। স্ত্রীর উপর অতিমাত্রায় দখলদারি করিতে থাকে; নিজের সামান্য কাজে বা ব্যবহারে স্ত্রীর নিকট হইতে বাহাদুরি লইতে থাকে; এমন কি, অনর্থক স্ত্রীকে দোষী বানাইয়া তাহার উপর নানা রকমের কঠোরতা অবলম্বন করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্য এক শ্রেণী আবার নিজের অপেক্ষা অনেক কমবয়সী নারীকে স্ত্রী নির্বাচন করে। 'বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী' প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূলেও ঐ ইডিপস মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত পিতা পুত্রীর আকর্ষণের মনোভাবও জড়িত থাকে। কেহ কেহ স্ত্রীকে বড় মনে করিয়া তাহাকে মাতার স্থান দিয়া তাহার সহিত স্ত্রীসহবাস করিতে অসমর্থ হয়। স্ত্রীর তুলনায় নিজেকে শিশু মনে করিয়া যৌন-সম্ভোগে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং অকৃতকার্য হয়। এই মনোভাবের প্রবলতা অনুসারে কেহ কেহ হয়তো স্ত্রীসম্ভোগ একেবারেই করিতে পারে না। প্রত্যেক স্ত্রীলোকই তাহাদের নিকট মা বলিয়া মনে হওয়ায় রতি-ক্রিয়া অসম্ভব মনে হয়। কেহবা যৌনসঙ্গম করিতে পারিলেও, কোনও রকমে তাহা সমাধা করিয়া, অতৃপ্ত এমন কি দোষী বা নিজের প্রতি পাপী-মনোভাব লইয়া আত্মপীড়নে রত হয়। ইহাতে জীবনের সুখ নষ্ট হয়, বিবাহিত জীবনও বিপর্যস্ত হয়। পুরুষের বিষয় যে-কথা বলা হইল ইডিপস-দশায় আবদ্ধ নারীরও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে নিজের পিতা বা পিতৃস্থানীয় কাহারও কল্পছক মনে আঁকিয়া স্বামীর সঙ্গে সর্বদা তাহা মিলাইয়া দেখে। মিল না হইলেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিবাহিত জীবনে অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় একে অপরের কথা না ভাবিয়া অন্য জনের সম্ভোগের কথা বা অন্য কাহারও সহিত সঙ্গমের কল্পনা করিয়া থাকে। ইহার ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত ভাবের আদান-প্রদান ও বুঝাপড়া হইতে পারে না; উভয়ে উভয় হইতে দূরেই থাকিয়া যায়। কিছুদিন হইল আমাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহের প্রচলন হইয়াছে। এক শ্রেণীর মানুষ বিধবা বা একবার যে স্বামী ত্যাগ করিয়াছে এই রকম নারীকে পত্নীরূপে পাইতে চাহে। কোনও কোনও নারীও দোজবরকে বা স্ত্রীত্যাগকারী পুরুষকে স্বামীরূপে পাইতে চাহে। ইহা না হইলে ইহাদের বিবাহিত জীবন তৃপ্ত হয় না; ফলে বিবাহে অশান্তি দেখা দেয়। এই শ্রেণীর নারী হয় অধিক বয়স্ক বা অনেক কম বয়স্ক পুরুষকে পছন্দ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিত পুরুষকেও পছন্দ করে। ঘুমাইবার সময় বা ঘুম ভাঙ্গিবার সময় স্ত্রী বা নারীর পক্ষে স্বামী নিকটে না থাকিলে ইহারা অস্বস্তি বোধ করে এবং একটা অস্বস্তিকর শূন্যতা-বোধ ইহাদের মধ্যে দেখা দেয়। সহজ স্বাভাবিক মনোভাব না থাকার ফলে নানা রকমের অযথা জটিলতা দেখা দেয়। অতৃপ্তি ও অশান্তি বাড়িয়া বিবাহিত জীবন অসুখী হইয়া পড়ে। রতি-বিলাসের সময় নানা রকম শিশুভাব, পিতৃভাব, মাতৃভাব বা কন্যাভাব না জাগাইলে ইহাদের রতিতৃপ্তি হয় না। সুতরাং একের এই মনোভাবের সহিত অপরপক্ষ যদি তাল মিলাইয়া না চলিতে পারে তবে বিবাহিত জীবন অসুখী হয়।

সমকামীর ক্ষেত্রেও বিবাহিত জীবনের সমস্যার জটিলতা দেখা দিতে থাকে। সমকামের মাত্রা বেশী হইলে, সে-মানুষ ইতরকামীয় (heterosexual) জীবন যাপন করিতে পারে না। সামাজিক চাপে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও ইহারা বিবাহিত জীবন সুষ্ঠুভাবে যাপন করিতে পারে না। নারীকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পাইয়া এই ধরনের পুরুষ সুখী হয় না। ইহাদের নিকট অপর পুরুষের ভালবাসাই অধিক কাম্য। স্ত্রী-সংসর্গ ইহাদের নিকট অপ্রীতিকর মনে হয় এবং যৌনমিলন আদৌ সম্ভব না হইতে পারে। এই প্রবৃত্তির শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকিয়াও যদি ইহা ইতরকাম মনোভাবের তুলনায় প্রবল হয় তাহা হইলেও স্বাভাবিক যৌনমিলনে আনন্দ পাওয়া যায় না। স্ত্রীসম্ভোগ তাহাদের কাম্য না হইয়া প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রী ইহাতে সুখী হইতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সমকামিতা প্রবল থাকায় তাহা অসামাজিক বোধে চাপা দিয়া মন বিকল্পে অতিমাত্রায় কামুকতা প্রকাশ করে। তখন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহার রতিবিলাসের মাত্রা বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ তাহার মন যেন নিজের কাছে ও অপরের কাছে জাহির করিয়া নিজের স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তির একটা প্রদর্শনের মনোভাব লইয়া চলিতে থাকে। বিপরীত বা বিরোধী মনোভাবকে চাপিতে হইলে অপর প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া দেখানোর প্রয়োজন হয়। ইহা সেই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া-প্রসূত কামিতার প্রকাশ। ইহাতে সুস্থ স্বাভাবিকতা থাকে না। কিছু দিনেই ইহা নিজেকে ক্লান্ত করিয়া তুলে অথবা নিজেকে কেবলই অশান্ত করিয়া ঘুরাইয়া মারে। যৌন আসক্তিকে বাড়াবাড়ি রকমে প্রকাশ করিয়া, পুনঃ পুনঃ মৈথুনেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ইহাতে স্ত্রীকে স্বামী আনন্দ দিতে না পারায় ও নিজের নিগূঢ় বাসনার চাপে চঞ্চল অবস্থায় ছটফট করার ফলে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের স্বাভাবিক শান্তিটুকু নষ্ট হইয়া বিবাহিত জীবন অতৃপ্তিকর হইয়া উঠে। এই সমকামের মধ্যে স্বকামের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের মত অপর একজনকে ভালবাসিয়া নিজেকেই আবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভালবাসা হয়। এই সমকামীদের মধ্যে একদল আপন অপেক্ষা বয়সে বা সম্মানে যাহারা বড় তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়; অপর দল নিজের অপেক্ষা বয়স, সম্মান বা প্রতিষ্ঠায় ছোটদিগের সহিত মিলিয়া আনন্দ পায়। কেহ ভক্ত বা অনুচর হয়, কেহ দলের নেতা হয়, চালক হয়, কৃপা বিতরণ করে এবং অন্যদের নিকট হইতে আত্মমর্যাদা বাড়াইবার জন্য নিজের গৌরব কথা শুনিয়া তৃপ্ত হয়। কিন্তু এমন পুরুষ নারীর প্রশংসা অপেক্ষা পুরুষের প্রশংসাকেই মূল্য দেয়। নারীকে ইহারা যেমন মূল্য দেয় না, তাহাদের নিকট হইতে মূল্য পাইতেও চাহে না। এমন মানুষের পক্ষে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া যে কত অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহারা মেয়েদের শোষণকারী, সর্বনাশকারী ও নরকের দ্বার বলিয়া মনে করে। যে পুরুষ নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে মনে মনে বা নিজের নির্জ্ঞানেতে এই দৃষ্টিতে দেখিবে তাহার পক্ষে সুখের বিবাহিত-জীবন যাপন করা অলীক স্বপ্ন মাত্র। বাহিরে ঘটা করিয়া দুয়ের মধ্যে মিলন প্রকাশ করিলেও, উভয়েই বুঝিতে পারে যে এই সাজানো মিথ্যা দিনের পর দিন চালাইতে থাকিলেও তাহা উভয়ের কাহারও মনে কোনও বিভ্রমের সৃষ্টি করিতে পারে না। এই শ্রেণীর নর-নারী বিবাহ-বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। এমন কি সুযোগ পাইলে তাহা প্রচার পর্যন্তও করে। এ ধরনের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীদের ব্যবহার ও রতিক্রিয়াকে দৈহিক অত্যাচার বলিয়া মনে করে। ইহারা যৌনসুখ-ভোগ, স্বাভাবিক যৌনমিলন হইতে পায় না। এই শ্রেণীর মানুষ বেশী

বন্ধুবৎসল হয়, কিন্তু বিবাহিত জীবন ইহাদের সুখের হয় না। এই শ্রেণীর নারী সন্তান চাহে না; মাত্রাধিক্য হইলে শিশুদের আদর-যত্নও করিতে পারে না। ইহাদেরই কেহ কেহ বিকল্পে সম-লিঙ্গ শিশুদের লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটিও করে। সমকামের সক্রিয় (active) ও নিষ্ক্রিয় (passive) প্রবৃত্তির মধ্যে কোন চাহিদা বেশী সেই অনুসারে তাহাদের একের অন্যের প্রতি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক বিবাহিত-জীবন যাপনে সুখী হওয়া সম্ভব হয় না। ইহারা স্বামী-স্ত্রীর সম্ভোগের মধ্যে এমন এক অবস্থান (posture) বা সংগমের পদ্ধতির অনুশীলন করে যাহা অপরপক্ষের নিকট সুখকর বোধ নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহারা নিজেদের পথ বদল করিতে পারে না; কারণ, পরিবর্তন করিলে অন্য যে-পন্থা গৃহীত হইবে তাহাতে নিজের সমকামিতা তৃপ্ত না হইলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকারের বিকৃত যৌন-আচরণ এই সকল নানান মানসিক বাধা-বিপত্তির ফল; এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে, উপরোক্ত আচরণগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলাই সঙ্গত।

মনের এত শত অলিগলি ঠিকমত পার হইয়া স্বভাবী বিবাহিত-জীবন ভোগের উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় পৌঁছাইতে পারাই প্রায় অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু মন আমাদের সে-কৌশল জানে বলিয়াই, এখানে ওখানে বাধা খাইয়াও সাধারণতঃ স্বভাবী জীবনের পথই অনুসরণ করে। তাহা করিতে পারিলেই স্বামী-স্ত্রীর জীবনও সুখকর হইতে পারে। নিজেকে অতিমাত্রায় বড় করিলে বা ছোট করিলে, অথবা যে-সকল জটিলতার কথা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি তাহার যে কোনওটার মধ্যে জড়াইয়া পড়িলে বিবাহিত জীবন সুখের হইতে পারে না। আমি প্রবল কিন্তু অপরপক্ষের স্বভাবে প্রবল দ্বারা চালিত হওয়ার ইচ্ছা না থাকিলে দুয়ের মিলন যেমন সুখের হইতে পারে না, ঠিক সেই রকমই স্বামীর যে মনোভঙ্গী তাহার বিপরীত ও তাহাতেই সুখী হওয়ার মনোভাব যদি স্ত্রীর মধ্যে না থাকে তবে বিবাহিত-জীবন সুখের হইতে পারে না। সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যেই কিছু মাত্রায় দেওয়া ও লওয়া এই উভয় প্রকারের মানসতার মধ্যে সুখ পাইবার মত মনের গতি না থাকিলে বিবাহিত-জীবন বা সমাজ-জীবন কিছুতেই সুখকর হইতে পারে না। সুতরাং সন্তানের জীবন সুখকর করিবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন; প্রথমাবস্থা হইতেই শিশু যাহাতে মনোবিকাশের কোনও এক স্তরে আটকাইয়া না যায় সেদিকে বিশেষ সতর্কতা লওয়া দরকার। তাহা না হইলে শিশুর ভবিষ্যত জীবনে শৈশবে নিহিত কোনও কারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে; এবং একই কারণে বিবাহিত জীবনেও সুখের অভাব দেখা দিতে পারে। শুধু নিজেদের সুখের দিকেই দৃষ্টি দিয়া না চলিয়া, সন্তানের ভবিষ্যতের দিকেও লক্ষ রাখিয়া চলিলে উভয়ের জীবনেই সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে পারে। সেইজন্যই মানুষের মনের এই সকল জটিলতার কথা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিজে না জানিয়া শিশুকে সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মাতা-পিতার পক্ষে মনোবিদ্যার এই সব তথ্যগুলি ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া চলিবার সময় আসিয়াছে। কেবল বিদ্যালয়ের ঘেরা-দেওয়ালের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়া জীবনের সমস্যা দূর করা বা জীবনের সুখ আনন্দ বাড়ানো যায় না। শিক্ষাকে জীবনধর্মী ও জীবনমুখী করাই আসল শিক্ষা। সেই শিক্ষার জন্যই সচেষ্ট হইতে হইবে।

একটি দিনপঞ্জী

উদয়চাঁদ পাঠক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[৯]

আশ্বিনের সোনালী রোদের পুলকালোকটুকু এক ঝাপটায় মুছে দিয়ে এ কী করলে ঋতুরাজ! এই শরতের আকাশে ছড়িয়ে দিলে শ্রাবণের জলভরা মেঘ। অবিরাম বর্ষণের ক্রন্দন তার যে থামতে চায় না। এ কী তোমার লীলা! এ কী তোমার খেলা! হাসির আভাস দিয়ে ক্রন্দনে বুক ভরে তোল। আমার মনটাকে নিয়ে তোমার এ খেলা কেন প্রভু! অনেক তো হাসালে কাঁদালে। যুগ যুগ ধরে কত মানুষকে নিয়ে তুমি এই একই লীলা করে চলেছ। ব্যথাহীন, বেদনাহীন তোমার এই নিষ্ঠুর লীলা! তবু তোমাকেই বলি দয়াময়। আর পাব কোথায়, কেইবা আছে! যাকে ধরতে যাই সেই দু'দিন না যেতে দেখি কত দূরে সরে গেছে। তাই বারে বারে ফিরে ফিরে তোমাকেই ডাকি; তুমি নেই বলেই তোমাকে পাওয়াও যায় না, নতুন করে হারানোও যায় না। তবু কখনও মনে করি তোমাকে পাব, কখনও ভাবি তোমাকে পেলাম। মন আমার পেতে চায় যে। একান্ত ভাবে পেতে চায় বলেই এক সময় অস্থির হয়ে ব'লে বসে এই তোমাকে পেলাম। কাকে পেলাম, কোথায় পেলাম, কে সে, এ সবের কোনও খোঁজখবর মন তখন জানতে চায় না। পেলাম আমি, মন আমার ভরেছে, এই আমার যথেষ্ট। এই আমার সব জুড়ে পাওয়াটুকু তুমি ক্ষণে ক্ষণে কেড়ে নিতে চাও, কেড়ে নিয়ে যাও। নিষ্ঠুর তুমি! নির্দয় তুমি! তবু তোমাকেই চাই। পাবার নয় বলেই চাওয়াও ফুরয় না। মন যে আমার না-পাওয়াকে মানে না। তাই থেকে থেকে পাবার স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়। যাকে বাইরে পাই না, অন্তর তাকে দিয়ে ভরে তুলি। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই; বলতে চাই, তুমি আমার—তোমাকে এই যে আমি পেলাম। মন অবিরাম বলতে থাকে, পেয়েছি তোমারে। ভরে ওঠে মন। ভরসা পাই না বলেই কেবলই বলতে থাকি তুমি আমার, তুমি আমার। এতে আমি তৃপ্তি পাই; আমার চাওয়াটা যে কত তীব্র সে-কথা বেশী করে অনুভব করি। এক এক বার মন বলে ওঠে আমি চাই এই সত্যটাই আমার কাছে যথেষ্ট; আমি তোমাকে চাই। নাই বা হলে তুমি আমার, তবু তুমি আমারই থাকবে। সেখান থেকে তোমাকে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সেখানে তুমি একান্তই আমার। আর কারও চাওয়ার দাবি সেখানে পৌছবে না। বিষ্ণু আছেন অনন্ত শয়নে শায়িত, লক্ষ্মী আছেন তাঁর পাশে; এ চিরন্তনী।

তুমি সুন্দর, তুমিই নিষ্ঠুর। তুমি কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে ঠেলে দাও। কাছে এনে কর উপেক্ষা, মান দিয়ে কর অপমান। শূন্য না থাকলে সুর বাজে না। তুমি পূর্ণ, তাই তুমি আমার শূন্যতাকে আঘাত করে বাজাতে পার। বুঝি না কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর! আমার রিক্ততাকে তুমি ভরতে পারতে তোমার দাক্ষিণ্যে; আর কেউ তা পারে না। তুমি তা জান, তবু তুমি আমার রিক্ততাই বজায় রাখলে। খেল তুমি তোমার আপন খেলা, খেলে যাও। যা হতে পারত সুন্দর, যা ভরে উঠতে পারত তোমার কল্যাণপরশে, যা শুভ হতে পারত, যা জাগাতে পারত সৃষ্টির অপূর্ব লীলাছন্দ,

তোমার অনাদরে তার সে-সৃষ্টি হয়ে রইল মূক। ভেতর থেকে এই বাদলা আকাশের মত আনন্দ লুপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে গুমরে গুমরে ওঠে, পথ পায় না। যা হতে পারত তা হয় না। তুমি তার কী বুঝবে! তোমার খেলায় তুমি মেতেছ। শিশু তার খেলনার প্রতি যে মনোভাব নিয়ে কখনও আদরে কাছে টানে, কখনও অনাদরে তাচ্ছিল্যে দূরে সরিয়ে দেয়, আমার এই জীবনটাকে নিয়ে তুমিও সেই খেলাই খেলছ। আমার কিছু করবার মত তুমি রাখ নি। আমার যথাসর্বস্ব তুমি কেড়ে নিয়েছ। রিক্ত করে জীবনের সব রস কেড়ে নিয়ে তুমি নিজে জয়ের নিশান উড়িয়েছ। মনে করেছ তুমিই সব, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই, তুমি এক অদ্বিতীয়। ভেবে দেখ তুমিও কি আমারই মত একা নও, পূর্ণ হয়েও রিক্ত নও। আমাকে না ভরলে কোথায় তোমার পূর্ণতার পূর্ণিমা!

এমন দিনে আমার মনে তার কথা বেশী করে ঘনিয়ে আসে। কলেজ জীবনে প্রথম দেখা। সে-দেখা ক্রমে নেশার দেখায় রূপ নিল। তাকে ভাল লাগল। তাকে ভালবাসলাম। জানতে পারি নি কবে কখন থেকে তাকে আমি ভালবেসেছি। যেদিন নিশ্চয় করে জানলাম তাকে আমি ভালবেসেছি সেদিন দেখি তার প্রভাব আমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। সে কিসে খুশী হবে, কিসে সুখী হবে মন আমার অনুক্ষণ সেই কথাই খুঁজে চলেছে। তার কথা সকল কাজে জড়িয়ে থাকে। চোখের সামনে যতটুকু সময় থাকে তখনও সে আমার চোখের-দেখা লোকের মাত্র নয়। সে-দেখা ছাড়িয়ে, আরও কত বাড়িয়ে নতুন করে তাকে দেখে চলেছি। তখন তা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম সে তাই, যা আমার মন তাকে মনে করে নিয়েছে। মনের অজানাতেই মন তাকে মনে মনে করেছে রচনা। এ আমার দুর্ভাগ্য! কেবল আমারই বা বলব কেন? মানুষেরই এই দুর্ভাগ্য। যা দেখে তার সঙ্গে স্বপ্ন মিলিয়ে দিয়ে এক নতুন সৃষ্টি করে নেয়। প্রকৃত বস্তু বা মানুষটা ভেতরে কোথায় আড়ালে পড়ে যায় তার ঠিক থাকে না। আমারও তাই হ'ল। আমিও তাই করেছিলাম; ফলে দাঁড়াল সে-স্বপ্নবিলাস বাস্তব-ছাড়া, ঘর-ছাড়া এক স্বপ্ন। 'মনপবনের নাও' তখন পাড়ি মেলেছে এক সব-পাওয়ার গভীর সীমাহীন সাগরে। দুজনেই মনে করেছি আমাদের সে-যাত্রা ফুরবে না। দুজনেই? হয়তো দুজনেই, হয়তো সে নয়; আমিই একা।

তার কপালে যে ছিল লাল কুমকুমের ছোট্ট টিপ—একদিন দেখি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিঁথিতে সিন্দুরের রক্তিম রেখা। সোনার আলো-ঝলমল আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ জলে উঠে আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঝলকে ফাটল ধরিয়ে মিলিয়ে গেল।

দেখা বন্ধ হ'ল। সে কোথায় গেল জানতে পারি নি। খোঁজও করি নি। কার খোঁজ করব? একান্ত আপন যে সে যখন পর হয় তখন সে নিতান্তই পর হয়ে যায়।

কতদিন কতবার দুজনে বলেছি আমরা দুজনে ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি। তার জন্য সৃষ্টি হয়েছি আমি, আর আমার জন্য সে। কোথায় কোন দেশে কার ঘরে জন্ম হ'ল। দূরত্বের সব বাধা দূর করে দিয়ে দুটি মন এসে এক হয়ে মিলে গেল। মন যখন টানে দূর কি আর দূর থাকে। মনই দূরত্ব সৃষ্টি করে, আবার মনই তা লোপ করে দিতে পারে। মন যা গড়ে, মনই তা ভাঙতে পারে। কত কথা বলা হ'ল, কত গান, কত সুর; আজও তার রেশ খুঁজলে পাওয়া যায়। সে রেশও বাজে আমারই মনে। সে কোথায়? বছর ঘুরে গেছে; বেশী দূরে নয়, কাছেই থাকে। ন'মাস ছ'মাসে যদি বা কখনও চোখের দেখা হয়, কি করব, কি বলব, ভেবে ওঠবার সময়টুকু না দিয়েই সে হয়তো বা একটু মাথা নেড়ে চলে

যায়। দেখলে মনে হবে "মুখ চেনা এক লোক, কবে যেন কোথায় দেখা হয়েছিল, নামটাও মনে নেই"। তবু সে ঐটুকু আমাকে চেনে। এটা তার উদারতা বলে মানতে হবে। কলকাতা শহরে নাকি প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক বাস করছে। তার মধ্যে আমাকে একটু মুখচেনা-ভাবেও চেনা আমার পরম ভাগ্য বলেই মানি।

বর্ষার পরে এল শরৎ। বাংলার মাঠ ধানে ভরে উঠেছে। এখানে ওখানে ক্ষেতের রং সোনালী হতে শুরু করেছে। কে জানত আমার ভাগ্যক্ষেত্রেও সোনালী ছোপ লেগেছে। একদিন তার দেখা পেলাম রাজপথের ধারে এক দোকানের সম্মুখে। সামান্য জিনিস কেনবার জন্য দোকানের সামনে সরে দাঁড়িয়েছি ; পিছন থেকে অতি পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলাম—শুধু কণ্ঠস্বরই, তাতে কথা ছিল না, তবু ছিল সকল কথায় ভরা। না দেখেই মন আমার তাকে চিনতে পেরেছে। ততক্ষণে সে আমার হাত ধরে মৃদু হেসে বলে, 'চল বাড়ী চল'। এ-আহ্বান অগ্রাহ্য করবার মত আহ্বান নয়। কথা না বলে তার চোখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলাম। পথে কোনও কথা হ'ল না—কেবল বলেছিল সে তার বাড়ীতে আমায় নিয়ে চলেছে। আমি আপত্তি করায় বলেছিল অসুবিধা বা দ্বিধা বোধ করবার কোনও কারণ নেই। আবার বললে "এস"। গেলাম সেই তার বাড়ীতে। মন তখন অনিশ্চিত অবস্থায় দোলা খাচ্ছে। ভাল করে বোঝবার আগেই সে নিজে একটা বড় চেয়ারে বসে আমাকে তার পাশে, কাছেই নিয়ে বসাল। কেমন যেন চালিতের মত আমার অবস্থা। যা ঘটছে তাও সব যেন বুঝতে পারছি না। এক বছর পরে এ আবার কী শুরু হ'ল! ভাববার বোঝবার সুযোগ পেলাম না। সে অল্প সময়ের মধ্যেই আগের মতই আবার অতি কাছের আমার হয়ে গেল। ভুলেই গেলাম তেমনি ভাবে যে আমাদের জীবন চলতে চলতে তার মধ্যে এক বছরের ছেদ পড়ে গেছে। ভুলেই গেলাম আমাদের মিলনের পূর্ণ পাত্র আমার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম যে-ছেদ চলার পথে একবার দেখা দিয়েছে আর তাকে জোড়া লাগানো যাবে না। কঠিন পাথরের মধ্যে ফাটল ধরলে আর তেমন করে তাকে নিশ্চিহ্ন ভাবে জোড়া দেওয়া যায় না ; ফাটলের দাগ থেকেই যায়। কিন্তু দু' চার দিনেই মনে হ'ল অতীত বলে যা ছিল বাধাযুক্ত সে-সবই যে দূর হয়ে গেছে শুধু তাই নয় ; কোনওকালে কোনও বাধাই ছিল না। জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলে আসছে—স্বপ্নভরা জীবনের গতিবেগে প্রাণময়। অনেকদিন জিজ্ঞাসাই করা হয় নি তার স্বামীর সম্বন্ধে কোনও কথা। তাঁর দেখাই পাই নি এতদিনে কোনওদিন। সে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশছে, কিন্তু কোনও বাধা কোনও দিক থেকে আসছে না। একদিন শুনলাম তার স্বামী চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশ গিয়েছেন। থাকতে হবে দু'তিন বছর। শুনে একদিকে স্বস্তি বোধ করলাম এই ভেবে যে সে আবার আমার হয়েই আমার কাছে ফিরে এসেছে। তাকে হারাতে হবে না—হারাবার ভয় মনে এল না। মনে হ'ল যে আমার সে আমার কাছেই এসেছে ; মাঝে যে-বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেটা নিতান্তই সাময়িক—মন থেকে মুছে ফেলবারই যোগ্য, আর তার কোনও মূল্য নেই। হ'লও তাই। মন ভুলে গেল সে-কথা। ভরাপালে 'মনপবনের নাও' আবার ছুটে চলেছে। পারের খবর, ঘাটের খবর রাখবার কোনও প্রয়োজনই হ'ল না—কদাচিৎ স্বামীর কথা উঠে পড়লে সে তা চাপা দিয়ে দিত। আমাদের জীবনের সুখের কথা দিয়ে ভরিয়ে দিত দিনগুলি। আমারও সুখের-নেশায়-মাতা মন তাতে ডুবে থাকতে চাইত, তাই তার কথায় খুশী হতাম। মনে করতাম সে আমার, তাই ওর আর আমার মধ্যে অন্য আর কারও স্থান সে দিতে চায় না। তারও মন ভরে আছে।

এক সময় তার আত্মীয়মহলে আমাদের সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনার ঢেউ উঠেছিল। তার কানে সবই প্রবেশ করে সেইখানেই আটকা পড়ে গেছে। আমার কানে এসে পৌছনোর মত কোনও পথ খোলা ছিল না। দিন বেশ চলে যাচ্ছিল—যেমন চেয়েছিলাম তেমনই। কিছু জানতে পারি নি, বুঝতেও পারি নি। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এল ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ ; তা থেকে বুঝতে পারলাম বাইরে ঝড় উঠেছে। তাকে সে-কথা বলায় বলেছিল ওদিকে কান দিতে হবে না। আমাদের জীবন আমাদেরই জীবন। হিংসায় যারা জলে মরছে, নিজেদের জ্বালা মেটাতে তারা আমাদের নিয়ে অপবাদ দিচ্ছে। নিজের সুখ মেটাতে না পেরে আমাদের সুখে আঁচড় কাটতে হাত বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্রতায়, সংকীর্ণতায় বাঁধা ওরা নিজের আগুনে জলে মরবে। আমাদের সেদিকে তাকাবার দরকার নেই। বোধহয় তার কথাই ঠিক। বাইরের ঝড় বোধহয় সময় মত থেমে গিয়ে আবার দিন সহজ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার উপর দিয়ে কতটা ঝড়ের ঝাপটা গেছে সে-খবর সঠিক পাই নি।

এদিকে উপার্জনক্ষম পাত্র হিসেবে বিয়ের বাজারে আমার নিলামের ডাক বেড়েই চলেছে ; মায়ের কাছে, বোনের কাছে সে-বাজারদরের খবর শুনতে পাই। তারা মত জানতে চাইলে, হাসি। বোন খোঁচা দিয়ে বলত নিজের নাকি ওজন বুঝি না, তাই অহংকারে আকাশ ছুঁয়ে আছি—মাটির যা কিছু সবই আমার কাছে নিতান্তই হেয়, তুচ্ছ মনে হয়। সে নিজেই এ কথা বলে. আবার নিজেই আমার উপর চটে যায়। কিন্তু শুভ লক্ষণ এই যে তার ঠাণ্ডা হতে বেশী সময় লাগে না। একটু বেশী দাবি চালাতে থাকলে গম্ভীর-ভাবে ওর বিয়ের সম্বন্ধে কথা বলি—এমন এক ছেলের খবর এসেছে যে বিনয়ে একবারে বাবা গোঁসাই, ব্রজধুলির মত সকলের পায়ের তলায় থাকাতেই গৌরব বোধ করে। এ কথায় সহজেই কাজ হয়। সে অবাস্তব ক্রোধ দেখিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। মায়ের কথায় এ সব উত্তর দেওয়া চলে না। তাই দ্ব্যর্থকভাবে বলি এ জীবনের মত আমার বিয়ে করা হয়ে গেছে—পরজীবনের জন্য পাত্রী দেখ। মা বোঝেন না ; বলেন, আর দেরী করা চলে না। নাতি নাতনীর মুখ দেখতে চান ; এমন শূন্য ঘরে নাকি আর দিন তাঁর কাটে না। হয়তো বা তাই সত্যি। তাঁর দিন হয়তো বৈচিত্রহীন স্বাদহীন হয়ে আসছে। বয়সের ধর্মই এই। যাদের ঘিরে, যাদের আশ্রয় করে জীবন চলতে থাকে তারা বড় হয়ে ওঠে। বড় হয়ে দূরে সরে যায়। সাথী যারা তাদের অনেককেই হারাতে হয়—মৃত্যুতে, না হ'ক অপমৃত্যুতে। অর্থাৎ তারাও নিজের নিজের সংসারের পাকে আটকা পড়ে যায়—আগেকার পাতানো সম্বন্ধ যায় শিথিল হয়ে। বৃদ্ধ বয়সে রস তাই কমে আসে। যার উপর হাত বাড়াতে যাওয়া যায় বৃদ্ধ বলে সে কত দ্রুত সরে যেতে পারবে সেই চেষ্টাই করে। নিজের জীবনটাই তখন নিজের কাছে অনর্থক মনে হতে থাকে। জীবনের অর্থ আমরা গড়ে তুলি মাকড়সার জালের মত চার পাশের বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজের মনকে বেঁধে দিয়ে। সে-বাঁধন ছিঁড়তে থাকলে জীবনের জালের বিস্তারটা সংকুচিত হয়ে যায়। যে-বিস্তৃত জালে শিশির-ভেজা হেমন্তের সকালের আলো রামধনু রং ছড়াত, সেখানে ছিন্ন সংকুচিত জীবনের জট-পাকানো অবস্থায় না দেখা যায় কোনও রূপ, না জাগে কোনও বর্ণের কল্প-খেলা। এমন রূপহীন বার্ধক্য তাই ভারি বোঝা হয়ে ওঠে। তাই আবার নাতি নাতনীর সঙ্গে নিজের জীবনের অতীতটাকে সোনার কাঠির পরশে বাঁচিয়ে তুলে রসপুর্ণ করে নিতে চায়।

শুনেছি তাদের সে সব কথা। আমার জীবনে যখন সৃজনের প্লাবন চলেছে তখন ও সব কথা আমার মনে কোনও রেখাপাত করতে পারে নি। তাই আমি চলেছিলাম আমার আপন ভাবে-ভঙ্গী

জীবন নিয়ে। হিংসুকের জ্বালা এক সময় শক্রতার অস্ত্র তার হাতে তুলে দেয়। তখন তারা অনিষ্ট করবার চেষ্টায় লাগে। আমি যে-সুখ চাই বাধার জন্য তা ভোগ করতে পারি না। আর একজন সে-বাধা অগ্রাহ্য করে সেই সুখ ভোগ করতে থাকবে আমারই চোখের সামনে; আমি তাই দেখব আর যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকব, বেশীদিন তা সহ্য হয় না—মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর কিছু না পেরে শেষে আঘাত হানতে উদ্যত হয়। নিপীড়িত বাসনা ক্রোধের আক্রম রূপ ধরে প্রকাশ পায়। মায়ের কাছে উড়ো চিঠি এল। ছেলে বিয়ে করতে চায় না তার কারণ—তার আর বিয়ে করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে নিজের ব্যবস্থা নিজেই সে করে নিয়েছে। বাইরে সে ভদ্রবেশে ভাল মানুষটি হয়ে ঘুরে বেড়ায়; তার স্বরূপ জানতে হলে অমুক ঠিকানার খবর রাখলেই সব জানা যাবে। ওদিকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তার স্বামীর কাছে চিঠি গেল; হয়তো একই মর্মে—আরও একটু রং চড়িয়ে।

এবারের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কারণেই পূর্বের চেয়ে জোরালো আকার ধারণ করল। বাড়ীতে চোখের জল, মুখ ভার ইত্যাদি চলল। উপলক্ষে নানা কথা শুনতে হ'ল। আত্মীয়স্বজন অনেকেই অল্পদিনে জেনে গেল আমার নৈতিক পতনের কথা। ওদিকে তার স্বামীর কাছ থেকে কি চিঠি এল তা জানি না; কিন্তু সে আমায় বলেছিল, লিখে দিয়েছে যে নিজের স্ত্রীকে যদি বিশ্বাস করতে না পার তবে তেমন স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ভাল। মতামত জানবার জন্য সে তার স্বামীকে লিখেছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বামীর সন্দেহ যদি না ঘোচে তা হলে কি করবে? সে তেজদীপ্ত সহজ উত্তর দিয়েছিল যে তার নিজের পথ সে বেছে নিয়ে চলবে। কী সে পথ, তার উত্তর সে দেয় নি। সাগর বেলায় যে ঢেউ ওঠে তা সহজে শান্ত হতে চায় না। বিশেষ করে সামাজিক যাঁরা তাঁরা যেখানে একটু অসামাজিক কিছুর ধোঁয়া কল্পনা করে নিতে পারেন তা নিয়ে মুখরোচক আলোচনা দিনের পর দিন চালিয়ে যাবার দিকে বিশেষ রুচি ও ঝোঁক দেখান। যা ঘৃণ্য নোংরা বলে প্রচার করেন কোথাও তার চিহ্ন মাত্র সম্ভাবনা অনুমান করতে পারলে মনে তাই নিয়ে তোলপাড় চলতে থাকে। যা ত্যাজ্য বলে জাহির করেন তাই নিয়ে দিনের পর দিন ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজেদের সেই রুদ্ধ প্রবৃত্তি, অপরের কাজের বিকৃত মুখরোচক সমালোচনার মাধ্যমে ও নিজেদের সাধু সাজিয়ে রেখে, যথাসম্ভব মিটিয়ে নেবার উৎসাহপূর্ণ আগ্রহে কোনও ত্রুটি দেখা যায় না। যে-নিষিদ্ধ সুখ বাস্তবে মেটানোর সাহস হয় না, মনের কল্পনায় ও মুখের কথায় তা মিটিয়ে নিতে চান। অর্ধমৃত বিকারগ্রস্ত সমাজে এই পঙ্কিল গতিই স্বাভাবিক। মাতাল মদ খায়, নিন্দুক তাই নিয়ে রসিয়ে শতবার ঢোক গেলে আর শতবার তাই নিয়ে নিন্দা ও সমালোচনা করে। সাধুভাব বজায় রেখে দূষ্য জিনিস ভোগ করবার এও এক পন্থা। অনেকে আন্দোলনে বা ব্যক্ত সমালোচনায় যোগ না দিয়ে নিজের মনেই এ সব রস রচনা করে যান। তাঁরাও একদিক থেকে দেখলে এই নিষিদ্ধ ভোগীর দলেরই মানুষ। বর্ণচোরাদের চেনা যায় না। ছেলেবেলায় বহুরূপীর বেশে ও যাত্রার দলে সাজপোষাকের আড়ালে আমাদের গ্রামের নিধু মড়লকে চিনতে পারতাম না।

অবস্থা চারিদিকে যখন বেশ ঘোরাল হয়ে এল একদিন সে আমায় বলেছিল "তুমি আমার, আমি আর কাউকে ভয় করি না"। বলেছিল যদি দরকার হয় সে নিজের পরিবার, স্বামীর পরিবার ত্যাগ করে, আমার সঙ্গে পথে বেরুবে। কথা দিয়েছিল আমি তার সঙ্গে চিরদিন থাকব; আমাদের ছাড়াছাড়ি কেউ করাতে পারবে না। ঢেউ যত প্রবল হ'ল, ঝড় যত বেগে বইল,

আমাদের বন্ধন ততই দৃঢ়তর হ'ল। লোকনিন্দার জ্বালা ভয় দুই-ই কেটে গেল। সে বলেছিল এই স্বল্প জীবনে ভালবাসার চেয়ে বড় সত্য, বড় মূল্য আর কিছু সে জানে না, মানে না। সে আমাকে ভালবাসে। এর জন্যে সে দুর্নাম অপযশ অখ্যাতি, এমন কি নিজের জীবনও দিতে পারে; দরকার হলে দেবেও। কথা বেশী বলে না, তার কাজে তার স্বভাবের সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ করে। তার দেহের রূপ স্বভাবের এই মধুর দৃঢ়তায় অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সে সত্যই রূপসী। তার এই বিশেষ রূপ আমাকে আকর্ষণ করে, ভাল লাগে; ভালবাসি। অনেক সুন্দরী দেখেছি, সকলেই দেখেছে; কিন্তু এক একটা রূপের কী যেন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যা এক এক জনকে এক বিশেষ টানে টেনে নেয়। মন তখন বলে চাই, আমি ওকে চাই। চায় তো সবাই; পায় ক'জন ভাগ্যবান! সারাজীবন ধরে সব মানুষ কত কিছুই তো চায়, পায় তার কতটুকু। তবু চায়; পেয়ে হাসে, না পেয়ে কাঁদে। এই হাসি-কান্না চলেছে দুনিয়ায়, এও চিরন্তন। পায় না, পাবে না জেনেও চায়। মানুষ শিশু, আকাশের চাঁদ-ধরবার জন্য হাত বাড়ানোর তার বিরাম নেই।

প্রায় দু'বছর এই করে কাটল। সন্ধ্যেবেলা সেদিন দুজনে ছবি দেখতে যাব। ক'দিন আগেই, তার অনেক দিনের ইচ্ছে যে-ছবিটা দেখার সেই ছবির টিকিট কেনা হয়েছে। সেদিন সময়ের কিছু আগে গাড়ী নিয়ে তার বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই, ছোকরা চাকরটা এসে বললে মায়ের শরীর খারাপ—বেরুতে পারবেন না। কি হয়েছে জানতে চাইলাম। চাকরটা বললে তা জানি না। দেখে আসব বলে গাড়ী থেকে নামতেই চাকরটা একটু যেন ব্যস্ত হয়েই বললে "না না এখন দেখা হবে না, আপনি যান—মায়ের অসুখ"; বলেই দরজাটা বন্ধ করে সে ভিতরে চলে গেল। আমাকে এই কথাগুলো বলবার জন্যেই সে ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আদেশ পালন করেই সে চলে গেল। আর আমি! ছবি দেখতে যাবার কথা—সকালেও সেই কথাই আবার পাকা হয়েছিল। আমি তার বাড়ীর দুয়ারে, তার অসুখ, আমার তাকে দেখতে যাওয়া হবে না, বাড়ীর দুয়ার বন্ধ হ'ল! কিছু না বুঝে একটা অপমান উপেক্ষার তীব্র গ্লানির সঙ্গে একটু শঙ্কা মিশ্রিত মন নিয়ে বাড়ী ফিরতে গিয়ে, একবার গড়ের মাঠে নেমে পড়লাম। কিছুক্ষণ যথেচ্ছ হেঁটে চললাম। ভাল লাগল না। মনে হ'ল গাড়ীটাকে ৬০ মাইল, ৮০ মাইল বা হাজার মাইল বেগে চালিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকি। তাতেও মনের বেগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া গেল না। বাড়ী ফিরে নিজের মধ্যে ডুবে বসে রইলাম। এত তাড়াতাড়ি বাড়ী-ফেরার কারণ জানতে বোন ঘরে ঢুকল। ভেবে রাখি নি কোনও কারণ। বলে দিলাম, শরীর ভাল লাগছে না—রাত্রে খাব না, যেন ডাকাডাকি না করে; বলেই শোবার জন্য বিছানার দিকে গেলাম। বোন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, অন্ধকার ঘরে। মনের ভেতরটাও যেন আরও বেশী অন্ধকার মনে হতে লাগল। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। অসুখ, দেখা করা হবে না। এমন তো হয় না। তবে? তাকে কি বাড়ীর লোক জবরদস্তি করে আটকে রেখেছে? কে তা পারে? তাকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তা হলে উপরের ঘর থেকে সে নিজেই চেঁচিয়ে সে-কথা বলত। কোনও সাড়া পাই নি। তবে! সম্ভব অসম্ভব নানা কথা সারারাত ধরে মাথায় ঘোরা-ফেরা করেছে। কোনও চিন্তাকেই সম্ভব বলে আঁকড়ে ধরতে পারি নি। বাড়ীতে রাতের সব কাজ সাঙ্গ হ'ল, যে যার বিশ্রাম করতে শয্যা নিয়েছে। বাড়ী নিস্তব্ধ, পাড়া নিঝুম হয়ে গেল—কলকাতার শহরটা

নিস্তেজ হয়ে এসে যেন ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। কেবল এক আমি অশান্ত চিত্তে বিছানায় শান্ত হবার চেষ্টা করছি। মন শান্ত হতে চায় না। বুঝতে চায়, জানতে চায়। তার কী হ'ল; হয়তো অনেক দুঃখ-কষ্ট ওরা তাকে দিচ্ছে। কোথাও তাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে কি? হতেও পারে। হয়তো তাকে বাইরে কোথাও নিয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে। আমাদের সম্বন্ধ জোর করে ভাঙ্গবে—হয়তো তাই হয়েছে ওদের শেষ সিদ্ধান্ত। পারবে না, কিছুতেই পারবে না তাকে আটকে রাখতে। আমি তাকে চিনি। সে আমার। তাকে ধরে রাখতে তোমরা পারবে না। ক্ষেপা ঘোড়ার মত মন ছুটে চলল—কী করে তাকে সাহায্য করে, উদ্ধার করে আনা যায়। পুলিশের সাহায্য নেব? কিন্তু তার আগে তাদের বাড়ী থেকে সত্য ঘটনাটা জানা দরকার নয় কি? এত রাত্রে ফোন করে খবর নেওয়া চলে না। রাত কাটে, সবারই কাটে, অঙ্কের নিয়মে ভুল হয় না। ভুল হয় আমাদের মনের হিসেবে। একই রাত্রি কারও কাছে মনে হয় বড় অল্প, কেউবা ভাবে বড় বেশী দীর্ঘ; কারও জীবনে সে-রাত্রি মধুর, কারও বা দুঃখের স্মৃতিতে ভরে থাকে। রাত উভয়েরই কাটে ঐ গণিতের নিয়মে, হয়তো বা সৃষ্টির নিয়মে, যে-সৃষ্টি নিয়মে বাঁধা। চারিদিকে সবই বাঁধা পড়ে আছে। বেরুবার পথ নেই। ভোরবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মন কেবলই তাড়া লাগাচ্ছে তার বাড়ীতে গিয়ে খবর নিয়ে আসি কেমন আছে। অসুস্থ, দেখা হবে না! কী এ সব কথা! হঠাৎ মনে হ'ল ওদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সে কি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। হতেও তো পারে। তাই হয়তো বাইরের জানাজানি রোধ করাতে আমার প্রবেশ-দুয়ার রুদ্ধ করা হয়েছে। হতেও পারে, হতে পারে; খুব সম্ভব তাই ঘটেছে। অস্থির হয়ে উঠল মন, খবর পেতেই হবে যেমন করেই হ'ক। অত ভোরে তার বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি সেই ছেলেটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে। ডাকলাম, উত্তর পেলাম না। ধাক্কা দিয়ে জাগাতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আবার সেই কথা, "মায়ের অসুখ, দেখা হবে না"। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। দেখা হবে না মানে! এও কি হুকুম! দেখা নিশ্চয় হবে—হতেই হবে। সকালবেলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হল্লা করা যায় না। ওদিকে আবার দুয়ার বন্ধ করে ছেলেটি সরে গেছে। ক্ষোভে, অপমানে, দুশ্চিন্তায় আমার তখন প্রায় বাস্তব-জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। তবু কিছু করবার পথ পাচ্ছি না। এক পুলিশ ছাড়া আর কেউ আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করবে না। কিন্তু পুলিশে আগেই কি খবর দেব? পথে পথে ঘুরে একটু বেলা করে বাড়ী ফিরেই তাকে টেলিফোন করলাম। তার গলারই উত্তর পেলাম। খবর জিজ্ঞাসা করতেই, কঠিন গলায় সে উত্তর দিল। তার তখন সময় নেই, যদি আমার কোনও দরকার থাকে তবে যেন তাকে বেলা ১১ টায় ফোন করি। বোকার মত বোবা হয়েই ফোন রেখে দিয়ে নিজের অস্থিরতার বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছি। ঘড়ির কাঁটা ঠিকই চলে। এগারটা বাজল। আবার ফোন করলাম। সেই কঠিন স্বর; এবার আরও কঠোর শোনাল। সে যা অনায়াসে বলে গেল তার সার কথা এই যে আমার মত শত্রু তার কেউ নেই। তার জীবনের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলাম আমি। এতদিন ধরে তার নানান সুখ-সুবিধার জন্যে আমি যা করেছি তার স্বরূপ সে আগে বুঝতে পারে নি। এখন সব বুঝেছে। সবই আমার ছলনার ফাঁদ। আমাকে সে বিশ্বাস করে না। আমি ভালবাসার খেলা খেলেছি আত্মতৃপ্তির জন্য। আমি শয়তান, আর যেন কোনওদিন তার

বাড়ী না যাই। সে আর আমার মুখ দেখতে চায় না। প্রায় আছাড় দিয়েই যেন টেলিফোনটা রাখল।

বুঝেছি কি বুঝি নি তা নিয়ে আর তর্ক করার কিছু নেই। যা শুনেছি তা মনে গাঁথা আছে। ভুলবার নয় বলেই ভুলি নি; হয়তো কোনও দিনই ভুলব না। না সে-কথা বলবার মত সাহস আর নেই। এ সব অনেক কথা সে বলেছে শুনেছি। মুছে গেছে সব। রয়ে গেল তার ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা। তামাম শোধ!

ঝড় উঠেছে। পাগল বাতাস মত্ত আবেগে একটা পাতাকে ঘুরপাক খাইয়ে, এলোমেলো তাড়িয়ে, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় নিয়ে ফেলবে কে জানে।...... ....

সেদিন তাকে দেখলাম স্বামীর হাত ধরে দেহ-সংলগ্ন হয়ে, দেহের রূপের সঙ্গে বেশের জৌলুস মিলিয়ে মেট্রো সিনেমায় ঢুকছে। দশজন তাকে তাকিয়ে দেখেছে। আমিও দেখেছি।

রামধনু

নবেন্দু কেশরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[মনের বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতি লেখক নিজের ভাষায় গাঁথিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। লেখকের নানান রসের, নানান বর্ণের সংক্ষিপ্ত এই লেখাগুলির "রামধনু" নামকরণ সার্থক হইয়াছে। মনের বহুল ভাবের পরিচয় এই লেখাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া ইহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হইতেছে।]

১৮০

সেদিন আমরা পথ চলিয়াছি দু'জনে
শতেক ভাবের ভাষা পেয়েছিল কুজনে।
আজিকে সে তুমি জাগিছ বিলাস শয়নে
তারালোকে আমি সাথী খুঁজে ফিরি বিজনে।

১৮১

বৈশাখের খর মধ্যাহ্ন তাপে
রুদ্র তাহার ধ্যানের মন্ত্র জপে।

১৮২

যাহা চাই কেনই বা তাহা চাই
নিজে তাই ভেবেই নাহি পাই।

১৮৩

কী যে চাই ভেবেই নাহি পাই
যত আছে কিছুই যেন নাই।

১৮৪

সুখের লগনে যত দীপ হ'ল জ্বালা
পূর্ণ গগনে গেঁথেছে তারার মালা।
দুঃখ শয়নে প্রদীপ শিখাটি জ্বলে
শুকতারা জাগে শূন্য-গগন তলে।

১৮৫

বৎসরের শেষ সন্ধ্যায়
শেষ কথা গেলে বলে
অমা রজনীর ক্ষীণ চাঁদ
ডুবিল অস্তাচলে।

১৮৬

নিজের দিকে যত মন দিই বাইরের জগৎ তত দূরে সরে যায়। বাইরের দিকে মন দিলে নিজ তখন বিশ্বের সঙ্গে মিলে যায়।

১৮৭

নিজেকে প্রধান রাখি তাই দেবতার বাস দূর স্বর্গে রচনা করি। দেবতাকে বড় বলে মানলে তাঁর আসন অন্তরে পাতা দেখতে পাই। আমিই তখন স্বর্গে বাস করি।

১৮৮

শক্তির সত্যরূপ দেখা দেয়
অসীম ক্ষমায়
দুর্বলের বন্ধ্যারোষ ভেঙ্গে চুরে
বিনাশ ঘনায়।

১৮৯

তুমি মোরে করিয়াছ হেলা
তাই কি বৈশাখী মেঘ
ঢাকিয়াছে গোধুলির বেলা।

১৯০

ওপারে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। এপারে আমি নির্জনে বসে আছি। মনে হয় ঘণ্টার ধ্বনি যেন দেউলের সীমা পার হয়ে কোন দিগন্তের পরপারে কার উদ্দেশে প্রণতি জানায়।

১৯১

বরণমালা হাতে লয়ে
দাঁড়িয়ে ছিলেম সামনে এসে
আঁধারের দুয়ার ঠেলে
ক্ষণিক আলোর নবীন বেশে

১৯২

লোভ অপরকে পর ক'রে দেয়; ক্রোধ, বিদ্বেষ মিত্রকে শত্রু করে; লোলুপতা মানুষকে পুজোর আসন থেকে ঘৃণার অতলে নামিয়ে আনে।

১৯৩

যা পেয়েছি তা রহিল সঞ্চয়
তাহাতেই তব পরিচয়।

১৯৪

পরাণে আমার রামধনু রং লাগে
বাহির বিশ্বে ফুল হয়ে তাই জাগে।

১৯৫

ভোরের বেলায় কি গান শোনায় কোন পাখী
শুধু পাশে ব'স সব কথা আজ থাক বাকি।

১৯৬

ইঙ্গিতের ভাষা যেখানে প্রকাশ পায়
আমাদের মুখের ভাষা সেখানে মূক হয়ে যায়।

১৯৭

সুখের সন্ধানে ফিরলে তার নাগাল পাওয়া যায় না। সে-চেষ্টা ছেড়ে সহজ হতে পারলে সুখ আপনি এসে ধরা দেয়।

১৯৮

অনেক জানি এই কথাটাই আমাদের ঘিরে থাকে; অজ্ঞানতাটা যে কত বড় তা দেখতে চাই না।

১৯৯

অহংকার নেই এই কথাটা বড় গলায় বলে নিজের অহংকারকেই প্রকাশ করি। নিজে না বুঝলেও অপরে তা বুঝতে পারে।

২০০

আমার মনের রং ছড়ালো ভুবনে
নিল তারে উষা ও গোধূলি লগনে।

২০১

এতদিনে বুঝেছি তুমি তোমার ওপারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়েছ, কথা বলেছ, আমার এপারের তুমি নও। দূরে থেকে কাছে থাকার সুর বাজিয়েছ। বাজুক তোমার সাপুড়ে বাঁশি, ছড়াও তোমার মোহন মায়া, ভোলাতে যদি পার জয় হবে তোমার। ওগো মায়াবিনী!

২০২

সেদিন তুমি ডেকেছিলে
সাজিয়ে বরণ ডালা
আজকে তুমি পরিয়ে দিলে
পরাজয়ের মালা;

২০৩

চলিতে পথে জুটেছে সাথী
বাঁধিতে চেয়েছি ঘর
পথের বাঁকে গেল সে চলে
রচি বিচ্ছেদ দুস্তর।

২০৪

ঘন কালো মেঘ ঘনায়ে এসেছে
বুঝি এখুনি নামিবে বরষা
মোর অন্তরে ফিরে পাব তারে
মনে জাগে এই ভরসা।

২০৫

গ্রীষ্মের তপ্ত ধরণীর শুষ্ক মৃত্তিকায় বসন্তের বর্ণলেখা খুঁজে কে পাবে ?

২০৬

ঝড়ের সন্ধ্যা
আকাশের ক্ষীণ আলোক
সে ভীষণকেই প্রকট করে তুলেছে।
যে দুর্বার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা
পৃথিবীকে ঘিরে এসেছে
সম্মুখ দীগন্তে চেয়ে তাই দেখছি।
জীবনের কোন সাড়া কোথাও নেই
এমন ক্ষণে তুমি এসে দাঁড়ালে
নীরবে আমার পাশে।
একবারের তরে তুমি চাহ নি আমার পানে
তবু দু'জনে বুঝেছি দু'জনের অন্তরের ভাষা।
তার পরে—
কখন ঝড় থেমে গেছে,
আকাশে দেখা দিয়েছে
এক ফালি চাঁদ !
তুমি একান্ত আশ্রয়ে
আমার বুকে তোমার মাথা রেখেছিলে।
তারও পরে—
কতদিন গেল, যুগ গেল
কত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেল
এই চির পুরাতন ধরণীতে।
কত বসন্ত এলো গেল
ঋতুর চক্র নিজ আবর্তে ঘুরে গেল।
নিশ্চল রয়ে গেল মিলনের সেই স্মৃতি।
সেদিনের মিলনের তুমি আর আমি
আজও আছি তুমি আর আমি
চিরকাল রব তুমি আর আমি
চিরন্তন সেই তুমি আর আমি।

২০৭

শেষ যে আছে জানি তা জানি
এড়িয়ে যাবার সাধ্য নাই।

বাস করেছি এই ধরাতে
এই জীবনের জয় গাই।

২০৮

তুমি একদিন দিয়েছিলে মালা
পরায়েছ রাজ সজ্জা
নিজ হাতে তারে ছিন্ন করিয়া
ঘুচায়েছ সব লজ্জা।

২০৯

সহযাত্রী পাশে ব'সে চলেছে তবু সে আমার কত অজানা। সাথে থেকেও সে দূরেই রয়ে গেল ; সাথী হতে পারল না।

২১০

মন আমার দশ দিকে ঘুরে বেড়ায় ; সোনার কাঠি ছুঁইয়ে একজনকে আপন করে নেবে বলে নিশ্চিন্তে বলতে চায় তোমাকে পেলাম—তুমি আমার। সে-চাওয়া মিটল কিনা তার উত্তর পাই না।

২১১

আমি অপরকে ভুল বুঝি ; অপরেও আমাকে ভুল বোঝে। এই জটপাকানো চলেছে সংসারে। এক পাক খুলতে গিয়ে আবার পাক সৃষ্টি হয়, জীবনের সূত্র যায় জড়িয়ে। এই ক'রে জীবনটাই যায় ফুরিয়ে।

২১২

ঘন কালো অন্ধকার ঘরটা ভ'রে ছিল ; আলো জ্বালাতেই, এত অন্ধকার পালাল কোথায়!

২১৩

গ্রীষ্মের গরমের শেষ বেলায় হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। মনের খুশীতে বাইরে বেরিয়ে ভিজে নিলাম। ফলে শরীর হ'ল বিকল। বাঁধন ছেঁড়ে না।

২১৪

প্রাত্যহিক জীবনের সংস্পর্শে আসা নরনারী আর গল্প উপন্যাস নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে মিলে মন আমার ঘুরে বেড়ায়। আমার আসল পরিচয়, আমি নিজেই জানি না।

২১৫

মনের বোঝা রেখে দিলাম
পথের ধুলার 'পরে।
সুরে রূপে ভুবন তখন
ফুটল থরে থরে॥

২১৬

তোমার খেলা শেষ হবে না
আমার আছে শেষ।

বীণায় তব বাজিবে সুর
　　রবে না মোর লেশ।

২১৭

অপরকে অপমান করাতে যে নিজেরই অপমান এ সহজ কথাটা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

২১৮

অন্যের কথা থেকে কথা সঞ্চয় ক'রে নিজের ডালি ভরে তুলি; নিজের কথা খুঁজে দেখবার অবসর পাই না।

২১৯

যার জীবনে পরশ পাথরের ছোঁয়া লাগল না সে ভাগ্যহীনের রিক্ততা পূর্ণ হবে কিসে!

ভুলিতে দিও তারে
　　ভুলায়ে দিও।
আপন গর্বটুকু
　　হারিয়া নিও।

টোটেম ও টাবু*

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

সর্বপ্রাণবাদ, ইন্দ্রজাল ও চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা

(১)

যাঁরা মানস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেন তাঁরা দুটো বিষয়ের কোনটার প্রতিই সুবিচার করতে পারেন না। এই ধরনের আলোচনায় এটা যেন একটা অপরিহার্য ত্রুটি। অতএব তাঁরা প্রেরণা যোগানোর কাজের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেন যাতে তিনি তাঁর গবেষণার মধ্যে ঐ ইঙ্গিতের বিষয় বিবেচনা করেন। সর্বপ্রাণবাদের বিরাট আলোচনায় প্রবৃত্ত এই প্রকারের একটি রচনার মধ্যে খুব প্রকটভাবেই এই ত্রুটির বিষয় ধরা পড়ে।[১]

সর্বপ্রাণবাদ (animism) সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে মানস প্রত্যয়ের মতবাদ, এবং উদার দৃষ্টিতে সাধারণতঃ ইহা আধ্যাত্মিক জীবকে বোঝায়। নিসর্গভীতি (animatism), আপাতদৃষ্টিতে নির্জীব বস্তুতে প্রাণবন্তার প্রয়োগ,—এই বিষয়ের একটি উপ-বিভাগ, যার মধ্যে নিসর্গভীতি ও সর্বপ্রাণবাদ উভয়ই বর্তমান। সর্বপ্রাণবাদ আগে একটি বিশেষ দার্শনিক মতের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'ত; মনে হয় পরে ঈ. বি. টাইলার-এর মারফৎ বর্তমান অর্থ পেয়েছে।[২]

কেন যে এরূপ নামকরণ হ'ল তা বুঝতে হলে একেবারে নিসর্গ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধারণার প্রতি এবং ঐতিহাসিক ও আমাদের সমসাময়িক জ্ঞান দিয়ে আমরা যে আদিম জাতিদের জেনেছি, তাদের জগতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এই জাতিরা মনে করে এই পৃথিবীতে অগণিত আধ্যাত্মিক জীব রয়েছে। এই জীবগুলির মধ্যে কতকগুলি তাদের কল্যাণকামী আর কতকগুলি তাদের অকল্যাণকামী। এবং এদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এই সব দেব-দানবগুলির দ্বারাই সাধিত হয়। তারা আরও মনে করে যে, শুধু প্রাণী আর উদ্ভিদ জগৎই নয় নিষ্প্রাণ বস্তুবর্গও ঐ আত্মা সকল কর্তৃক প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ আদিম জাতিদের "প্রকৃতি দর্শন"-এর তৃতীয় অংশটি, যেটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপুর্ণ, সেইটি আমাদের কাছে ততো আশ্চর্যজনক মনে হয় না, কারণ আমরা নিজেরাই এর প্রভাব থেকে বেশী দূরে যেতে পারি নি; যদিচ আমরা প্রেতাত্মার অস্তিত্বের ক্ষেত্রকে বহুল পরিমাণে সংকীর্ণ করে ফেলেছি

* অনুবাদ—ধনপতি বাগ, এম. এসসি. শ্রীনিকেতন।

১ এই ধরনের বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যবশতঃ বাধ্য হয়েই সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা দেওয়ার আশা ত্যাগ করতে হ'ল। তার পরিবর্তে হার্বার্ট স্পেন্সার, জে. জি. ফ্রেজার, এ. ল্যাঙ, ই. বি. টাইলর এবং ডবলু ভুণ্ড প্রণীত পুস্তকগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই পুস্তকগুলি হতেই আমি সর্বপ্রাণবাদ ও ইন্দ্রজাল বিষয়ের সমস্ত বিবরণ গ্রহণ করেছি, কেবল বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেই আমি আমার স্বাধীনতা অবলম্বন করেছি।

২ E. B. Tylor. *Primitive Culture*, Vol. I, p. 425, fourth edition, 1903. W. Wundt. *Myth and Religion*, Vol. II, p. 173, 1906.

এবং আজকাল নৈর্বক্তিক পদার্থবিদ্যার শক্তির প্রয়োগে প্রাকৃতিক সংঘঠনগুলির ব্যাখ্যা করছি। আদিম অধিবাসীরা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও "প্রাণবন্তুতার" (animation) কথা বিশ্বাস করে। মানুষের আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা তার বর্তমান আশ্রয় পরিত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে ; এই আত্মা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের বাহক এবং খানিকটা দেহ-নিরপেক্ষও বটে। আদিতে আত্মা ও ব্যক্তিকে প্রায় একই গোত্রীয় বলে মনে করা হ'ত ; কিন্তু ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে আত্মা তার পার্থিব প্রকৃতিকে হারিয়ে "আধ্যাত্মিকতা"র (spiritualization) উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।[৩]

আত্মাবাদই যে সর্বপ্রাণবাদের আদি কারণ, প্রায় সব গ্রন্থকারই এই মত বিশ্বাস করতে পছন্দ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, যে-আত্মা স্বাধীন হয়েছে প্রেতাত্মা হচ্ছে তারই অনুরূপ। এবং মানুষের আত্মা যেভাবে গড়ে উঠেছে সেই ভাবেই জন্তুর, উদ্ভিদের ও বস্তুর আত্মা গড়ে উঠেছে।

আদিবাসীরা কি করে সর্বপ্রাণবাদের মূল এই অদ্ভুত দ্বৈতবাদী মৌলিক মতবাদে এসে পৌঁছল ? নিদ্রা ও তার সঙ্গে স্বপ্ন, এবং নিদ্রারই অনুরূপ মৃত্যুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং এই অবস্থাগুলির—যা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এত গভীরভাবে প্রভাবিত করে—ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। সর্বোপরি মৃত্যু সমস্যাই মনে হয় এই মতবাদ সৃষ্টির আদি কারণ। আদিম মানবের কাছে জীবনের ধারাবাহিকতা—অবিনশ্বরতা—স্বতঃসিদ্ধ। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে পরে, এবং তাও অনেক দ্বিধার সঙ্গে। সেটা অকারণ নয়, এমন কি আমাদের কাছেও এখনও পর্যন্ত ইহা সারহীন এবং উপলব্ধি বহির্ভূত। খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুর সেই সব অংশগুলিই আলোচিত হয়েছে যেগুলি স্বপ্ন, প্রতিরূপ-সমষ্টি, ছায়া, প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সর্বপ্রাণবাদের মূল ধারণাগুলিকে পুষ্ট করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই সব আলোচনা কোনও উপসংহারে পৌঁছতে পারে নি।[৪]

যদি আদিম মানব তার আত্মা সম্বন্ধে ধারণাকে মূর্ত করতে গিয়ে যে-সব ঘটনা তার চিন্তাকে উত্তেজিত করেছে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, এবং তারপর ঐ সবের ফলাফল বহির্জগতের বস্তুর উপর চালিত করে তা হলে তার মনোভাবকে স্বাভাবিকই বলতে হয় ; এবং কোনও ক্রমেই একে রহস্যময় বলা যায় না। যেহেতু সর্বপ্রাণবাদের ধারণা সব সময়ে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই রকম হতে পারে বলে দেখানো হয়েছে, সেই সূত্রে ভুণ্ড বলেন যে, এগুলি "অতিকথা-সংগঠনী সচেতনতার" (myth-forming consciousness) আবশ্যিক মানস বিষয়বস্তু ; এবং আদি সর্বপ্রাণবাদকে যতদূর পর্যন্ত আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত করতে পারি ততদূর পর্যন্ত একে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে।"[৫] হিউম (Hume) পূর্বেই তাঁর **Natural History of Religion** নামক পুস্তকে নির্জীবের প্রতি জীবনের আরোপের কথা প্রতিপন্ন করেছেন। এই পুস্তকে তিনি বলেছেন : "মানুষ অন্য সব বস্তুকে তাদের নিজেদের মত মনে করে এবং তারা নিজেরা

৩ Wundt, *l. c.* Chapter IV : *Die Seelenvorstellungen.*

৪ ভুণ্ড ও এচ্. স্পেন্সার এবং *Encyclopaedia Britannica* 1911-তে শিক্ষণীয় প্রবন্ধগুলির সঙ্গে (Animism, Mythology, aud so forth), তুলনীয়।

৫ *l. c.* p. 154.

যে-সব গুণাগুণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং যেগুলি সম্বন্ধে তারা বিশেষভাবে সজাগ সেইগুলি প্রত্যেক বস্তুতেই আরোপ করে থাকে—মানুষের এই মনোভাবটা বিশ্বজনীন।"[৬]

সর্বপ্রাণবাদ একটি চিন্তাধারা। ইহা যে কেবল একটিমাত্র বিষয়েরই ব্যাখ্যা দিতে পারে তা নয়। এই চিন্তাধারা, এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে, নিরবচ্ছিন্নরূপে দেখতে সাহায্য করেছে। লেখকগণ মনে করেন কালক্রমে এরূপ তিনটি চিন্তাধারা, তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছিল। সেইগুলি হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ (পৌরাণিক), ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক। এগুলির মধ্যে সর্ব-প্রাণবাদই প্রথম। ইহাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ। এবং একমাত্র ইহাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারে। মানুষের এই সর্বপ্রথম জগৎজোড়া ব্যবস্থাটি এখন মনোবিদ্যার একটি সিদ্ধান্ত। এই মতবাদ আমাদের ক্ষেত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে আজকের দিনের জীবনেও ইহার প্রভাব কতদূর প্রতিপন্ন করা যায়। দেখা যাবে ইহার অকিঞ্চিৎকর উদ্‌বর্তন (survival) রয়েছে আমাদের কুসংস্কারের মধ্যে, কিংবা সজীব আকারে বর্তমান আমাদের ভাষার ভিত্তিরূপে, আমাদের অন্ধবিশ্বাসরূপে ও আমাদের দর্শনশাস্ত্রে।

এই তিনটি বিশ্ব-চিন্তাধারার পরপর স্তরগুলির সূত্র ধরেই আমরা বলি যে, সর্বপ্রাণ নিজে ধর্ম হিসাবে গড়ে ওঠে নি; কিন্তু তখন তার মধ্যে এমন অনেক আবশ্যকীয় উপাদান ছিল যা থেকে পরে ধর্মমত গড়ে উঠেছে। পুরাণ বা অতিকথা যে সর্বপ্রাণবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পুরাণ ও সর্বপ্রাণবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমন অনেক বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা আজও হয় নি বলেই মনে হয়।

(২)

আমাদের মনঃসমীক্ষণের কাজ শুরু হবে ভিন্ন দিক থেকে। মানুষ যে কেবল জ্ঞানতৃষ্ণা বশতঃ তার চিন্তার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বচিন্তার শুরু করেছে সেরূপ ধরে নেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীকে বশে রাখবার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে কাজ করেছে। তা হলে, এই সর্বপ্রাণবাদের পাশাপাশি অন্য কোনও একটা কিছু কাজ করছে এ কথা শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষের, পশুর, বস্তুর, এমন কি প্রেতাত্মার উপর প্রভুত্ব করার বাসনায় নিজস্ব শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এস্‌. রেইনাক্‌ (S. Reinach)[৭] এই পদ্ধতিগুলিকে—যেগুলি জাদু ও ইন্দ্রজাল নামে প্রচলিত—সর্বপ্রাণবাদের রণকৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। ম-অস্‌ (Mauss) ও হিউবার্ট (Hubert)-এর সঙ্গে আমিও এইগুলিকে টেকনিক বা বিশেষ কৌশলের সঙ্গে তুলনা করার পক্ষপাতি।[৮]

জাদু ও ইন্দ্রজাল (sorcery and magic) এই দুটি ধারণাকে কি পৃথক করা যায়? হ্যাঁ, করা যায়; যদি অবশ্য আমরা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহারের খামখেয়ালীর উপর নির্ভর না করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগে ইচ্ছুক হই। মানুষের প্রতি ব্যবহারের মতই প্রেতাত্মাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন

৬ Tylor, *Primitive Culture.* Vol. I, p. 477, দেখুন।

৭ *Cultes, Mythes et Religions*, T. II. *Introduction*, p. XV, 1909.

৮ *Anneé Sociologique*, Seventh Vol. 1904.

ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত করার কলাকৌশলই হচ্ছে আসলে জাদুবিদ্যা (sorcery)। অর্থাৎ, তাদের খোশামোদ করে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, দরকার মত কারও প্রতি তাদের মেজাজকে খুশী করিয়ে, অনেক সময় তাদের শাসনের ভয় দেখিয়ে কিংবা অন্য কারও ইচ্ছার বশবর্তী করিয়ে, যেমন করেই হ'ক তাদের প্রভাবিত করা। মানুষের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে থাকে সেই সমস্ত প্রক্রিয়াই এ ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

ম্যাজিক কিন্তু অন্য জিনিস। ম্যাজিক মূলতঃ প্রেতাত্মাদির ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নয়; এবং এ ক্ষেত্রে সাধারণ মনোবিদ্যার পদ্ধতির ব্যবহারের বদলে বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে ম্যাজিক যে আরও পুরনো এবং ইহা যে সর্বপ্রাণবাদের একটি প্রয়োজনীয় অংশ তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, যে-সমস্ত প্রক্রিয়া প্রেতাত্মাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলি ম্যাজিকের মধ্যেও দেখা যায়[৯]। এবং যেখানে প্রকৃতির প্রেতাত্মীকরণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি এমন সব জায়গায় এখনও ম্যাজিক প্রযুক্ত হয়ে থাকে বলেই আমাদের মনে হয়।

ম্যাজিককে হরেক রকমের উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। ইহা প্রাকৃতিক কার্য-প্রক্রিয়াকে মানুষের ইচ্ছার বশবর্তী করবে, ব্যক্তিকে তার শত্রু ও বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং ঐ ব্যক্তিকে তার শত্রু নিধনের জন্য শক্তি যোগাবে। কিন্তু যে-সব মূল নীতির উপর ম্যাজিক প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ম্যাজিকের যেগুলি মূল নীতি তা এতই স্পষ্ট যে, তাহা সকল গ্রন্থকারই বুঝেছিলেন। আমরা যদি ঈ. বি. টাইলরের মতামতের প্রকাশ্য অর্থ টাই করি তা হলে খুব সংক্ষেপে কয়েকটিমাত্র কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে: "একটি কাল্পনিক যোগসূত্রকে আসল বলে ভুল করা"। এই বৈশিষ্ট্যটি আমরা ম্যাজিকের ক্রিয়াকাণ্ডের দুইটি বিভাগের মধ্যে বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করব।

শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্য ম্যাজিকের একটি খুব প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে যে-কোনও বস্তু দিয়ে ঐ শত্রুর একটি প্রতিকৃতি তৈরি করা। মূর্তির সাদৃশ্য নিয়ে কিছু যায় আসে না, আসলে যে-কোনও বস্তুকেই তার মূর্তি বলে 'নামকরণ' করলেই হ'ল। এই প্রতিমূর্তির প্রতি পরে যেরূপ ব্যবহার করা হবে ঠিক সেই রকমটিই ঐ ঘৃণিত শত্রুর ক্ষেত্রে ফলবে। যেমন, যদি প্রতিকৃতিটির কোনও অঙ্গহানি করা হয় তা হলে কোনও অসুখের দ্বারা শত্রুর শরীরের অনুরূপ অংশটিই আক্রান্ত হবে। ম্যাজিকের এই কলাকৌশল শুধু ব্যক্তিগত শত্রুর বিরুদ্ধেই কাজ করে না; সৎ-উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন দুষ্ট দানবদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দেবতাদের সাহায্য করার কাজে লাগানো যেতে পারে। আমি ফ্রেজারের পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি[১০]: "প্রাচীন মিসরে সূর্যদেব রা (Ra) দিনের শেষে রক্তিম পশ্চিমাকাশে তাঁর নিজের আবাসে ফিরে যাবার পর শয়তান আপেপির (Apepi) নেতৃত্বে একদল দুষ্ট দানব দ্বারা আক্রান্ত হন। সারা রাত্রি তিনি ঐ দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং এক এক সময় দিনমানেও অন্ধকার রাজ্যের দুর্বৃত্তেরা মিসরের নীল আকাশের মধ্যে মেঘ পাঠিয়ে দিয়ে সূর্যদেবের শক্তি ও আলোক ম্লান করে দিত। দৈনন্দিনের এই যুদ্ধে সূর্যদেবকে সাহায্য করার জন্য থেবিসে (Thebes) তাঁর মন্দিরে প্রত্যেক দিন পূজা করা হ'ত। কুৎসিত মুখবিশিষ্ট একটি কুমীরের আকারে, কিংবা বহু

৯ গোলমাল ও চীৎকার করে ভূত তাড়ানোটা জাদুবিদ্যার একটি রূপ। আর ভূতের নাম নিয়ে তাকে কোনও কিছু করতে বাধ্য করানোটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ম্যাজিকের প্রয়োগ।

১০ *The Magic Art*, II, p. 67

কুণ্ডলাকৃতি একটি সাপের আকারে সূর্যদেবের শত্রু আপেপির একটি ব্যঙ্গ প্রতিকৃতি মোম দিয়ে তৈরি করা হ'ত ; এবং এইটির উপর সবুজ কালি দিয়ে ঐ দানবটির নাম লিখে দেওয়া হ'ত। এক প্রকার ঘাসের তৈরী (papyrus) বাক্সে এটিকে মুড়ে তার উপর আবার আপেপির একটি অনুরূপ মূর্তি সবুজ কালি দিয়ে আঁকা হ'ত। তারপর ঐ মূর্তিটিকে আবার কাল চুল দিয়ে বেঁধে তার উপরে থুতু ফেলা হ'ত এবং একটি পাথরের ছুরি দিয়ে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হ'ত। তারপর সেখানে পুরোহিত তাঁর বাঁ-পা দিয়ে সেটার উপর বার বার করে লাথি মারতেন এবং সব শেষে এক প্রকার ঘাসের আগুনে তাকে দগ্ধ করা হ'ত। এইভাবে আপেপির ব্যঙ্গ মূর্তি নিঃশেষে দগ্ধ হবার পর, তার প্রধান প্রধান সহকারী দানবগুলির একটি করে মোমের মূর্তি গড়ে তার সঙ্গে তাদের মাতা, পিতা ও সন্তানদের নকল মূর্তি একসঙ্গে করে আগের মতই দগ্ধ করা হ'ত। কতকগুলি নির্বাচিত মন্ত্র পাঠ করে এই সঙ্গে প্রার্থনা চলত। এই প্রার্থনা শুধু সকাল দুপুর ও রাত্রিব্যাপী চলত না ; যখনই ঝড় উঠত বা ভারী বৃষ্টি নামত কিংবা সূর্যের জ্যোতির্ময় চক্রটি ঢাকবার জন্য আকাশের এপার ওপার মেঘের লুকোচুরি চলত তখনই ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত। অন্ধকারের, মেঘের ও বৃষ্টির শয়তানগুলি তাদের প্রতিকৃতির উপর নিক্ষিপ্ত আঘাতকে এমন ভাবে অনুভব করত যাতে মনে হ'ত যেন তাদেরই শরীরের উপর ঐ আঘাত হানা হয়েছে। তারা সরে যেত, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, এবং তখন আবার কল্যাণময় সূর্যদেব হাসিমুখে তাঁর কিরণ বিকীরণ করতেন।"[১১]

এমন রাশি রাশি ম্যাজিকের ক্রিয়াকলাপ আছে যে-গুলি একই প্রকার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমি এখানে বিশেষ করে মাত্র দুটির কথা উল্লেখ করব। এই দুটি আদিম জাতিদের জীবনে সব সময়ই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে এবং ক্রমোন্নতির উচ্চস্তরে পুরাণ ও ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আংশিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন, ম্যাজিকের দ্বারা বৃষ্টি ও উর্বরতা বৃদ্ধির কলা-কৌশল। ম্যাজিকের সাহায্যে বৃষ্টি তৈরি করা হয় বৃষ্টির নকল করে ; এবং সম্ভবতঃ যে মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি আনে তাদের নকল করে। দেখে মনে হয় যেন তারা "বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা" করতে চায়। যেমন, জাপানের আইনো-রা (Ainos) মস্তবড় একটা ছাঁকনিতে জল ঢেলে বৃষ্টি তৈরি করে। কেউ কেউ আবার মস্ত বড় একটা পাত্রে পাল ও দাঁড় লাগিয়ে এমনি করে যে, দেখে মনে হয় যেন একটা জাহাজ। সেইটিকে তখন গ্রাম ও বাগানের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জমির উর্বরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার ম্যাজিক কৌশল হচ্ছে জমিকে মানুষের রতিক্রিয়া প্রদর্শন। এমন বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করছি। জাভা দ্বীপের কোনও এক অংশে যখন ধানগাছগুলির ফুল ফোটার সময় হ'ত, তখন চাষীরা রাত্রে মাঠের মধ্যে স্ত্রীসম্ভোগের জন্য যেত। উদ্দেশ্য, তাদের দৃষ্টান্ত দেখে ধানগাছগুলিও ফলবতী হবে।[১২] এইসঙ্গে অবশ্য এ-ভয়ও ছিল যে, নিষিদ্ধ অনাচার ক্রিয়া ঘটলে আগাছার জন্ম হবে এবং ধানগাছ নিষ্ফল হবে।[১৩]

১১ কোনও কিছু জীবিত জিনিসের প্রতিমূর্তি গঠনের বিরুদ্ধে বাইবেলের অনুশাসন যে মূর্তি গঠনের মূল নীতিকে বর্জন করার জন্য বলেছিল তা মনে হয় না। পরন্তু মনে হয় ম্যাজিক, যা হিব্রু-ধর্মে নিষিদ্ধ, সেই ম্যাজিককে তার একটি অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। Frazer, *l. c.*, p. 87· note.

১২ *The Magic Art*, II., p. 98

১৩ এই ধরনেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে Sophocles-এর *Oedipus Rex* পুস্তকে।

উপরোক্ত প্রথম বিভাগের সঙ্গে কয়েকটি নিষেধাত্মক নিয়ম অর্থাৎ ম্যাজিকের কয়েকটি সতর্কতাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি দেয়াক্ (Dayak) গ্রামের কয়েকজন অধিবাসী বুনো শুয়োর শিকারের জন্য যাত্রা করে থাকে, তা হলে যারা গ্রামে থাকল তারা ইতিমধ্যে তেল বা জল কোনটাই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে না ; যদি করে, তা হলে শিকারীদের আঙুল নরম হয়ে যাবে এবং তাদের হাত ফসকিয়ে শিকার পালিয়ে যাবে।[১৪] কিংবা যখন কোনও গিল্যাক (Gilyak) শিকারী বনের মধ্যে শিকারের অনুসরণ করে চলেছে তখন তার ছেলেরা কোনও কাঠের উপর কিংবা বালির উপর কোনও ড্রইং করবে না। কেন না, তা হলে ঘন জঙ্গলের মধ্যের রাস্তাগুলো ড্রইং-এর রেখার মত গোলমেলে হয়ে যেতে পারে এবং উক্ত শিকারী তার বাড়ী ফেরার পথ খুঁজে না পেতে পারে।[১৫]

এই সমস্ত এবং ম্যাজিকের শক্তি সম্বন্ধে আরও রাশীকৃত দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখা যায় যে, এখানে দূরত্বের কোনও ভূমিকাই নেই। এইসঙ্গে অবশ্য টেলিপ্যাথির দৃষ্টান্ত এসেই পড়ে ; এই থেকে ম্যাজিকের বৈশিষ্ট্য বুঝতে কোনও কষ্ট হবে না।

এই সব উদাহরণের মধ্যে যে একটা কার্যকর শক্তি আছে সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মানুষে যা করছে এবং যা সে আশা করছে এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। এইজন্য ফ্রেজার সাহেব এইরূপ ম্যাজিকের নাম দিয়েছেন অনুকরণপ্রিয় বা হোমিওপ্যাথিক। যদি আমি বৃষ্টি চাই তা হলে আমার যা করা দরকার তা হচ্ছে, আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা বৃষ্টির মত দেখতে হবে বা বৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আমাদের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরবর্তীকালে এই ম্যাজিকের জাদুমন্ত্র প্রয়োগের বদলে দেবতার মন্দিরে শোভাযাত্রার প্রচলন হয়েছে। যাতে ঐ দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং বারিবর্ষণ করেন। আরও পরে এই ধর্মপ্রক্রিয়া ত্যাজ্য হবে এবং তার পরিরর্তে অনুসন্ধান চলবে কি করে বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে বৃষ্টি ঘটানো যায়।

ম্যাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের আর একটি বিভাগে এই সাদৃশ্যের নীতি অনুসৃত হয় না ; কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য আর একটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেইটির প্রকৃতি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট হবে।

ম্যাজিকে আর একটি পন্থা ব্যবহৃত হয়ে থাকে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য। এজন্য তুমি শত্রুর চুল, নখ, কিংবা সে ফেলে দিয়েছে এমন যে কোনও জিনিস, এমন কি তার পোশাকের যে কোনও অংশ সংগ্রহ কর এবং সেইগুলির উপর অনিষ্টকর কোনও কিছু কর। ঐ লোকটিকে সশরীরে তোমার আয়ত্তাধীনে পেলে তোমার ঐ কাজটি যেমন কার্যকর হ'ত, এই প্রক্রিয়াতে ঠিক তেমনই কাজ হবে এবং ঐ ব্যক্তিটির অধিকৃত যে কোনও জিনিসের উপর তুমি যেমন ব্যবহার করবে ঐ লোকটির কপালে ঠিক সেইরূপটিই ঘটবে। আদিম জাতির লোকেদের কাছে নাম হচ্ছে অস্মিতার একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব যদি তুমি কোনও ব্যক্তির বা কোনও প্রেতাত্মার নামটি জানতে পার তা হলে তুমি ঐ নামের মালিকের উপর খানিকটা জোর খাটাতে পারবে। এই থেকে নামের ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সাবধানতা ও সংযমের তাৎপর্য বেশ পরিস্ফুট হয়। এই বিষয় আমরা টাবু-প্রবন্ধের মধ্যে আগেই উল্লেখ করেছি।[১৬] এই দৃষ্টান্তগুলিতে সাদৃশ্যের বদলে সম্পর্ক বা সম্বন্ধের প্রকাশ খুবই সুস্পষ্ট। (ক্রমশঃ)

---

১৪ *The Magic Art*, II, p. 120

১৫ *l. c*, p. 122

১৬ পূর্বোল্লিখিত 'টাবু' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

স্বাধীনতার ষোল বৎসর পরেও মানসিক রোগীর চিকিৎসা সমস্যা

কথায় বলে 'দুঃখের রাত্রি পোহাইতে চায় না'। লুম্বিনি সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া এই প্রচলিত কথাটাই বারে বারে মনে হইতেছে। পঁচিশ বৎসর একটা প্রতিষ্ঠানের জীবনে সামান্য মাত্র সময় নহে। সময় সময় আমাদের নিজেদের জীবনের দিকে তাকাইয়া মনে হইয়াছে অতি দীর্ঘ কাল, এমন কি একটা জীবনই যেন কাটিয়া গেল। তবু যে সকল সমস্যা লইয়া লুম্বিনির জন্ম আজও সেই সমস্তই রহিয়া গিয়াছে; কোনও কোনটা বরং পুর্বের অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। লুম্বিনি ছোট ছিল, বড় হইয়াছে। ক্রমে আরও হয়তো বড় হইবে। কিন্তু প্রয়োজন যত বড়ই হউক, সমস্যা যদি আদি হইতে সম পরিমানেই চলিতে থাকে তবে এই বাঁচিবার জন্য লড়াই করিয়াই দিন শেষ হইবে। চিকিৎসার উন্নতি যাহা আমাদের দ্বারা সম্ভব তাহাও কার্যে করা যাইবে না। এতদিনের পরেও দেখিতেছি অর্থাভাবের গ্লানি; সেইজন্য নানান অসুবিধা ও জটিলতা ভোগ করিয়া চলিতেছি। সমস্যা কমিল না; পুরাতন ও প্রাথমিক কর্মীদের আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছে। তাহা আসুক। নূতন কর্মী কার্যভার গ্রহণ করিবেন, সংসারের ইহাই নিয়ম। সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে—ইহাই মানুষের স্বাভাবিক চেষ্টা।

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর বাজারদর যে পরিমানে বাড়িয়াছে ও তাহার ফলে রোগীদের জন্য যে টাকা প্রতিমাসে ব্যয় করিতে হয় সেই মোট টাকা যদি রোগীর অভিভাবকদের নিকট হইতে মাত্র আদায় করিয়া হাসপাতাল রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক অভিভাবকের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকা লইতে হয় সেই অর্থ ব্যয় করিবার মত সামর্থ্য কতজন মানুষের আছে? কর্মীদের অতি সামান্য বেতন দিয়াও রোগী প্রতি কমপক্ষে মাসে ২০০৲ টাকার প্রয়োজন হয়। কর্মীদের উপযুক্ত বেতন দিলে এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন একটু ভালভাবে মিটাইয়া হাসপাতাল চালাইতে গেলে রোগী প্রতি প্রায় ২৭৫৲—৩০০৲ মাসে খরচ করিতে হয়। এই ব্যয় কতজন নিয়মিত ভাবে ছয় মাস হইতে বৎসরাধিককাল চালাইয়া যাইতে পারেন? আর্থিক অনটন সমভাবে সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে। তাহার উপর মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসে ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করিয়া রোগের চিকিৎসা কতজন করিতে পারিবেন? পরিবারে মানসিক রোগী একটি থাকিলে, অন্য কোনও রোগ পরিবারের অন্য কাহারও হইবে না এমনও নহে। সেই সকল রোগের খরচও বহন করিতে হয়। সমস্ত মিলিয়া অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে উপযুক্ত চিকিৎসা করানো অসাধ্য হইয়া উঠে। এই লেখার শেষাংশে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে ১৯৬৩ সনের শেষ তিনমাসে মোট ১০০ জন রোগী এই হাসপাতালে ভরতি হইয়াছে; কিন্তু মোট ১১৭ জন রোগী ঐ সময়ের মধ্যে হাসপাতাল হইতে নির্গত হইয়াছে। ফলে ১৭ জন রোগী মোট সংখ্যা হইতে কম আছে। ইহার একটি কারণ আর্থিক সমস্যা ও অপর কারণ

অনিশ্চয়তা বোধ। কখন অবস্থা কিরূপ হইবে দেশের মানুষ সে-সম্বন্ধে কোনও নিরাপত্তা-বোধ করিতে পারিতেছে না। আরও একটি কারণ কলিকাতায় ও নিকটবর্তী এলাকায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটির খবর যাহা শুনি তাহা সত্য হইলে তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ আছে। অবশ্য রোগীর নিকট হইতে বা জনসাধারণের নিকট হইতে শোনা সকল কথাই সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সেই সকল স্থানে যে-ব্যবস্থায় রোগী রাখিয়া অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব লওয়া হয়, লুম্বিনির পক্ষে সেই ব্যবস্থায় চলা সম্ভব নহে। কোনও ব্যবস্থা না থাকার চাইতে সামান্য ব্যবস্থা থাকাও মন্দের ভাল। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে মানসিক রোগীদের রাখিয়া অন্ততঃ পরিবারের অনেক সমস্যার সাময়িক সুসমাধান সম্ভব হইতেছে। চিকিৎসাও কিছু নিশ্চয়ই হয় আমরা মনে করি। সে-বিষয়ে আলোচনা এখানে করিব না। আমাদের যে-আর্থিক সমস্যার কথা বলিতেছিলাম তাহার প্রতিকারের কোনও পথ আজও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। একমাত্র দেশের রাষ্ট্রশক্তির উপযুক্ত সহায়তা ভিন্ন এই জাতীয় হাসপাতাল সুষ্টুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আমরা রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সময় সময় যে সামান্য সাহায্য পাইয়াছি তাহা যথা সময় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সে-সাহায্য এতই সামান্য ও এতই সাময়িক যে তাহা দ্বারা সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। আমরা কয়েক বৎসর হইতেই এই হাসপাতাল পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট উপযুক্ত পরিমান বাৎসরিক সাহায্যের আবেদন করিয়া আসিতেছি। গত ১৯৬৩ সালেও বৎসরে একলক্ষ টাকা দিবার জন্য পঃ বঃ সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। আজও সে-বিষয়ের কোনও সিদ্ধান্ত আমরা জানিতে পারি নাই। আমরা পুর্বে বলিয়াছি সরকার এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীল আছেন। কিন্তু তবুও কেন আমরা উপযুক্ত টাকা পাইতেছি না তাহা জানি না। অন্যান্য নানান প্রতিষ্ঠানে সরকার বড় অঙ্কের টাকা সাহায্য দিতেছেন। লুম্বিনি আজও সে-সাহায্য পায় নাই। আমরা আশা করি সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উপযুক্ত ভাবে সমাজের সেবা করিবার সুযোগ দিবেন।

আমাদের বারে বারে আরও একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। লুম্বিনির সূচনাতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনাহারক্লিষ্ট, বর্মা হইতে আগত বাস্তুহারাদের মধ্যে বহু মানসিক রোগী দেখা দিয়াছিল। একে বাস্তুহারা, তাহার উপর কঠিন রোগের চিকিৎসার গুরু ব্যয় ইহাদের পক্ষে বহন করা অসাধ্য ছিল। লুম্বিনি তখন যথাসাধ্য কম ব্যয়ে, এমন কি মাসে ২টি রোগীকে বিনা-ব্যয়ে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার ভার লইয়াছিল। তখনকার সময়ের ছোট একটি ৪।৫-শয্যার হাসপাতালের পক্ষে ইহা সংখ্যায় সামান্য হইলেও কম নহে। তাহার পর দেশ-বিভাগের পর আবার যে আগুণ জ্বলিয়াছে আজও তাহার তাণ্ডব মিটিল না। পুর্ব বঙ্গে অর্থাৎ পুর্ব পাকিস্থানে বারে বারে যে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলিয়া আসিতেছে তাহার ফলে বহু সুস্থ মানুষেরও মানসিক রোগ দেখা দিতেছে। কলিকাতায় বা পশ্চিম বঙ্গে নিশ্চিন্তে বসিয়া আমরা সেই সমস্ত অমানুষিক অত্যাচারের কল্পনাও করিতে পারি না। এইরূপ বহু রোগী চিকিৎসার জন্য লুম্বিনিতে আসিয়াছেন। তাহাদের নিজেদের নিকট হইতে, তাহাদের সঙ্গী ও পরিবারের অন্যান্য লোকের নিকট হইতে যে সকল ঘটনা শুনিয়াছি তাহা বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমরা এই পত্রিকায় নানান প্রবন্ধে ইহাই

দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক মানুষের সহ্য করিবার একটা সীমা আছে। সেই সীমা প্রত্যেকের পক্ষে এক নহে। যাহার মনের সহ্য করিবার যে-সীমা আছে কোনও অবস্থায় সেই সীমা পার হইলে মানুষ আর স্বাভাবিক থাকিতে পারে না। মনের বিশেষ গঠনানুসারে নানান রকমের মানসিক বিকার দেখা দেয়। এই কারণেই যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা অতিশয় শোক ইত্যাদি অবস্থায় সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক বিকার দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের ভাগ্যে এই রকমের বর্বর নৃশংস অত্যাচার, হত্যা ও সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী নানান কুৎসিত প্রকারের নারী ধর্ষণে পীড়িত মানুষের দুঃখের কাহিনী শোনা বহুবার হইয়াছে; এখনও হইতেছে। ইহার ফলে কত সুস্থ সুন্দর জীবন নানানভাবে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার সামান্য কিছু অংশ লুম্বিনিতে চিকিৎসার জন্য আসে। আমরা সাধ্যমত তাহাদের আবার সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই প্রকারের শত শত নিগৃহীত মানুষের মানসিক অসুস্থতার কতটুকুই বা আমরা চিকিৎসাধীনে আনিয়া আবার সুস্থ করিয়া তুলিতে পারি। চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ না হওয়ার ব্যবস্থা করাই উচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। আমাদের সমাজ-জীবনের এই দূষিত ব্রণ কবে যে সমূলে বিদূরিত হইবে কে জানে। সাময়িক ঔষধে রোগ চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু রোগমুক্ত হওয়া যায় না। সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ভার বিশেষ করিয়া সমাজের নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের উপর ন্যস্ত থাকিলেও, প্রত্যেক মানুষেরই এই সম্বন্ধে কিছু না কিছু করণীয় আছে। নেতা বা নায়কগণ যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্তরে করেন সেজন্য তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাধ্য করিবার দায়িত্ব জনসাধারণের নিজেদের হাতেই আছে। আমরা সুস্থ মানুষ হইয়া সুন্দর সামাজিক জীবন যাপন করিতে চাই কিনা এই মূল প্রশ্নটা আমাদের নিজেদের মনেই ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন হইয়াছে। স্বাধীন দেশের মানুষ বলিয়া আত্মমর্যাদার দম্ভ প্রচারই আত্মমর্যাদাশীল সুস্থ সবল মানুষ হওয়া নহে; এই সহজ কথাটা সঠিকরূপে বুঝিয়া চলিবার দিন আসিয়াছে। নেতা যেমন দেশকে ও সমাজকে চালনা করে, দেশের মানুষের আন্তরিক দাবির জোরেই দেশের নেতার দেখা পাওয়া যায়। দুস্থ রুগ্ন সামাজিক হইয়া আমরা বাঁচিতে চাহি না, এই দাবি যেদিন আমাদের আন্তরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সমাজের রোগদশা সেইদিন ঘুচিবার সূত্রপাত হইবে। আমরা আমাদের দেশের সকল জনসাধারণকে মুক্তকণ্ঠে এই দাবি করিতে আহ্বান জানাইতেছি। স্বাধীন দেশে কেন আমরা এমন কুৎসিত ক্লেদময় পরিস্থিতি বজায় রাখিয়া বারে বারে আমাদের সমাজ-জীবনকে পর্যুদস্ত হইতে দিব? কেন সুস্থ সবল মানুষকে মানসিক রোগীতে পরিনত হইবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে বাঁচাইয়া চলিব? সুস্থ হইয়া বাঁচিবার অধিকার আমাদের নাই কি? সে-পথ কে দেখাইবে? আমাদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে যাহারা জীবনে সুখ শান্তি হারাইয়া মানসিক রোগী হইয়া পড়িতেছে তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার দায়িত্ব কি দেশবাসীর, সমাজকল্যাণী ও রাষ্ট্রনায়কদের নাই! জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে তাঁহারা কতটুকু তাঁহাদের এই দায়িত্ব পালন করিতেছেন? কতটুকু সে-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন? কি ব্যবস্থাই বা তাঁহারা করিতেছেন? হঠাৎ সজাগ হইয়া এক সময়ে হৈ-চৈ করিয়া একটা কিছু করিয়া ফেলিবার ইহা বিষয় নহে। আমরা স্থায়ী ব্যবস্থা চাই; যাহার ফলে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিবে এবং যাহাদের রোগ দেখা দিবে তাহাদের চিকিৎসার জন্য

সুব্যবস্থা থাকিবে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে হইবে। কেবলমাত্র সংখ্যার অঙ্ক হিসাবে মানুষকে দেখার দিন গিয়াছে। আমরা দেশের নেতাদের এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে আহ্বান জানাইতেছি। আমরা বহু সময় তন্দ্রালস অবস্থায় নষ্ট করিয়াছি। স্বাধীনতার পরেও প্রায় ১৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। আর কত ? লুম্বিনি তথা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির তরফ হইতে জনসাধারণ, সমাজসেবী ও রাষ্ট্রনায়কদের সম্মুখে এই অতি-প্রয়োজনীয় জটিল সমস্যাটি তুলিয়া ধরিলাম। আমরা সমস্যার সমাধান চাই। আশা করি প্রতিকারের পথ অবিলম্বে গৃহীত হইবে। লুম্বিনি সমাজ-জীবনের যে বিশেষ দিকের সেবায় নিযুক্ত আছে আমরা আশা করি দশের ও সরকারের সহায়তায় সেই সেবার ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হইবে এবং যে-আর্থিক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া এই লেখার শুরু করা হইয়াছে সেই সমস্যা দূর হইবে। আমরা অবিলম্বে সামাজ-হিতৈষী ও সরকারের সাহায্য পাইব এই আশাই করিব। রোগী রোগভোগ করিতে থাকিবে আর সমাজে সুস্থ লোকেরা সুখভোগে ডুবিয়া থাকিবে ইহা কোনও সজীব সমাজের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। লুম্বিনির তথা দেশের দুঃখের রাত্রি পোহাইবার সময় আসিয়াছে, আমরা এই আশা লইয়াই চলিব।

১৯৬৩ সনের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের লুম্বিনির আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

চিকিৎসার ফলাফল

মাস		আরোগ্য	উন্নতি	অপরিবর্তিত	মৃত্যু	মোট
অক্টোবর	...	২১	১৪	৩	১	৩৯
নভেম্বর	...	২৩	১৩	১	০	৩৭
ডিসেম্বর	...	১৮	২২	১	০	৪১
		৬২	৪৯	৫	১	১১৭

ভরতি ও নির্গম

মাস			ভরতি	নির্গম
অক্টোবর	...	...	৩৩	৩৯
নভেম্বর	...	...	৩৯	৩৭
ডিসেম্বর	...	...	২৮	৪১
			১০০	১১৭

বহির্বিভাগে মানসিক রোগী

মাস			নূতন	পুরাতন	মোট
অক্টোবর	...	...	৫৩	১৬৯	২২২
নভেম্বর	...	...	৪৮	২০৬	২৫৪
ডিসেম্বর	...	...	৪৫	১৭২	২১৭
			১৪৬	৫৪৭	৬৯৩

বহির্বিভাগে সাধারণ রোগী

মাস			নূতন	পুরাতন	মোট
অক্টোবর	...	...	১০৬	৩৭	১৪৩
নভেম্বর	...	...	১০৩	৩২	১৩৫
ডিসেম্বর	...	...	৩৬	৬	৪২
			২৪৫	৭৫	৩২০

আয় ও ব্যয়

মাস			আয়	ব্যয়
অক্টোবর	...	...	৪৭৭২৫·৫০*	২৪৬৮৩·৪০
নভেম্বর	...	...	২৩৮১৪·৭২	২৩৬৫৩·২৯
ডিসেম্বর	...	...	২২৪৬০·৫০	২৩২৬৩·৮২
			৯৪০০০·৭২	৭১৬০০·৫১

* ইহার মধ্যে পঃ বঃ সরকারের ১৫টি শয্যার অক্টোবর '৬৩ হইতে মার্চ '৬৪ পর্যন্তের ব্যয় বাবদ প্রদত্ত ১৮০০০৲ টাকা এবং Social Welfare Board হইতে বাড়ী তৈরি বাবদ প্রাপ্ত ৫০০০৲ টাকা, মোট ২৩০০০৲ টাকা ধরা আছে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha. D.Sc., for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9.29-1.

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩্ (তিন টাকা) ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।